বাস্তুহারা

[বাস্তবের পটভূমিকায় অশ্রুজলের আল্‌পনায় আঁকা উপন্যাস]

স্বপনবুড়ো

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৫৯

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসরোজনাথ সরকার এম্-এ, বি-এল্।
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

*　　*　　*　　*

ছেপেছেন—
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস।
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

*　　*　　*　　*

প্রচ্ছদপট ও ছবি এঁকেছেন—
শ্রীধীরেন বল

*　　*　　*　　*

প্রচ্ছদপট ছাপিয়েছেন—
মোহন প্রেস
২, করিস্ চার্চ্ লেন, কলিকাতা।

*　　*　　*　　*

বাঁধিয়েছেন—
অ্যালায়েড্ বাইণ্ডার্স্
৬৫, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

দাম : চার টাকা মাত্র

যিনি

আমার পিতৃপুরুষের ফেলে-আসা

শূন্য ভিটায়—আজও সন্ধ্যা-

প্রদীপ জ্বাল্‌ছেন—আমার

সেই মাতৃসমা বড় বধূ-

ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে

"বাস্তুহারা" উৎসর্গ

ক'রলাম।

—নববর্ষ, ১৩৫৯ বংগাব্দ।

এক

গ্রীষ্মের অলস মধ্যাহ্ন। তুলসীতলা গ্রামখানি যেন চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে। ফটিকদের আমবাগানে একটানা ঘুঘু ডেকে চলেছে।

গ্রামে দুপুর বেলাটা অনেক সময় এমন নিঝুম হয়ে থাকে যে, মনে হয় যেন দুপুর রাত!

দারুণ রৌদ্র-তাপে খাল বিল শুকিয়ে গেছে, গরু-মোষ গিয়ে যে একটু জলে গা ডোবাবে তারও উপায় নেই। ইস্কুল বন্ধ; গাঁয়ের পথে একটি মানুষের দেখা নেই।

ক্ষেতে যারা কাজ করছিল তারাও এই ঠাটা-পড়া রদ্দুরে বিশ্রাম নিয়েছে বড় বট গাছটার তলায়। একটা চিল দারুণ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গাঁয়ের অনেক ওপরে ডেকে বেড়াচ্ছে, এমন জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না যেখানে গিয়ে সে জলের তেষ্টা মেটাতে পারে।

মাঝে মাঝে পাগলা গরম হাওয়া শুক্‌নো গাছের পাতাগুলি ঘূর্ণিপাকে উড়িয়ে নিয়ে অকারণে খেলা করে বেড়াচ্ছে!

মনে হয় যেন সারাটা গ্রাম কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ডের পরশ পেয়ে একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে।

নীরব······নিঝুম !

কিন্তু ঘুম নেই ফটিকের চোখে।

সে নিজেদের আম বাগানে অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে পাইচারী করে বেড়াচ্ছে। তার পায়ের চাপে শুক্‌নো পাতাগুলি· পাঁপড় ভাজার মত গুড়িয়ে যাচ্ছে। ওকে দেখতে পেয়ে একটা কাঠ বিড়ালী ল্যাজ তুলে সর্ সর্ করে গাছের ওপর দিকে উঠে চলে গেল। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে এই রকম ভাব জানালো যে, তুমি আবার এখানে আমাদের জ্বালাতে এলে কেন? নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমোও গে না !

কিন্তু দুপুর বেলা ঘুমুবার মতো লক্ষ্মী ছেলে ফটিক নয়।

সে অপেক্ষা করছে রতনের জন্য !

কথা ছিল, রতন তার নতুন-কেনা চাকু আর বাড়ী থেকে কাসুন্দী নিয়ে এইখানে এসে হাজির হবে; তারপর সারা দুপুর ফটিকদের বাগানে আম খাওয়া চলবে। ফটিক কাল রাত্রিতেও কাসুন্দী দিয়ে আম খাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে।

রতনটা সব কিছু আমোদ মাটি করে দিল !

ফটিক মাথা চুলকোয় আর গাছতলা দিয়ে হাঁটে।

হঠাৎ তার মনে হ'ল, এমনও ত' হতে পারে যে, রতনের জ্যাঠা তাকে জোর করে অঙ্ক কষাতে সুরু করে দিয়েছে ! সে অবস্থায় রতন আর পালাবে কি করে? তা ছাড়া ও যা ঘুম কাতুরে, দুপুর বেলা ঘুমিয়ে পড়তেই বা কতক্ষণ ?

রাগে ফটিক নিজের আঙ্গুল কামড়াতে সুরু করল। যখন মনে হল বেশ লাগছে—তখন সে কাজটাও বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু সারাটা দুপুর কি করে কাটানো যায়? হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে কে তার চোখ দুটো টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে খিল্ খিল্ হাসি।

গিট্‌কিরি দেয়া মার্কামারা এ হাসি রতনের ছাড়া আর কারো নয়। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চটেমটে গিয়ে ফটিক শুধোলে, এত দেরী করলি যে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেছে।

রতন রসিকতা করে জবাব দিলে, বারে! মিছিমিছি দাঁড়াতে গেলি কেন? দিব্যি গাছের ছায়ায় একটা ঘুম লাগাতে পারতিস। আমি এসে তোকে ডেকে তুলতাম।

ফটিক শুধোলে, আসল কথাটা বল! এত দেরী কেন?

—আর বলিসনে ভাই! পিসিমা বল্লে, আমসত্ত্ব পাহারা দিতে হবে উঠোনে। কাঁহাতক আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়। যেই পিসিমার একটু চোখ জড়িয়ে এসেছে আর অমনি একছুটে পলায়ন। রতন জবাব দেয়।

কিন্তু আমসত্ত্ব যখন কাকে খেয়ে যাবে তখন কি বলবি?

রতন জবাব দিলে, আমার পালানোটা দিদি দেখেছে। আর আমি জানি দিদি আমসত্ত্ব পেলে আর কিচ্ছু চায় না। কাজেই আমসত্ত্ব যে খোয়া যাবে না সেটা তার হাত না গুণেই বলে দিতে পারি।

হো-হো-করে হেসে ওঠে ফটিক।—কিন্তু চাকু আর কাসুন্দী এনেছিস? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে।

রতন বল্লে, আসল কাজ আমি কখনো ভুলেছি দেখেছিস? এই নে চাকু, আর এই শিশি ভর্ত্তি কাসুন্দী--কত খাবি খা না'! কিন্তু বলে দিচ্ছি ঝালে চোখে জল এসে যাবে।

—আরে, চোখে জল না এলে আর মজা কি? আমের টকে জিব আসবে বেঁকে, আর কাসুন্দীর ঝালে চোখে আসবে জল—তবে ত খাওয়ার মজা! চোখ পিট পিট করে ফটিক জবাব দেয়।

রতন বুদ্ধি দিলে, চল এইবার গাছে উঠে গোটা কয়েক আম পেড়ে নিয়ে আসি—

প্রস্তাবটা ভালো, কাজেই তুজনে মাল কোঁচা মেরে গাছে উঠতে লাগলো।

কিন্তু কিছুদূর ওঠবার পরই বুঝতে পারলে ক্রমাগত লাল পিঁপড়ে ওদের তুজনের হাতে, পায়ে, গায় কামড়াচ্ছে।

ফটিক বল্লে, রতন, চল ভাই নেমে পড়ি। এভাবে যদি পিঁপড়ের কামড় খেতে হয় তবে গা ফুলে ঢোল হয়ে উঠবে!

রতন বল্লে, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ঢিল মেরে যথেষ্ট আম পাড়া যাবে। সুতরাং তু'জনে ঝুপ ঝুপ করে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

ঢিল সংগ্রহ করতে গাঁয়ের ছেলেরা ভারী ওস্তাদ। কেননা পল্লী-যুদ্ধের ওই হচ্ছে সব চাইতে বড় অস্ত্র।

খুব অল্প সময়ের ভেতরেই ওরা অনেকগুলি বড় বড় আম অব্যর্থ ঢিলে বোঁটা থেকে খসিয়ে নিয়ে এলো।

রতন বল্লে, আয় এক কাজ করা যাক্—

ফটিকও কৌতূহলী চোখ তুলে শুধোলে, কি?—

ওই যে কলা গাছ ওর থেকে একটা পাতা কেটে নিয়ে আয়। আমগুলি কুচি-কুচি করে কেটে নি, তারপর ওই কলাপাতায় কাসুন্দি দিয়ে মাখলে যা ব্যাপার দাঁড়াবে সেটা মুখে না বলাই ভালো।

রতন বিজ্ঞভাবে বল্লে।

মুখে কিছু বল্লে না বটে কিন্তু মুখ চট্‌কে ফট্‌কে উত্তর দিলে, তোর বুদ্ধিগুলো কিন্তু সত্যি ভালো। কিন্তু নুন এনেছিস? নুন?

একটা কাগজে মোড়া খানিকটা নুন্ পকেট থেকে বের করে নিয়ে রতন মিটি মিটি হাসতে লাগলো।

এর পর কলার পাতার ওপর কাসুন্দী মাখা আম যে ফলারের সৃষ্টি করল সেটা বুঝিয়ে না বললেও বেশ বোঝা যাবে।

দাঁত যখন টকে একেবারে শির্ শির্ করতে লাগলো তখন রতন বল্লে, চল ভাই, আমাদের জাম গাছে প্রচুর জাম পেকে রয়েছে। ভারী মিষ্টি। অনেকগুলো খেলে দাঁতের টক পালাতে পথ পাবে না।

ফটিক মাথা নেড়ে বল্লে, আমি ত আগেই বলেছি তোর বুদ্ধিগুলো ভারী মজাদার। চল, এখন কালো জামের বিরুদ্ধেই অভিযান সুরু করা যাক।

পল্লী পথ এখনও জনহীন।

অনেক দূরে মাঠের ওপাশ থেকে ধোপাদের কাপড় আছড়ানোর শব্দ ভেসে আসছে। একটা গাধা রদ্দুরে অস্থির হয়ে কোথায় যেন বিকট স্বরে ডেকে উঠলো। একটা ডোবার জল একেবারে শুকিয়ে গেছে, মাটিগুলিও ফেটে চৌচির। কোন দিন যে এটি জলে ভরাট ছিল আর এরি ভেতর থেকে ক্রমাগত ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙ্ শব্দ শোনা যেত সে কথা যেন মনেই আসে না।

কিন্তু রদ্দুরে ক্লান্তি নেই—ফটিক আর রতনের। ওরা জামগাছের উদ্দেশে দ্রুত পা চালিয়ে দিলে।

রতন মিথ্যে কথা বলেনি!

ওদের জাম গাছ যেমন অনেক যায়গা জুড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তেমনি জামগুলি বড় আর কালো। পেকে টুল্ টুল্ করছে। আর অসংখ্য পক্ষি-পাখালি মনের আনন্দে কিচির মিচির করে সেই গাছে আসর জমিয়েছে। পাখীতে যত না খায় তার বেশী

সকাল-সন্ধ্যেয় ঝড়ে পড়ে গাছের তলাটা কালো করে রাখে। তাইতে সকাল বিকেল গাঁয়ের ছেলে-মেয়ের ভীড় হয় এখানে এত বেশী। গাছের নীচে একটী পুকুর, জল তার ভারী ঠাণ্ডা।

দুপুর বেলাটা এ যায়গাটাও নিঝুম থাকে। শুধু গাছের ওপর থেকে টুপ টাপ করে জামের আটি পড়ছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে পাতার ফাঁকে-ফাঁকে পাখীরা তাদের কাজ নীরবেই করে চলেছে।

রতন বল্লে, তুই গাছের নীচে দাঁড়া, আমি ওপরে উঠছি; আমি ওপর থেকে বেশ পাকা দেখে জাম ফেলে দেবো আর তুই কোঁচড়ে সেইগুলি লুফে নিবি। নীচে পড়লে কিন্তু মাটিতে সব থেত্‌লে যাবে।

ফটিক জবাব দিলে, বেশ কথা। গাছে ওঠবার অন্ধি-সন্ধি তোরই ভালো জানা আছে। আমিই না হয় কোঁচার খুঁট্‌ মেলে ধরি।

রতন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে তর্‌ তর্‌ করে গাছের ওপর উঠে যায়। কোন্‌ ডাল ধরে কোন্‌ ডালে লাফাতে হবে, কোথায় মাথা গলিয়ে পথ পরিষ্কার করে নিতে হবে, গাছের কোন অঞ্চলে পাকা জামের ভীড় বেশী – সব যেন রতনের একেবারে কণ্ঠস্থ।

খানিক বাদেই পাতার ঝোপের মধ্যে সে একেবারে হারিয়ে গেল।

ফটিক নীচে থেকে শঙ্কিত হয়ে শুধোলে, কোথায় রে তুই?

নিজেকে লুকিয়ে রেখে জবাব দিল টু—উ - উ!

ঝুপ ঝুপ করে জাম পড়ে,—সবই যে ফটিকের কোঁচড়ে লুফে নেয়া চলে তা নয়; মাথায়, নাকে, মুখে চোখে পড়েও ওকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

গাছের ওপর রতনের মুখেরও কামাই নেই।

যেগুলো অতি বেশী পেকে টুলটুলে হয়ে রয়েছে বেমালুম ছিঁড়ে আলগোছে মুখে পুরে দেয়।

—ওরে রতন, এদিকে যে আমার কোঁচড় প্রায় ছেঁড়ো-ছেঁড়ো হয়েছে। আর জাম এতে ধরে না···এই বেলা নেবে আয় তাড়াতাড়ি—

কিন্তু রতনের তখন জামের মিষ্টি মুখে আমেজ এনেছে। এই পাকা পাকা টুলটুলে জাম ফেলে কি চট্ করে নামা যায়? খেতে খেতে যখন একেবারে জিব কালো হবে তার আগে গাছ থেকে নামা বোকামী।

এই কথাই আপন মনে ঠিক করে নেয় সে।

আরো একটী সমস্যা রতনের মনে জাগে।

মা কালীর শরীর এত মিশ কালো, কিন্তু তার জিব এত লাল কেন? আর রতন এমন ফর্সা, কিন্তু জাম খেয়ে তার জিব এত কালো হয়ে যায় কেন? আরো গোটাকয়েক জাম মুখে পুরে দিয়ে রতন ওপর থেকে প্রশ্নটী করল ফটিককে।

ফটিক বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে জবাব দিলে, এর উত্তর ত খুব সোজা রে। আমাদের মা কালী কালো হলে কি হবে? অসুরের রক্ত খেয়ে খেয়ে তার জিব হয়ে গেছে একেবারে লাল। আর তুই যতই ফর্সা হোস না কেন, জাম ত' আর ফর্সা নয়। যত খাবি জিব কালো হয়ে যাবে। তবে একটী কথা, জাম যতই কালো হোক—শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে।

রতন গাছের ডালে দোল খেতে খেতে বল্লে, তুই ত' অনেক কিছু জানিস ফট্‌কে। বড় হলে তুই বৈজ্ঞানিক হবি—এই আমি বলে দিলুম, তুই দেখে নিস।

—বৈজ্ঞানিক হওয়া কি চারটেখানি কথা নাকি রে? অনেক মোটা মোটা বই পড়তে হয়, কত কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হয়। এর জন্য কত জীবন চলে যায়। বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্যিই তপস্যার ব্যাপার।

গাছের ওপর থেকে রতন জিজ্ঞেস করলে, এত কথা তুই জানলি কি করে রে ফটকে? পড়িস তো গাঁয়ের ইস্কুলে।

ফটিক বল্লে, আমার মামা কলেজে পড়ে যে। মাঝে মাঝে আসে আমাদের দেশে বেড়াতে। তার কাছেই বিজ্ঞানের সব খবর শুনে নি।

হঠাৎ রতন বলে বসল, তোদের আম খেয়ে যা দাঁত টকে গিয়েছিল, আমাদের মিষ্টি জাম খেয়ে এতক্ষণে মুখটা মিষ্টি হ'ল। বাবা, এমন টোকো আমের বাগান তোরা কেন রাখিস—বলতে পারিস?

রতনের কথাটায় ফটিকের ভারী অপমান বোধ হল। বল্লে, নারে বোকা, এখন কাঁচা আছে, পাকেনি তাই, নইলে দেখবি ওই আম একেবারে চিনির মতো মিঠে হবে।

ছাই হবে, ফোঁড়ন কাটে রতন। ওই টোকো আম কখনো মিষ্টি হতে পারে? সেদিন পণ্ডিত মশাই একটা সংস্কৃত শ্লোক বলেছিল মনে আছে? তার মানে হচ্ছে, কয়লা শতবার ধুলেও তার ময়লা যায় না।

এইবার চটে-মটে ওঠে ফটিক। বল্লে, তার মানে, তুই বলতে চাস যে আমাদের বাগানের আম ভালো নয়? পাকলে তা' মিষ্টি হয় না?

—টক কখনো মিঠে হয়? হো-হো করে হেসে ওঠে রতন। দেখ ত' আমাদের জাম। খেলে মুখ, জিব, পেট সব জুড়িয়ে যায়।

—ফের আমাদেব আমের নিন্দে করবি?

—করবই ত—

—মুখ সামলে কথা বলবি।

—কেন, তোর ভয়ে নাকি?

—আমি বলছি আমাদের আম খুব মিষ্টি—

—আমি বলছি আমাদের জামের কাছে সেটা একেবারে টক।

—ভালো হবে না কিন্তু বলছি।

—মন্দটাই বা কি হবে শুনি?

গাঁয়ের ছেলেরা সহরের ছেলেদের মতো কথার মার-প্যাঁচ খুব বেশীক্ষণ চালাতে পারে না। রাগ হলে ঝোঁকের মাথায় যাহোক একটা করে বসে। ফটিকও তাই আর কথা কাটাকাটি না করে একটা ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল গাছে বসা রতনের দিকে। সেটা লাগল গিয়ে রতনের পায়ের গোড়ালীতে।

ব্যথা পেয়ে চটে গিয়ে সে ক্রমাগত তুই হাতে জাম তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

ফটিক তাকে সাবধান করে দিয়ে বল্লে, ভালো চাস ত বল যে আমাদের আম মিষ্টি—

রতন বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে জবাব দিলে, বয়ে গেছে আমার টোকো আমকে মিষ্টি বলতে। মিষ্টি বলতে হয় আমাদের জামকে; তবে হ্যাঁ, পাঠশালায় পড়েছি বটে—কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, তাহা হইলে তাহারা মনে বড় কষ্ট পায়!

—তবে রে দুষ্টু! বলে ফটিক একটা হাঁড়ি ভাঙা তুলে গাছের দিকে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারল। সেই আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে রতন ডাল থেকে মারলে এক লাফ। নীচে ছিল এক পুকুর। রতন সেই পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চ্যাঁচামেচি শুনে ছুটে বেরিয়ে এলেন রতনের জ্যাঠামশাই। কিন্তু ততক্ষণে ফট্‌কে একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে।

দুই

ঝগড়া যেমন অতি সহজে লাগে, ভাব করতেও দুদিন সবুর সয় না। এমনি দুর্দ্দান্ত ফটিক আর রতন। গাঁয়ের লোকে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বলে, ছেলে নয় ত একজোড়া বিচ্ছু। সত্যি তাই।

কখন যে ওরা কোন রাজ্যে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলবে তা জানা শিবের বাবারও অসাধ্যি।

দুজনের মগজে কি ভাবে যে দুষ্টুমীর-মৌচাক গড়ে উঠছে তা কেউ জানে না। সেই জন্যে গলায়-গলায় ভাব আবার কথায়-কথায় আড়ির-বন্যা বয়ে যায়।

রতন যেদিন পুকুরের জলে নাকানি চুবানি খেলে, তার পর দিন হাটে তার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে ফটিকের কাকার দেখা।

প্রথমেই আড় চোখে একবার এ-ওর দিকে তাকালো। বেশ বোঝা গেল দুজনের মধ্যে আগুনের ফুল্‌কি লুকিয়ে আছে। একটু খড় পেলেই দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে।

কিন্তু সেধে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না। তাতে মান থাকে

না। পাশা-পাশি দুটো দোকানে দু' জনে বেগুন আর লাউয়ের দর করছে, কিন্তু মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে তাকাবার কামাই নেই।

হঠাৎ রতনের জ্যাঠামশাই বলে বসলেন, হ্যাঁ হে চণ্ডী, তোমার ভাইপো ফট্‌কে দিন দিন ভারী দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠছে। কাল খামোকা আমাদের রতনকে পুকুরের জলে অবেলায় নাকানি-চুবানি খাওয়ালে।

চণ্ডী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, কিন্তু আপনাদের রতনও কম যায় না। যাকে বলে আসল "রতন"।

পকেটে করে এক শিশি কাসুন্দী নিয়ে গিয়ে আমাদের গোপাল ভোগ আম কাঁচাই এক ডজন সাবাড় করে দিয়ে এসেছে। গোপাল ভোগের দাম কি রকম আপনিই হিসেব করে বলুন না—

রতনের জ্যেঠামশাই চটে উঠলেন: কেন, আমাদের বাগানে কি আম গাছ নেই? তাই ঠাটা পড়া রোদ্দুরে তোমাদের বাগানে ছুটবে আম খেতে?

ফটিকের কাকা চণ্ডীচরণ ফোঁড়ন কাট্‌লে, তা'হলে ত, সে কথা আমরাও বল্‌তে পারি, আমাদের বাড়ীতে কি জামগাছ নেই? ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে আপনাদের পুকুর ধারে ছুটবে জাম চিবুতে!

মুখ সামলে কথা বোলো চণ্ডী, আমি তোমার বাপের বয়েসী, জিব তোমার এত আল্‌গা কেন?—হুঙ্কার দিয়ে বল্‌লেন রতনের জ্যেঠা।

চণ্ডীচরণও পেছুবার ছেলে নয়; জবাব দিলে, মিছি মিছি আপনি চোখ গরম করছেন! এই কথাটা জেনে রাখবেন যে, এক হাতে কখনো তালি বাজেনা, রতনা ছোঁড়া যদি ফট্‌কেকে ফুঁসলে নিয়ে না যেত, তবে কি ঠ্যাকা পড়েছে তার দুপুর রোদ্দুরে বাড়ীর বাইরে

যাবার? আমাদের বাগানের ফল কে খায় তার ঠিক নেই! আমরাই ত' দু'হাতে বিলিয়ে দি সবাইকে—

—তোমাদের টাকার গরম হয়েছে তাই আমায় কথা শোনাচ্ছ? কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি—ফট্‌কেকে তোমরা শাসন করো। সে যেন খবরদার আমার ভাইপোর সঙ্গে মেশেনা—

চণ্ডীচরণ ফোঁস করে উঠে জবাব দিলে, তার চাইতে রতনাকে আপনি আগে সাম্‌লান। ও যেন যখন-তখন আমাদের বাড়ীতে না আসে।

—বেশ তাই হবে।

—হলে অযথা নালিশের হাত থেকে আমরাও বাঁচি।

—আর কখনো রতন যাবেনা তোমাদের বাড়ী—

—ফট্‌কেরও বয়ে গাছে বাড়ীর বার হতে—

—হুঁ।

—আচ্ছা!

দুজনের কথা আস্তে আস্তে ছোট ও সংক্ষিপ্ত হয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। হাট করে ফেরবার মুখে দুজনকে একই নৌকায় নদী পার হতে হল। কিন্তু রতনের জ্যেঠা গিয়ে বসলেন নৌকার এর গলুইতে, আর চণ্ডীচরণ তাকিয়ে রইল অন্য এক দিকে।

যেন ভিন্ গাঁয়ের লোক ওরা। কারো সঙ্গে কারো জানা শোনা নেই।

কিন্তু নৌকা থেকে নেমেই দুই বাড়ীর দুটি অভিভাবক এক নাট-কীয় পরিস্থিতির সম্মুখে পড়ে গেল। যাদের জন্যে এত ঝগড়া আর বিবাদ, সেই দুই শ্রীমান রতন আর ফটিক কোন গেরস্তর একটা ছাগল

ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাকে আশ মিটিয়ে কাঁঠাল পাতা খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু অজ-নন্দন এত অবুঝ যে, সে এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলে যেন বাঁচে। মাঠে মাঠে ঘুরে শুকনো ঘাস চিবুবে, সেও বরং ভালো, তবু আদরের অতিশয়োক্তি তার পক্ষে অসহ্য !

রতন আর ফটকে যে অসাধ্যসাধনে ব্যস্ত ছিল তাতে অন্য দিকে তাকা-বার ফুরসৎ ওদের মোটেই ছিলনা।

এই সহজ কথা ওরা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে, তাদেব আদর করে যখন কেউ কলা কিম্বা করম্‌চা খেতে দেয়, তুটোকেই ওরা একই ভাবে আনন্দের সঙ্গে হাত পেতে নেয়। কিন্তু এই ছাগলটা কী! এতকষ্ট করে ওরা তুটিতে গাছে উঠে কচি কাঁঠাল পাতা

জোগাড় করে নিয়ে এলো, আর ও কিনা সেগুলো একবারটি চেখেও দেখবেনা !

এই জন্যেই বোধ করি ওদের নাম হয়েছে—ছাগল !

ছাগল সম্পর্কে হয়তো দুজনে বেশ কিছু গবেষণা চালিয়ে যেতো, কিন্তু আচম্কা দুজনের পিঠে দুটি চাপড় এসে পড়তে ওরা একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল।

শুধু চাপড়েই পালার শেষ নয়.......দুটি বলিষ্ঠ হাত ওদের কান দুটি পাক্‌ড়ে ধরল—একেবারে নিঃশব্দে।

রতনের জ্যাঠা বল্লেন, চল্ শীগ্‌গির বাড়ী। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। রোদ্দুরে টো-টো করে যত রাজ্যের বখাটে ছেলের সঙ্গে মেশা আমি তোর বের করে দিচ্ছি—

ফটিকের কাকার মুখেও ঝাল কিছু কম নেই। আড় চোখে রতনের জ্যাঠার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ফটকেকে বল্লে, যত সব হা-ঘরের ছেলের সঙ্গে তোর মেলা-মেশা ! কেন গাঁয়ে কি ভদ্রলোক নেই ! আজ তোকে ঘরে বন্ধ করে রাখবো···দেখি শায়েস্তা করতে পারি কি না।· সঙ্গে সঙ্গে দুই অভিভাবকের কীল পড়ল ভাদ্রের তালের মতো দুই শ্রীমানের পিঠে।

এই ভাবে যার যত রাগ চড়ে ওঠে, সে তার বাড়ীর ছেলেকে বেদম প্রহার দেয়, আর বাড়ীর দিকে টেনে নিয়ে চলে !

রতন আর ফটিক কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না···হঠাৎ এমন কি অন্যায় কাজ তারা করে বসল, যার জন্যে এতখানি উত্তম-মধ্যম তাদের জন্যে জমা হয়ে ছিল !

দুটি শ্রীমানকে নিয়ে ঘরে পৌঁছার পর, বাড়ীর লোকদের

চীৎকারের যেন একটা প্রতিযোগিতা চললো। কেননা, এতো শুধু ছেলেকে শাসন করা নয়—নিজ নিজ বাড়ীর গুমোর লুকিয়ে আছে এরই মধ্যে।

সুতরাং মার খেয়ে মরুক ওই বাচ্চা দুটো!

শুধু থেকে থেকে দুটি মায়ের প্রাণ আতঙ্কিত হয়ে কেঁপে উঠতে লাগলো, আর তাদের চোখ ভরে এলো জলে। কিন্তু সে অশ্রু কাউকে দেখাবার নয়। বাড়ী শুদ্ধু লোকের কাছে তাহলে ছোট হতে হবে যে!

পরিবারের সম্মান সকলের আগে···তাই মার খেয়ে মরুক ও বেচারারা। দু'পক্ষ থেকেই হুকুম হয়ে গেল যে, রতন আর ফট্‌কে বাড়ীর বার হতে পারবে না···তারা দুজনে রইল বন্দী।

সকাল বেলা কোন দূর অঞ্চলের কোকিলের ডাকে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। কাকের ডাকে ওরা বুঝতে পারে পাকা আমগুলি টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়ছে গাছের তলায়, বকুল তলায় অফুরন্ত ফুল পড়ে রয়েছে; তাদের বাদ দিয়ে কে মালা গাঁথছে কে জানে!

বৌদি, মা, মাসি-পিসিরা ঘরে মুড়ি আম ক্ষীর দিয়ে যায় বটে, কিন্তু তার স্বাদ গাছ পাকা আমের মতো মধুর হয়ে মুখে লাগে না।

নিঝ্‌ঝুম দুপুরে একটানা ঘুঘু ডেকে যায়···অনেক উঁচুতে আকাশে উড়তে থাকে চিল, সঙ্গে সঙ্গে মনও তাদের উধাও হয়ে যায় কোন ছায়ায় ঘেরা, পাতায় ঢাকা বনের মাঝে।

বাড়ীর লোক বলে, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দুপুর বেলা নিরিবিলি ঘুমিয়ে থাক্—শরীর ভাল হবে। কিন্তু কোন্ অজানা সাথীর হাতছানিতে ওদের চোখের পাতা থেকে ঘুম ছুটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ঝড়ের মুখের ঝরা পাতার মতো তাদের দুটির মন কোন্

অচেনা পথে কার ইঙ্গিতে হারা উদ্দেশে ঘুরে বেড়ায় কেউ তার সন্ধান রাখতে পারে না।

বিকেলের কাল বৈশাখী ঝড় ওদের মনে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দেয়। দেহই হয়ত ওদের আট্‌কা, কিন্তু মন ছুটে চলে বনে জঙ্গলে মেঘের ঝুঁটি আকড়ে ধরে···পাগলা হাওয়ায় মেতে। কখনো বা মনে মনে কুড়িয়ে বেড়ায় ঝড়ে খসে পড়া আমগুলি।

আবার কোন দিন বা, সন্ধ্যার রঙীন মেঘের সঙ্গে মানস ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে ওরা নিজেদের প্রাণের তরঙ্গে আপনারাই দুলতে থাকে।

সন্ধ্যায় তারায় ভরা আকাশের দিকে মন ওদের বল্গাবিহীন বুনো ঘোড়ার মতো তেপান্তরের মাঠে পাড়ি জমায়। জানালার ফাঁক দিয়ে কখনো তাকিয়ে দেখে দলে দলে বাছুড় উড়ে যাচ্ছে কোন ফলন্ত বাগানের সন্ধানে। বিনা বাধায় ওরা তাদের সাথী হয়ে উধাও হয়ে যায় আকাশের বায়ু স্তর ভেদ করে।

দেহ যখন বদ্ধ, মন তখন বেশী করে উড়ে বেড়ায়।

কিন্তু ছুটি ওদের কিছুতেই মেলে না!

দুটি পরিবারের মানুষগুলি যেন একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। যেন ওরা দু'জনে মেলা-মেশা করলেই তাদের সকল সম্মান আর প্রতিপত্তি একেবারে ধূলোর সঙ্গে মিশে যাবে।

এই ভাবে সবাইকার চোখের আড়ালে মনের অসুখে শুকিয়ে যেতে লাগলো রতন।

ফটিক একদিন শুনতে পেলে পাশের ঘরে তার কাকা চণ্ডীচরণ তার মার সঙ্গে এই সম্পর্কে কথা বলছে।

ফটিক কান খাড়া করে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু শরীরটাকে এমন ভাবে আড়াল করে রাখল, যেন কেউ চট্ করে দেখতে না পায়।

মা বললে, আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমরা যে বলছ রতনের অসুখ, সেটা কি সত্যি বাড়াবাড়ি ?

—হুঁ। একটু বাড়াবাড়ি বৈ কি। গাঁয়ের শিবচরণ কবরেজমশাই দেখছেন কিনা।. তাঁর সঙ্গে আজ হঠাৎ হাটে দেখা। বললেন, এই ক'দিনের মধ্যেই ছোঁড়াটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যে আবোল-তাবোল কি সব বকে আর কেবলি আমাদের ফটিককে ডাকে।—মৃদুস্বরে চণ্ডী জবাব দেয়।

মা আঁচলে চোখের জল মুছে খাটো গলায় কইলে, ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া হয়েছে···এবেলা হয়, ওবেলা মিটে যায়! কিন্তু তোমরা ব্যাপারটাকে বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুলছো ঠাকুরপো।

চণ্ডী জবাব দিলে, আমাদের কি দোষ বল ? রতনের জ্যেঠা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলে কিনা, যত রাজ্যের বখাটে ছেলের সঙ্গে মেলা-মেশা আমি তোর বের করে দিচ্ছি! কথাটা যে আমাদের গায়ে লাগে বৌদি! আমিও শুনিয়ে দিয়েছি, গাঁয়ে কি ভদ্দর লোক নেই ? হা-ঘরের ছেলেদের সঙ্গে তোর মেলামেশা ?

মা আগের মতোই মৃদু কণ্ঠে উত্তর করলে, বেশত! তোমাদের জবাবে ত' কাটা-কুটি হয়ে গিয়েছিল! মিছি-মিছি ছেলে দুটির ওপর অতখানি তাড়না যেন বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

চণ্ডী কাকা রাগ করে উত্তর দিলে, বেশ! তোমার ছেলেকে তুমি খুলে দাও। কিন্তু এর মধ্যে আমাকে আর কোন দিন জড়িও না।

মা কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে, বা রে! আমি কি তাই বলেছি? ওর যাতে ভাল হয়, তোমরা ত তাই করবে। তোমরা শাসন বন্ধ করো—এ কথা আমি কোন দিনের তরে বলেছি?

— হ্যাঁ, আরো কিছুদিন বন্ধ থাক ফট্‌কে, তাহলেই রতনা ছোঁড়াটার সঙ্গে মেলা-মেশা একেবারে থাকবে না। আর তাছাড়া এখন থেকে পড়াশুনায় মন দিতে হবে না? সারাদিন বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ালেই তোমার ছেলে মানুষ হবে মনে করেছ, বৌদি? কাল থেকে আমি ওকে পড়াতে বসবো। ছেলে যদি অমানুষ হয়, তবে বাড়ীরও ত' বদনাম বৌদি—

মা জবাব দিলে, সে কথা ত' ঠিকই ঠাকুরপো। তুমি যা ভালো বোঝো সেই ভাবেই ওকে-মানুষ করে তোলো।

মনে হল এইবার চণ্ডীকাকা খুশী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রতনের অসুখ!

ফট্‌কে কিন্তু এতদিন কোন খবরই পায়নি—

মাছগুলো জালে আটকা পড়লে যেমন জলে ফিরে যাবার জন্যে ছট্ ফট্ করতে থাকে, ফটিকের অন্তরাত্মা ঠিক তেমনি রতনের কাছে ছুটে চলে যাবার জন্য কেবলি আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো। কিন্তু প্রতিকারের কোনো উপায় নেই!

দুপুর বেলা চণ্ডীকাকা ধারাপাত মুখস্ত করাতে বসে গেল।

কিন্তু যাতে মন নেই, তা' মুখস্ত হবে কি করে?

ফলে ফটিকের কতকগুলি চড়-চাপড় আর কান-মলা লাভ হল।

চণ্ডীচরণ বই খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফটিকের মাকে ডেকে বল্‌লে,

বৌদি, ছেলের মাথায় একেবারে গোবর পোরা। ওকে লেখা-পড়া শেখানো আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

ফটিকের মা কোনো কথার জবাব দিলে না, শুধু নিরিবিলি একটা যায়গায় সরে গিয়ে নীরবে চোখের জল মুছলে। •

রাত্তিরে ফটিক শুনতে পেলে, রতনের এখন-তখন অবস্থা। কব্‌রেজ দেখতে এসে নাকি ঠোঁট বেঁকিয়ে ফিরে চলে গেছেন!

মা আর কাকিমার ফিসফিস কথা থেকে ফটিক জেনে নিয়েছে যে, রতন রোগের ঘোরে ক্রমাগত তার নাম ধরেই ডাকাডাকি করছে।

ফটিকের মনও কি কেবলি রতনকে ডেকে মাথা কুটে মরছে না? কিন্তু সে ত রতনের মতো জোরে জোরে গলা ফাটিয়ে ডাকতে পারেনা। তাহলে চণ্ডী কাকা এসে বুঝিয়ে দেবে যে, সে তার বাড়ীর মান-সম্মান নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। কাজেই মন যতই কেন না আকুলি-বিকুলি করুক···মুখ একেবারেই বন্ধ রেখে প্রহর গনে!

অনেক রাত্রে কার যেন চাপা কান্না শুনে ফটিকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে কান পেতে চুপ করে শোনবার চেষ্টা করতে লাগলো।

হ্যাঁ, কান্নাই ত।

রতনের মা গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছে।

ফটিকের ত ভুল হবার কথা নয়।

গত বছর রতনের একটি দিদি যখন মারা যায় তখনো রতনের মা গভীর রাত্রে গুমরে-গুমরে কাঁদত। ঠিক এমনি বাতাসে ভেসে আসত তার চাপা গলার কান্না।

ফটিক বিছানা ছেড়ে উঠে বসল।

কিন্তু ঘর থেকে বেরুবার কি উপায়? বাইরে থেকে দরজায় শেকল দেয়া।

চাটাই আর বাঁশের শক্ত বেড়া, ঠেলে এতটুকু নড়ানো বা দোমড়ানো যায় না। হঠাৎ ফটিকের নজর গেল—ঘরের ভেতরকার মাচার নীচে একটি কুড়ুল অযত্নে পড়ে আছে।

পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ফটিক সেই কুড়ুল হাতে তুলে নিলে, তারপর বেড়ার একটা কোন খুব সাবধানে খুলে ফেলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

কিন্তু অন্ধকার রাত, একটু দূরের জিনিষ পর্য্যন্ত চোখে দেখা যায় না। ফটিক খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রতনের বাড়ীর রাস্তা ত ওর এক রকম মুখস্ত।

চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও সে ঠিক গিয়ে হাজির হতে পারে।

মনে সাহস এনে ছুট্ লাগাল ফটিক! দূরে একটা গাছে নিশাচর পাখী সাবধান করে দিলে—

ভূত—ভূত—ভূতুম্—

কিন্তু ভূতের ভয়ে কাবু হবার ছেলে ফটিক নয়। সে পায়ের গতি আরো দ্রুত করে দিলে, আর মুখে শুধু বলতে লাগলো ঃ

"ভূত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি—
রাম, লক্ষণ বুকে আছে
করবি আমার কি?"

জলার ধারের ওই পাশে কতকগুলি শেয়াল হুক্কা-হুয়া ডাকে প্রহর ঘোষণা করল।

ফটিক মরিয়া হয়ে এগিয়ে চলে।

গোটা বাড়ী নিঝুম। শুধু রতনের মা ছেলের শিয়রে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছে। মৃদু মাটির প্রদীপে দেখা গেল রতনের মুখ কালীমাখা হয়ে গেছে। সে মুখে কেবলি বিড় বিড় করছে, ফটিককে তোমরা ডেকে দাও না—কালীদের বিলে নৌকা বাইতে যাবো—

ফটিক ছুটে গিয়ে রতনের শয্যার পাশে বসে তার ডান হাতখানি টেনে নিয়ে বললে, ভাই রতন, আমি এসেছি, আর তোর ভাবনা নেই।···

রতন খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখলে, শীর্ণ মুখে হাসি কিন্তু ওর চোখে জল!

তিন

রতন যে কী ভাবে বেঁচে উঠেছে সেটা গল্প-কথায় দাঁড়িয়ে গেছে! সবাই শুনে বল্লে, ভাগ্যিস ফটিক বেড়া কেটে পালিয়ে গিয়েছিল, তাইত ছোঁড়াটা প্রাণে বেঁচে উঠলো।

গ্রামের লোকে এর পর থেকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে যে, রতনের জ্যাঠা আর ফটিকের কাকা প্রত্যহ লাউ আর বেগুনের দর যাচাই করে এক সঙ্গে হাট করে ফিরছে।

একজনের দেরী হলে পথে আর একজন অপেক্ষা করে, এমনও নাকি দেখা যাচ্ছে আজকাল।

ওদের দুটো বাড়ীর মধ্যে একটা অদেখা প্রাচীর গড়ে উঠেছিল; আবার রতন ও ফটিকের চেষ্টাতেই সেই পথকে অবলম্বন করে এবাড়ী ওবাড়ীর সবাই নূতন করে চলাচল সুরু করেছে। এ বাড়ীর লোকের কথা ওবাড়ীর লোকের কাছে আর আগের মতো তেতো বলে মনে হয় না; শুধু কি তাই? ফটিকদের বাড়ীর আম কাঁঠাল ঝাঁকা ভর্ত্তী হয়ে রতনদের বাড়ী চলে যায় এবং রতনদের বাড়ীর জাম, জামরুল, নারকেল বাঁকে করে ফটিকদের বাড়ীর উঠোনে এসে হাজির হয়। দুটো বাড়ীর মেয়েরাই হাসি মুখে এখন সেগুলো ভাঁড়ারে তুলে রাখে, কর্তা থেকে সুরু করে ছোট্ট বাচ্চা পর্যন্ত সবাই সোনা মুখে সেই ফল খেয়ে খোলা মনে প্রশংসা করে আর লম্বা করে ঢেকুর তোলে।

এখন আর এবাড়ী-ওবাড়ীর ছেলেকে জোর-জুলুমে ঘরে বন্ধ করে শেকল দিয়ে আটকে রাখতে হয় না; বাড়ীর কর্তাদের মুখ অকারণে যখন-তখন তেলো হাঁড়ির মতো ভারী হয়ে ওঠে না; আর

বাড়ীর গিন্নীদেরও গোপনে আঁচলে চোখের জল মুছে মনের কথা বুকে চেপে রাখতে হয় না।

পল্লী জীবনের দিন হালকা পাল তোলা নৌকোর মতো এগিয়ে চলে। ইতিমধ্যে বর্ষা তার বেণী দুলিয়ে, আঁচল উড়িয়ে, চোখের জল নিয়ে এসে উপস্থিত হয় ছোট্ট গ্রামখানির আশে-পাশে।

গাঁয়ের ছেলেরা একদিন এসে খবর দেয়, গাঙে জল এসেছে। সারাটা অঞ্চল যেন আনন্দে শিউরে ওঠে।

খাল, বিল, নদী, নালা, পুকুর গ্রীষ্মের চোখ রাঙানিতে একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—তারা আবার সেই ঠাণ্ডা, প্রাণ জুড়ানো শীতল জলের স্বপ্ন দেখতে সুরু করছে।

বুক ফাটা তৃষ্ণায় যে কাঁপ্‌ছে—তার কাছে ঠাণ্ডা মেটে হাঁড়ির জমিয়ে রাখা জলের ইসারা!

ছেলের দলের উৎসাহের কারণ কিন্তু আলাদা!

জল আসছে গাঙে—

সেই জল গাঙ বেয়ে আসবে খালে।

খাল বেয়ে ঢুকবে গ্রামের অন্দরে—

ভরে উঠবে—মজা বিল আর শুকনো পুকুর—

সেই জলের সঙ্গে আসবে রাশি রাশি রূপালি মাছ। বাঙলার পল্লী জীবনে সে এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার, যা' সহরের ছেলেরা আন্দাজ করেও আনন্দে ভাগ বসাতে পারে না।

গাঁয়ের ছেলেরা উল্লাসে দিন গুন্‌তে থাকে, বুড়োর দল সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে, জেলেরা নতুন করে জাল, "পল", 'কোচ' 'ট্যাটা' প্রভৃতি তৈরী করে মৎস কুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়।

সকালে বিকালে দেখা হলেই লোকের মুখে ওই একই প্রশ্ন : ক' হাত জল বাড়ল ?

—খাল বেয়ে অনেকটা দূর এসে পড়েছে —

— আর ক'দিনের ভেতরই গায়ের ভেতর ঢুকে পড়বে।

—রাত্তিরে কি রকম শোঁ-শোঁ শব্দ ওঠে শুনতে পাস ?

—আমার ত ভাই চার বার করে ঘুম ভেঙে যায়।

"পল" "ক্ষ্যাপাজাল" "ট্যাটা" সব তৈরী করে রেখেছি—

শুধু মুখে মুখেই উদ্যোগ-পর্ব্ব নয়। উৎসাহী ছেলের দল খালের মাঝে মাঝে রাতারাতি বাঁধ দিয়ে রাখে মাছ ধরার সুবিধার জন্যে। দল বেঁধে পালা করে সব রাত জাগতে সুরু করে দেয়। পাড়ায় পাড়ায় বসে যায় তাসের আড্ডা। কখন যে শুভ লগ্ন আসবে কে বলতে পারে ? অনেকেই রাত্তিরে শিয়রে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখে। কখন ডাক পড়বে···ছুটে বেরিয়ে খালের মাঝখানে চলন্ত স্রোতে যায়গা করে নিতে হবে ত !

কার পুকুরে কবে জল পড়বে— গাঙের জলের বাড়া-কমা দেখে তার একটা হিসেব প্রত্যেকেরই মুখে-মুখে তৈরী হয়ে থাকে।

এই সময় রাত্তিরের ঘুমটা অনেকেই বিসর্জন দিয়ে বসে। গাঁয়ের মেয়েরা অবধি সবাই তৎপর হয়ে বসে থাকে। কখন থেকে খালই ভর্ত্তি মাছ আসতে সুরু করবে। অনেকে দু'মাস আগে থেকে সরষের তেল জমাতে সুরু করে দেয়, ঝাল, ঝোল, ভাজা, অম্বল— একেবারে যাকে বলে মাছের পঞ্চ-ব্যঞ্জন তৈরী হতে থাকবে। এই সময় পল্লীগ্রামের লোকেরা কোনো তরী-তরকারীর ধার ধারে না। মাছে যখন অরুচি ধরে যায় তখন সুরু হয় ডাঁটা আর কাঁঠালের বীচির তরকারী।

একদিন নিঝুম গ্রীষ্মের নিশীথ-রাতে ফটিকের বাইরের ঘরের জানালায় টোকা পড়ে—টক্-টক্ টক্—

—ফটিকের কান সজাগই ছিল। তড়াক্ করে লাফিয়ে ওঠে বিছানায়। এই বয়েসটাই এমন যে একটা চাঞ্চল্যকর কিছু করতে পারার জন্যে দেহ আর মন একেবারে উৎসুক হয়ে থাকে :

রতন ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, ফটিক, উত্তরের চক দিয়ে জল এসে সেনেদের বাড়ীর পুকুরে পড়ছে, মাছ ধরতে চাস্ ত' শীগ্‌গির চলে আয়।

ফটিক জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে শুধু রতনই নয় ; পাড়ার ঘণ্টে, চটপটি, মাকুন্দো, ষষ্টি, টোনা, ছায়েদ মিঞা অনেকেই আছে।

ঘরের এক কোনে "পলটা" ঠ্যাকানো ছিল, খালৈ ছিল বেড়ার গায়ে ঝোলানো, দু'টো তাড়াতাড়ি হাতে নিয়ে—লণ্ঠনটাও তুলে নিলে, তারপর নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

কারো মুখে কোনো কথা নেই।

সবাই এগিয়ে চলেছে সেন বাড়ীর খালের দিকে।

বহু দূর থেকেই দেখা যাচ্চে—অনেকগুলি আলো নড়াচড়া করে ফিরছে খালের মধ্যিখানে আর তার উঁচু দু'পাড়ে।

ফটিক অবাক হয়ে দেখলে, এই নিশুতি রাতে এরই মধ্যে বহু লোক জমা হয়ে গেছে—নানা বয়েসের, নানা ধর্ম্মের। শুধু রাধেশ্যাম বৈরাগীর আখড়া থেকে কেউ আসেনি--যেহেতু ওরা বৈষ্ণব। কিন্তু মজা এই যে, মাছ যারা খায়, তারাও মালপো ভোজের দিন বত্রিশপাটি দাঁত বের করে প্রসাদের লোভে গিয়ে আখড়ায় হাজির হয়।

গাঁয়ের এই বড় মজা! কোন্ বাড়ীতে কি আয়োজন একবার জান্‌তে পারলেই হল! তারপর গিয়ে আসর জমাতে ওদের মনে এতটুকু দ্বিধা নেই; সবাইকে আপনার করে নেবার কৌশল গাঁয়ের মানুষেরা যেমন জানে, এমন আর কেউ নয়।

উঁচু-নীচু পথে তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে ওরা ক্রমাগত হোঁচট্ খেতে লাগল—-কিন্তু সেদিকে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই।

পল্লী অঞ্চলে এমন বহুলোক আছে যাদের ডাকে নাকি মাছ সাড়া দেয়। তার মানে,—মাছ ধরতে গিয়ে তারা কখনো মুখ শুকনো করে ফিরে আসে না। জলে নামলে খালৈ ভর্ত্তি করে তারা ফিরে আসবেই।

এই জাতীয় একটা দল ইতিমধ্যেই খালের সামনের দিকটা "পল" নিয়ে আটকে ফেলেছে। সেখানে যে আর কেউ ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবে তার আর উপায় রাখেনি।

উত্তরের ক্ষেত থেকে জলটা এসে খাল ধরে সেনেদের পুকুরে পড়ছে। কাজেই ক্ষেতের প্রচুর মাছ জলের তোড়ে চলে আসছে পুকুরের দিকে, আর পলধারী ব্যক্তিরা ছপাছপ্ শব্দে তাদের আটকে ফেলছে, আর খালৈতে ভর্ত্তী করছে। বড় মাছ হলে হাতের কৌশলে ধরে ফেলে শক্ত দড়িতে গেঁথে ঝুলিয়ে নিচ্ছে।

রতন প্রায় হতাশ হয়ে বল্লে, ভাই, আমরা যে এখানে আজ রাত্রে ওদের হাত কাটিয়ে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারবো এমন মনে হয় না! কাজেই মাছ ধরবার অন্য পথ আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। খালি হাতে আমরা কেউ বাড়ী যেতে রাজী নই। সবাই মাথা নেড়ে বল্লে, নিশ্চয়! দরকার হলে আমরা অন্য কোন ঘাঁটি আগলে আগে থেকে

দাঁড়াবো। চুলের মধ্যে বার কয়েক আঙুল চালিয়ে ফটিক হঠাৎ বলে উঠল, আমার মগজে ভারী মজাদার একটা বুদ্ধি এসেছে—তোরা যদি সেটা মেনে নিস ত' অতি সহজেই অনেক মাছ আমরা জোগাড় করতে পারবো—

সকলের মুখ থেকে এক সঙ্গে প্রশ্ন জাগলো, কি বুদ্ধি ?

খালের ধারে ঘনিষ্ঠ হয়ে ফটিক বল্লে, তবে শোন্! যে রকম তোড়ে সেন বাড়ীর পুকুরে জল পড়্ছে তাতে মনে হয় যে আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এই পুকুরটা একেবারে ভর্ত্তি হয়ে যাবে। এই পুকুরটার পশ্চিম ধারে রয়েছে জল নিকাশের একটি খাল। ওটার মুখ এখন বন্ধ।

সবাই মাথা নেড়ে জবাব দিল, ঠিক! ঠিক!

ফটিক বলে চল্লো, সবাই এখন ব্যস্ত এই উত্তর চকের খালে মাছ ধরায়। আমরা যদি ইতিমধ্যে চুপি চুপি গিয়ে পশ্চিম দিককার খালটার মুখ খুলে দি, তবে পুকুরের মাছ ত পাবোই - আর তার সঙ্গে পাবো নতুন জলের বাড়তি মাছ। তোরা রাজি আছিস ত ?

সবাই চীৎকার করে উঠল, নিশ্চয়।

ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ফটিক বলে, চুপ। আগে কাউকে জান্তে দেয়া হবে না।

রতন রসিকতা করে জবাব দিলে, আমরা ঠোঁটের মধ্যে একেবারে তালাচাবি বন্ধ করে রাখবো—কোন ফাঁকে একটি কথা গলিয়ে বেরুতে পারবে না।

মাকুন্দো মুখ চট্‌কে বল্লে, আহা এই নতুন জলের মৌরলার যা স্বাদ, একেবারে জিবে লেগে থাকে। তার ভেতর একটি পেঁয়াজ কুঁচি ছেড়ে দিতে হবে।

ফটিক ওকে ধাক্কা দিয়ে সচেতন করে বল্লে, পেঁয়াজ কুঁচি ছাড়বি এখন পরে, একেই বলে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ! শোন্, আমাদের সবগুলি লণ্ঠন আগে নিভিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে। নইলে আমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সেন বাড়ীর লোকেরা এসে গোলমাল সুরু করতে পারে !

ছায়েদ বল্লে, দেখ ভাই, কাল আমার ভারী জ্বর হয়েছে আজ আর পাণির মধ্যে নামতে চাইনে। আমি এক কোনে বসে তোদের সবাইকার লণ্ঠন পাহারা দি'—তোরা যাবার সময় একমুঠো করে মাছ আমার খালৈয়ে ফেলে দিস্, তা'হলেই আমার কাজ চুকে যাবে। রতন খুশী হয়ে জবাব দিলে, খুব ভালো প্রস্তাব।

তখন সবগুলি লণ্ঠন কমিয়ে এক সঙ্গে জড়ো করে ছায়েদ গিয়ে বসল একটা গাছের তলায়, আর ছেলের দল পা টিপে-টিপে নেমে গেল দক্ষিণদিকের খালের ধারে।

টোনার বাড়ী এখান থেকে সব চাইতে কাছে। সে বল্লে, আমি একটা কোদাল চট্ করে নিয়ে আসি, তা হ'লে বাঁধ কেটে দিতে আর কিছু বেগ পেতে হবে না।

ফোঁড়ন কেটে ফটিক বলে,—কে বলে টোনার বুদ্ধি নেই ? শান দিলে ওর মগজেও দিব্যি চক্‌চকে ধার ওঠে। সবাই প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠল।

ছেলেরা যদি একান্ত ভাবে কোনো কিছু করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে, তারা কাজের মানুষ হয় সব চাইতে বেশী।

টোনা আর চট্‌পটি দুটো কোদাল জোগাড় করে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। তারপর বাঁধ কাটতে আর কতক্ষণ লাগে ?

সবাই উত্তর পাড়ে মাছ ধরা নিয়ে ব্যস্ত, কাজেই পশ্চিম পাড়ের নীরব কর্মীদের খবর তাদের রাখবার কথা নয়।

ফটিক মিছে অনুমান করে নি। আনুসঙ্গিক কাজ শেষ করে তৈরী হয়ে নিতেই এক ঘণ্টার মধ্যে পুকুর থেকে জল হু-হু শব্দে বেরিয়ে আসতে লাগল—আর সেই সঙ্গে এলো রকমারী মাছ- পুঁটি, মৌরলা, পাপ্‌তা, আড়, কৈ, মাগুর আরো অনেক কিছু—

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যেকের খালৈ ভর্ত্তি হয়ে গেল। ছায়েদ ওপর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে আবেদন জানালে, আমার জন্যে একমুঠো করে মাছ ধরিস ভাই, আমার নানীটা আজও জ্বরে ভুগছে। বড্ড অরুচি। মৌরলা মাছের ঝালচচ্চড়ি খেলে অসুখ একেবারে সেরে যাবে—

হঠাৎ খালের ওপর থেকে একটা হুঙ্কার শোনা গেল—এখানে অন্ধকারের মধ্যে কে মৌরলা মাছ ধরে রে? রোসো দেখাচ্ছি মজাটা···

কী সর্ব্বনাশ! এ যে সেন বাড়ীর বুড়ো কর্তা সর্বেশ্বর সেনের গলা। বুড়ো এই রাত্তিরে যে আবার পুকুর পাহারা দিতে এসেছে সে কথা কে ভাবতে পেরেছে বলো?

বুড়ো সর্বেশ্বর লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে এগিয়ে এসে পুকুরের উঁচু পাড় থেকে লণ্ঠন তুলে ধরলেন।- কে রে ওখানে?

তখন আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো মতেই যুক্তি যুক্ত নয়। আজই না হয় বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু স্বদেশী যুগে সর্বেশ্বর সেন নাম করা লাঠিয়াল ছিলেন, তাই আজও গ্রামের সবাই তাঁকে খাতির-মান্য করে চলে।

—দেখেছ! দেখেছ। ছোঁড়ার দল পশ্চিম পাড়ের বাঁধটা

অন্ধকারে বেমালুম কেটে দিয়েছে ! সব মাছ যে বেরিয়ে গেল পুকুর থেকে ! ওরে বিষ্টে, ওরে বৈকুণ্ঠ, শীগ্‌গীর ছুটে আয়—

কিন্তু বিষ্টে আর বৈকুণ্ঠ ছুটে আসবার আগেই ছেলের দলের একেবারে পোঁ-পোঁ করে পলায়ন ! পেছন থেকে ছায়েদ একরাশ লণ্ঠন দু' হাতে ধরে ক্রমাগত চীৎকার করতে লাগলো—

ওরে ফটকে—ওরে টোনা, একটু দাঁড়িয়ে যা, নইলে আমায় একা পেয়ে বুড়ো একেবারে তক্তা বানিয়ে ছাড়বে !

চার

তুলসী-তলা গ্রামের ছেলের দল রথ-তলার মেলার জন্যে দিন গুন্‌ছে।

প্রকাণ্ড কাঠের তৈরী উঁচু রথ। গ্রামের জমিদারেরা সাত পুরুষ আগে তৈরী করে দিয়ে গেছেন···কিন্তু এখনো একেবারে অটুট আছে এমন শক্ত এর কাঠ এবং এমন সুন্দর এর কারু-শিল্প !

সারা বছর ধরে রথটি একটি টিনের ঘরের মধ্যে আত্ম-গোপন করে থাকে···জগন্নাথের ভক্তদল যখন রথের দড়িতে টান দেয়, তখন ঠাকুর বেরিয়ে আসতে পথ পান না ! সামনেই বিরাট মাঠ। একপাশ দিয়ে চওড়া খাল বয়ে গেছে। ওই বিরাট মাঠে মেলা বসে যায়। আশে-পাশের বহু অঞ্চল থেকে দোকানী-পসারী এসে মেলাকে জাঁকিয়ে তোলে। নাগরদোলা, ম্যাজিকের দল, পুতুল নাচ, পাঁপড় ভাজার দোকান, রঙ বেরঙের খেলনা, পাতার বাঁশী, কাপড়ের দোকান, হাঁড়ি, কুঁজো, কলসী কিছু আর বাদ থাকে না। তেলে ভাজা জিনিষ

আর পাঁপড় ভাজার গন্ধে ছুটে আসে গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-মেয়ের দল; মাঠে আর তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না।

কিন্তু রথের অনেক দিন আগে থেকেই ছেলের দলের কাছে আর একটি মস্ত বড় আকর্ষণ আছে · সেটি হচ্ছে "লট্‌কা"। ওপরে খোসা, ভেতরে লাল লাল কোয়া, চমৎকার টক ফল। রথের কিছু আগেই তুলসীতলার আশে-পাশে এই ফল পাকতে স্নুরু হয়। ছেলেরা কাঁচা অবস্থা থেকেই চুরি করে এনে খেতে থাকে, আব বলে, লট্‌কার মধ্যে রথের গন্ধ পাওয়া যায়। লট্‌কা আর রথ— ছুটো এমন ভাবে ছেলেদের মনকে আকর্ষণ করে যে, একটিকে বাদ দিয়ে আর একটীর কথা ভাবতে পারা যায় না! তাইত লট্‌কা ফলের সঙ্গে সঙ্গে রথের দিনের ভাবী মেলার জন্য সকলের মন তৈরী হতে থাকে।

এই গাঁয়ের একান্তে ছেলেদের এক দরদী বন্ধু আছেন, তাঁর নাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু। এই মৃত্যুঞ্জয়বাবু নিজের বাড়ী থেকে বিশেষ বের হন না। গ্রামের প্রাচীন লোকদের কাছে শোনা যায় যে, মৃত্যুঞ্জয়বাবু স্বদেশী যুগের একজন নামকরা বিপ্লবী। এঁদের দলের ডাকাতির কাহিনী এখন প্রায় গল্প-কথায় দাঁড়িয়ে গেছে। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ঘর এক সময় ছেলে-পুলে, নাতি-নাত্নিতে ভর্ত্তি ছিল। কিন্তু এখন একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। ত্ব'জনেরই বয়েস হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় বাবু সারাদিন নানা রকম স্বদেশী-বিদেশী বই পড়েন, বাগান করেন, আর ছেলের দল গেলে তাঁদের কাছে স্বদেশী যুগের নানা রকম গল্প করেন।

শোনা যায় জেলে অমানুষিক অত্যাচার করে পুলিশ তাঁর একটা কমুই ভেঙে দিয়েছে। তবু তিনি দলের কারো নাম পুলিশের কাছে

উচ্চারণ করেন নি। এখন তিনি অবসর সময়ে নানারকম মাটির খেলনা তৈরী করে আপন মনেই তাতে রঙ্ লাগান, কিন্তু ছেলেরা চাইলে তাদের মধ্যে দু'হাতে বিলিয়ে দেন। এই আপন ভোলা সদাশিব মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছোট্দের একটা মস্ত বড় আশ্রয়স্থল। ছোটদের সব কিছু অত্যাচার ও আব্দার তিনি নীরব-হাস্যে সহ্য করেন।

সেই মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছ থেকে ছেলেদের ডাক এসেছে—ওরা ত' সবাই মহা খুসি। নিশ্চয়ই কোনো খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার! নইলে মৃত্যুঞ্জয়বাবু হঠাৎ ডেকে পাঠাবেন কেন?

ছেলের দল একসঙ্গে জোট বেঁধে তাঁর উঠোনে ঢুকলো।

ফটিক ত' প্রাণের আনন্দে চীৎকার করে উঠলো, জ্যাঠাইমা, কি গড়েছ? আমাদের যে আর সবুর সইছে না।

বারান্দার এক কোনে বসে মৃত্যুঞ্জয়বাবু একটি নতুন তৈরী পুতুলে রঙ্ দিচ্ছিলেন, হো-হো করে হেসে উঠে বল্লেন, আজ আর কোনো ব্যবস্থা নেই ফটিক। তোমরা এসে আমার কাছে বারান্দায় বোসো। আজ তোমাদের কাছে একটা কাজের কথা বলব।

সবাই গোল হ'য়ে তাঁকে ঘিরে বসল।

রতন শুধোলে, আপনাদের স্বদেশী যুগের গল্প শুন্‌বো—

মৃত্যুঞ্জয়বাবু রঙ্ করা বন্ধ করে চশমাটিকে কপালের ওপর তুলে বল্লেন, সে আর একদিন হবে বাবা। ও গল্প কি আর শেষ হয়? কিন্তু আজ হবে কাজের কথা—

টোনা বল্লে, আচ্ছা, তাহলে কাজের কথাই বলুন।

চট্‌পটি ফিস্‌ফিস্ করে বল্লে, আজ খাওয়াটা মাটি হল দেখছি।

ফটিক উৎসাহিত হয়ে বল্লে, আচ্ছা আপনি আমাদের কাজের

কথাই বলুন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু ধীরে ধীরে সুরু করলেন, সেই কথা বলবার জন্যেই ত' তোমাদের খবর দিয়ে ডেকে এনেছি বাবা—শোন তবে, তোমাদের বোধ করি মনে আছে যে, গত বছর রথের মেলায় কলেরা হ'য়ে অনেক লোক মারা যায়। সেই কথাটা আজ সকাল বেলা আমার হঠাৎ মনে হ'ল। তোমরা একটু চেষ্টা করলেই মড়ক বন্ধ করতে পারো। এই কাজটা যদি করতে পারো ত' একদিন ভোজ পাবে আমার কাছে।

উৎসাহিত হয়ে ষষ্ঠি বল্লে, কি করে সেটা সম্ভব আপনি বুঝিয়ে দিন।—

ঘণ্টে ষষ্টির কথা টেনে নিয়ে জবাব দিলে, তা হলে আমরা পরিশ্রম করে সেই রকমই ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবো।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, আসলে দূষিত জল আর ভেজাল খাবার খেয়েই এই রোগ দেখা দেয়। তোমরা যদি পালা করে মেলাতে পানীয় জল সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করো আর খারাপ তেলে খাবার তৈরীটা বন্ধ করতে পার, ত দেখবে কলেরায় একটি প্রাণীও মারা যাবে না।

ফটিক উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলে, এটা ত, খুব ভালো কাজের কথা আপনি বলেছেন। এখন আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি চলছে…… আপনার পরামর্শ মতো কাজ করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

চটপটি বল্লে, কিন্তু দোকানীরা আমাদের কথায় পাঁপড় ভাজা আর জিলিপি তৈরী বন্ধ রাখবে কেন?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু হেসে জবাব দিলেন, বন্ধ রাখতে ত' বলা হচ্ছে না,

তোমরা শুধু এইটুকু দেখবে যে, ভেজাল তেলে খাবার ভাজা না হয়। আমাদের পল্লী অঞ্চলে খাঁটি সরষের তেলের অভাব নেই। বেশী লাভের আশা না করে দোকানীরা যদি খাঁটি তেল দিয়ে খাবার তৈরী করে, তবে লোকের কোনো অসুখই করে না।

টোনা মাথা নেড়ে বল্লে, তা হলে দেখা যাচ্ছে—ছুটো কাজ আমাদের করতে হবে। এক, আগেই কুমোর পাড়া থেকে বড়ো বড়ো জালা জোগাড় করে তাতে ভালো ইন্দারার জল তুলে রাখা, আর ছুই—দোকানীদের অনুরোধ করা—তারা যাতে খাঁটি সরষের তেল দিয়ে খাবার ভাজে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুশী হয়ে বল্লেন, ঠিক কথা। কিন্তু তার সঙ্গে আর একটি কথাও যোগ করে দাও। ওই ইন্দারার ঠাণ্ডা জলে খানিকটা কর্পূরের গুড়ো ছেড়ে দিও, তা'হলে প্রতিষেধকের কাজ করবে। এবং পানীয় জলও সুস্বাদু হবে।

ফটিক জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু বড় বড় মাটির জালা? সে গুলো ত পয়সা দিয়ে আমাদের কিন্‌তে হবে—

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, কেন? তোমাদের দলে চটপটি রয়েছে। সে তো কুমোর বাড়ীর ছেলে। তাকে নিয়ে ওর বাবার সঙ্গে দেখা করো— ছুটো জালা এমনিতেই পাওয়া যাবে। এই ভাবে গোটা কুমোর পাড়ায় গোটা অষ্টেক জালা তোমরা চেয়ে-চিন্তে সংগ্রহ করতে পারবে না?

চটপটি উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলে, আচ্ছা সে ভার না হয় আমিই নিলাম।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্‌লেন, তাহলে ত' কাজটা তোমাদের অনেক সহজ হয়ে গেল। তোমাদের মেলাতে আরো একটা কাজ থাকবে—

মাকুন্দ শুধোলে, কি কাজ বলুন না—

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, একটা টিনের চালা তোমরা সাময়িক ভাবে তৈরী করে নেবে। ছেলেরা হাতে-হাতে খাটলে ছোট-খাটো একটা টিনের ঘর তোলা কিছু শক্ত নয়। লালসালুর ওপর সাদা কাপড় কেটে তাতে লিখবে 'অনুসন্ধান কেন্দ্র।' এই মেলাতে এসে বহু ছেলে-মেয়ে আর বৌ-ঝি সঙ্গী-সাথীদের হারিয়ে মহাবিপদে পড়ে। অনেক সময় দুষ্ট লোকের হাতে গিয়েও লাঞ্ছিত হয়। তোমরা যদি হারানো ছেলে-মেয়েদের সন্ধান করে এইখানে জড়ো করে রাখো তবে, অনেক বিপদের হাত থেকে তারা বাঁচবে। মাঝে মাঝে চোঙা দিয়ে মেলার মধ্যে বলবে যে, যারা সঙ্গী-সাথীদের হারিয়েছে তারা এইখানে এসে আশ্রয় নাও। এই ভাবে পরের উপকার করতে পারো তোমরা।

ঘণ্টে বল্লে, এটা খুব ভালো কাজ; আমি আর চট্‌পটি গোটামেলা চ'ষে ফেলে হারানো ছেলে-মেয়েদের খুঁজে নিয়ে আসবো।

—আরো একটা কাজ যদি তোমরা করতে পারো তবে ত' কথাই নেই—মৃত্যুঞ্জয়বাবু তৃপ্তির সঙ্গে প্রশ্নটা তুললেন।

ফটিক বল্লে, আপনি বলুন, আমাদের কষ্ট হলেও সে কাজ থেকে আমরা পিছিয়ে আসবো না। শুনতে বেশ ভালো লাগছে আপনার পরিকল্পনাগুলি। চুপচাপ ঘরের ভেতর বসে থেকে আপনি দেশের লোকের জন্য এত কথা ভাবেন?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ফটিকের এই কথার জবাব দিলেন না। শুধু মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলেন; তারপর একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, কাজের কথাটা না হয় শেষ করেই ফেলি।

সবাই সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বল্লে, সেই ভালো।—প্রাথমিক

চিকিৎসার একটা ছোট-খাটো কেন্দ্র যদি ঐ ঘরে খোলা যায় তাহলে তোমরা কি রকম মনে করো ?

রতন জবাব দিলে, ব্যাপারটা আপনি একটু বুঝিয়ে দিন, আমরা ত' এ ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি !

—তাহলে শোনো। মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাঁর চশমাটা আবার কপালের ওপর তুলে নিলেন।—এই মেলার সময় অনেক দুর্ঘটনা হয়—তোমরা লক্ষ্য করে দেখেছ বোধ হয়। এই ধরো, কেউ পা' মচ্‌কে ফেললে। গত সন ঝড়ে একটা টিন উড়ে গিয়ে কয়েকজন লোককে জখমই করে ফেল্লে। তারপর পাশেই রয়েছে মস্ত বড় খাল, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অনেক সময় ওখানে ডুবেও যায়। এই সব থেকে মানুষ গুলোকে বাঁচাবার জন্যে আমরা অতি সহজেই একটা "সেবাকেন্দ্র" খুলতে পারি। তারও ঘাঁটি থাকবে এই টিনের চালার মধ্যে।

ষষ্টি বল্লে, আমার এক পিশ্‌তুত ভাই মেডিক্যাল কলেজে পড়েন ; গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে টিঞ্চার আওডিন, তুলো, ব্যাণ্ডেজ—এই সব আছে দেখেছি। আমরা তাঁকে এই ব্যাপারে অনুরোধ করে রাজি করিয়ে নিতে পারি।

পরম উৎসাহিত হয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, নিশ্চয়ই তাঁকে রাজি করিয়ে নেবে। এতগুলি ছোট ভাইয়ের আব্দার তিনি কিছুতেই ঠেলতে পারবেন না। একদিন না হয় তাঁকে আমার রাসায় বেড়াতে নিয়ে এসো। চা খেতে খেতে তার সঙ্গে আমিও ভাব জমিয়ে নেবো'খন।

আপন রসিকতায় তিনি আপন মনেই প্রাণ খোলা হাসি হাসতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে জ্যেঠাইমা যে কখন এক ধামা মুড়ি তেল-নুন দিয়ে মেখে নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন, তা' আলোচনার জন্যে কেউ টের পায়নি। পাশে আর একটি পাথরের বাটিতে রয়েছে নারকেল টুকরো আর আঁখি গুড়।

এই মুড়ি জ্যাঠাইমার যে নিজ হাতে ভাজা সে কথা ছেলের দল সবাই জানে। চট্‌পটি দেখতে পেয়েছে সকলের আগে। সে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বল্লে, অ্যা! তবে নাকি খাবার কিছু নেই? আমি জানি জ্যাঠাইমার ভাঁড়ার খুঁজলে কিছু না কিছু মিলবেই।

আর সবাই বিশেষ কথা কাটাকাটির মধ্যে গেল না, গোল হয়ে বসে হাতের সঙ্গে মুখের কাজ নীরবে শুরু করে দিলে।

খানিক বাদে দেখা গেল—পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে এমন একটি টুক্‌রোও ধামা কিংবা বাটির মধ্যে পড়ে নেই!

গুড়ের বাটি শেষকালে চাটতে চাটতে চট্‌পটি সকলের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বল্লে, এইবার কাজে খুব জোর পাওয়া যাবে।

রথের দিন এগিয়ে এলো।

সেই সঙ্গে কেন্দ্রীভূত হত ছেলেদের আনন্দ আর উদ্দীপনা।

এবার শুধু মেলা দেখা, রথ টানা, আর কলা খাওয়াই নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সংগঠনমূলক কাজে ছককাটা ব্যবস্থা।

মেলার মাঝখানে ছোটদের তৈরী "সেবাকেন্দ্র" "অনুসন্ধান কেন্দ্র" সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুধু তাই নয়—সামান্য গল্পের ভেতর দিয়ে যার সূত্রপাত হয়েছিল, সেই ছোটদের প্রচেষ্টা গোটা মেলার

স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তুললো। ব্যাপার দেখে অভিভাবক দল অবাক হয়ে গেলেন।

প্রথমে দু'একটি অতিলোভী দোকানী বাজে খাবার চালাবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু ছেলেরা যখন সঙ্ঘবদ্ধ হল তখন তাদের সোজা পথে চলে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। ফলে এ বছর সংক্রামক রোগ দেখা দেবার সুযোগ পেলো না।

আর পানীয় জল পেয়ে ও-অঞ্চলের লোকেরা দু'হাত তুলে ছেলেদের আশীর্বাদ করতে লাগ্‌লো।

ফটিকদের বাঁধানো ইন্দারার জল এমন ঠাণ্ডা আর মিষ্টি যে, সারা গাঁয়ের লোক সদ্য তোলা সেই জল পেলে বরফ জলও চায় না।

এই জন্যে গ্রীষ্মকালে কলসী কাঁখে গাঁয়ের বৌদের এক মেলা বসে যায় ফটিকদের ইন্দারার পাশে। সেই জল ছেলেরা বয়ে নিয়ে গিয়ে সরবরাহ করল মেলার শুষ্ককণ্ঠ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে। এর আগের আগের বছর তেষ্টা পেলেই লোকেরা গিয়ে খালের জল আঁজ্‌লা ভ'রে পান করত, আর তারই ফলে নানান রকম রোগ ছড়িয়ে পড়ত মেলায়। এবার আর সেটি হবার যো নেই। কর্পূর দেওয়া ঠাণ্ডা ইন্দারার জল যেন সরবৎ-এর কাজ করল।

কিন্তু মেলার দ্বিতীয় দিনে তেলে ভাজা জিনিষের দোকানেব একটা খড়ো ঘরে হঠাৎ আগুন লেগে গেল। সেদিন ছিল অসহ্য গরম। দেখতে দেখতে আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু ছেলের দল স্বেচ্ছাসেবক রূপে সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা ছুটে এলো। সেই মাটির জালাগুলির সঙ্গে বাঁশ বেঁধে খাল থেকে জল বয়ে এনে অক্লান্ত পরিশ্রমে তারা আগুন নিভিয়ে ফেললে।

ইতিমধ্যে ছুটোছুটির ফলে গোটা মেলায় একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। সেটাকেও আয়ত্বে আনতে হল! কয়েকটি ছেলে মেয়ে লোকের চাপে জখম হয়েছিল। সেবা বিভাগে তাদের ধরাধরি করে এনে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল।

ফটিক এসে খবর দিলে, খাবারের দোকানের দোকানীর ডান হাতটা পুড়ে গেছে···সে একটা গাছ তলায় পড়ে ধুঁক্ছে। স্বেচ্ছা-সেবকের দল খবর পেয়ে সেইদিকে তৎপরতার সঙ্গে ছুটে গেল। এর চট্পট্ যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে ফেল্ল।

সন্ধ্যে বেলায় ছেলেদের মুখে সব খবর শুনে মৃত্যুঞ্জয় বাবু হেসে বল্লেন, এইবার তোমাদের একটি সত্যিকারের খাওয়া পাওনা হ'ল আমার কাছে!

পাঁচ

কিছুদিন থেকে গাঁয়ের লোকেরা বাঁশ কেটে স্তূপাকার করতে লাগলো। ছোট বাঁশ, মাঝারি বাঁশ, বড় বাঁশ···। ওরা বলে, বৈড়া আর তল্লা বাঁশ। কী হবে এত বাঁশে জাননা বুঝি? সামনেই শ্রাবণ সংক্রান্তি—মনসা পূজো। সেই উপলক্ষে বেরুবে—নৌকো বাচের মিছিল।

এই উপলক্ষে এ অঞ্চলে নৌকোর মিছিল একটা নাম করা উৎসব।

বর্ষার জলে খাল, বিল, নদী-নালা মিশে গেছে···টুই টম্বুর জল থৈ-থৈ করছে···

মাঠ হয়ে গেছে বিরাট দীঘি···

সেইখানে নৌকোর মিছিল বেরুবে।

শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন বিশখানা গাঁয়ের লোক এইখানে এসে ভেঙ্গে পড়ে।

আরো মজার ব্যাপার এই যে, অন্য সময়ে যে-একখানা বাঁশের মালিকানা স্বত্ব নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা এমন কি মাথা-ফাটাফাটি হয়ে যায়—এই শ্রাবণ সংক্রান্তির মিছিলের জন্যে সবাই কিন্তু মুক্তহস্ত হয়ে পড়ে বলে, নিয়ে যাও না কটা দরকার ঝাড় থেকে কেটে। ও আবার জিজ্ঞেস করবার কি আছে? মা মনসার পূজো···এ ত সবাইকার কাজ। হাসিমুখে সবাই বাঁশ কেটে স্তূপাকার করতে থাকে। গাঁয়ের লোক সারাদিন যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কেউ মাঠে খাটে, কেউ দিন-মজুরী করে, কেউ জমিদারী সেরেস্তায় খাতা লেখে, কেউ

ঘরামীর কাজ করে, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা এসে জমায়েত হয় এই বাঁশ কাটার কাজে। কুপি জ্বালিয়ে চলে অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত এই খট্-খটা-খট্ শব্দ !

দুটি পাড়া নিয়ে গ্রামখানি।

পূব পাড়া আর পশ্চিম পাড়া।

এই নৌকো সাজানোর ব্যাপার নিয়ে দুই দলে আবার রেষারেষি। কার পাড়ার নৌকো সাজানো ভালো হয়—গুণীজনেরা দেখে বিচার করবে। পূব পাড়ার নৌকো সাজাবার দল এসে জমা হয় জীবন বাবুদের বাড়ীতে। আর পশ্চিম পাড়ার দল জোটে ইন্দুবাবুদের বাইরের বাড়ীর বিরাট উঠোনে। নৌকো সাজাবার পদ্ধতিও দেখবার মতো···দু'তিনখানি নৌকো পাশাপাশি রেখে, তার ওপর বাঁশের চমৎকার মঞ্চ তৈরী করা হয়। সেই মঞ্চ যখন গাঁয়ের লোকের হাতের তৈরী নানা রকম পিচবোর্ডের নক্সা, কাপড়ের ঝালর, কাগজের শিকল আর বাহারী পাতায় সাজানো হয়, দেখে কে বলবে যে, বহু টাকা এর জন্যে ব্যয় করা হয়নি ? সেই সব পাতা, ঝালর, শিকল আর নক্সার ফাঁকে ফাঁকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বেলোয়ারী ঝাড়-লণ্ঠন। নৌকা চলবার সময় জলে গিয়ে তার ছায়া পড়ে কী চমৎকার শোভারই না সৃষ্টি করে !

বাঁশে তৈরি মঞ্চ আর বাঁশ বলে চেনবার যো থাকে না ··এমনি সব কারুকার্য্য খচিত হয়ে ওঠে ওগুলো। গাঁয়ের মেয়েরা পর্য্যন্ত ঘরে বসে নানা রকম নক্সা আর ঝালর কেটে সাজানোর কাজে সাহায্য করে।

এই সব মঞ্চের ভেতর জ্যান্ত মানুষ দিয়ে সাজানো নানা রকম

দেব দেবীর মূর্ত্তি সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কোনো নৌকোয় অন্নপূর্ণা-শিব, কোনো নৌকায় দশ মহাবিদ্যা, কোথায়ও রাধাকৃষ্ণ, কোথাও বা দক্ষ-যজ্ঞ। গাঁয়ের লোকেরাই নানা ভূমিকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেজে দাঁড়িয়ে থাকে। একটুকু বিরক্তি নেই তাতে।

এত গেল পৌরাণিক দিক।

আবার সামাজিক ব্যাপার নিয়েও কৌতুকজনক সং সাজানো হয় গাঁয়ের সারা বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা থেকে।

কে নষ্টচন্দ্র করতে গিয়ে ধরা পড়ে গালে চূণ-কালী মেখেছে; গাঁয়ের কোন্ বুড়ো দুটো বিয়ে করে হাসির খোরাক জুগিয়েছে; কোন্ মেয়ের বিয়েতে এসে বরযাত্রী দল মার খেয়ে পালাতে পথ পায়নি; কে সামাজিক বিধি নষ্ট করে কেচ্ছার সৃষ্টি করেছে; কার বাপের শ্রাদ্ধে লুচি কম পড়ে গিয়েছিল···সব কিছু নিয়ে মজাদার ছড়া তৈরী করে গাওয়ানো হয়ে থাকে।

পল্লী-কবিরা সারা বছর ধরে এই সব কেচ্ছার ছড়া তৈরী করে আর সন্ধ্যেবেলা গুব্-গুবা-গুব্ বাজিয়ে তার মহলা চলে। এই সব ছড়া কাটার সঙ্গে হাতে আঁকা নানা রকম ছবি চ্যাটাইয়ে লেই দিয়ে সেঁটে নৌকোর চারদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সেই ছবি দেখতে আর ছড়া শুনতে যে লোকের ভীড় জমে তাকে সামাল দেয়া দায়!

আর একটা দল জোটে লম্বা লম্বা ছিপের নৌকো নিয়ে। সে দলে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই থাকে।

তারা মনসা-মঙ্গলের ভাসান গায়, জারি গান গায় আর কসে দাঁড় টেনে নৌকো বাচ দেয়।

এই নৌকো বাচ্ নিয়ে সার গাঁয়ে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, চোখে না দেখলে সেটা বুঝে ওঠা শক্ত।

'হেঁইও জোয়ান্', 'সাবাস্ জোয়ান্'—ধ্বনিতে সারা জলভূমি মুখরিত হয়ে ওঠে। মেয়েরা খৈ ছিটিয়ে দেয়, মঙ্গলশঙ্খ বাজায়, গামছা উড়িয়ে লোকেরা দু'পাড় থেকে উৎসাহ দেয়···আর যে দল নৌকো বাচে জেতে, গ্রামের লোক চাঁদা তুলে তাদের নতুন ধুতি ইনাম দেয়। হিন্দু-মুসলমান সবাই হাসিমুখে সেই নতুন ধুতি নিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

এই নৌকো বাচ্‌কে কেন্দ্র করে জলের ধারে ধারে কত যে রকমারী দোকান বসে যায় তার সীমা সংখ্যা নেই। মিঠা পানির দোকান, তেলে ভাজা জিলিপির দোকান, পান বিড়ির দোকান, খেলনার দোকান, লটকার দোকান। সবাই প্রাণপণে চীৎকার করে, আর গরম জিলিপি কিনে খায়। বলে, গলাটাকে ঠিক রাখতে হবে ত'!

নৌকোয় যারা বাচ খেলে, তারাও যাবার সময় নতুন হাঁড়ি মেলা থেকে কিনে জিলিপি ভর্ত্তি করে নিয়ে যায় বাড়ীর জন্যে।

তারপর সাতদিন ধরে গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে চলে সমালোচনা। ক্ষেতে কাজ করতে করতে হুকো টানে আর কৃষাণেরা বলে, 'পশ্চিম পাড়ার বেউলোর' গান এবার বড় ভাল হয়েছিল। সত্যি, চোখ ভরে জল আসে। আর কালীয় দমন? আর একজন ফোঁড়ন কাটে। আমার ছেলেটাই ত' শ্রীকৃষ্ণ সেজে দাঁড়িয়েছিল। কি সুন্দর মানিয়েছিল আমার ব্যাটাকে।

আর একজন কৃষক আবার ধমক দিয়ে বলে, আরে নিজের ব্যাটার

অত গুণ ব্যাখ্যান করতে হবে না! পূব পাড়ার হিরু কর্ত্তার বাপের শ্রাদ্ধে লুচি পড়ে ছিল কম, তাই নিয়ে যে কেচ্ছাটা "গুব্-গুবা-গুব্" বাজিয়ে গেয়েছিল ভারী জমে উঠেছিল ছড়াটা। ওটা তোমাদের মনে আছে? শিখে নিতে হবে—ভারী রসের জিনিষ! .

মেয়েদের স্নানের ঘাটে তেমনি আলোচনা চল্‌তে থাকে,—হ্যালা বকুলফুল, তোর মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী দল যে মার খেয়েছিল, তাই নিয়ে ভাসানে নাকি ছড়া কেটে ছিল? ওমা! কি লজ্জা। আমার ছোট ছেলেটার জ্বর বলে এবার মনসা-ভাসানে যেতে পারি নি! মা মনসা, অপরাধ নিওনা মা। এই বর্ষিয়সী মহিলাটি উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন।

পাড়ার বিন্দেপিশি বললে, পশ্চিম পাড়ার ধনাকর্ত্তা কাশীতে গিয়ে লুকিয়ে আর একটা বিয়ে করে এসেছে, তারি জারি গান বেঁধেছে গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো—শুনে হেসে বাঁচিনে।

ধনাকর্ত্তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী নাত্নীর হাত ধরে স্নানে এসেছিলেন। বিন্দে পিশির কথা শুনে তিনি পালাতে পথ পান না—!

বিন্দে পিশি তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, অমন সোয়ামীর মুখে আগুন।

পাড়ার একটী মেয়ে এগিয়ে এসে বললে, এ তোমার কিন্তু ভারী দোষ পিশি! ঠানদিকে মিছি মিছি কথা শোনানো কেন বাপু? তিনি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। সোয়ামী বিয়ে করেছে, তা তিনি কি করবেন?

—না! গানটা ভারী জমেছিল কিনা, তাই তোদের বল্‌লাম! দাঁতে মিশি মাখতে মাখতে বিন্দে পিশি মন্তব্য করে।

বাবুদের বৈঠকখানায় আবার আলোচনা চলে অন্য পথে। পূব পাড়ার গণেশবাবু বলেন, আমি যে লুকিয়ে লুকিয়ে একটু-আধটু নেশা-ভাং করি, তা' গাঁয়ের ছেলেরা জানলে কি করে? বাড়ীতে জামাই মেয়ে···ওরা ভাসান দেখতে এসেছে···আবার আমার নামে ছোঁড়ার দল ছড়া কেটেছে, ছবি এঁকেছে।

বিশুখুড়ো হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, ঠিকই করেছে। তোমার নাতি-নাত্নিতে ঘর ভর্ত্তী···এখন ভালো-ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দাও। ধর্ম্মে-কর্ম্মে একটু মন দাও—তা নয়, নেশার দিকে তোমার মতি-গতি! গাঁয়ের ছেলের দল ঠিকই করেছে। এইবার যদি তোমার চৈতন্য হয়।

—তা যা বলেছ বিশুখুড়ো! লজ্জায় আমি মেয়ে-জামাইয়ের সামনে বেরুতে পারছি না। বড় ছেলেটা ত' রাগ করে কাল রাত্তিরে কলকাতায়ই চলে গেল। এইবার থেকে সামলে চলতে হবে। মাথা নাড়তে নাড়তে গণেশবাবু জবাব দিলেন!

জনার্দ্দনবাবু বল্লেন, আর ঐ পশ্চিম পাড়ার বাপ-ব্যাটার মাম্‌লা মোকদ্দমার ব্যাপারটা। ওর মধ্যে আমায় টানলে কেন? বাপ ব্যাটায় মাম্‌লা করছে করুক—তার মধ্যে জনার্দ্দন সরকারকে নিয়ে টানাটানি কেন বাপু?

আবার প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠলেন বিশু খুড়ো। চোখ খুটো পিট্‌পিট্ করে জবাব দিলেন, দেখ বাপু জনার্দ্দন, তোমরা ছেলেদের যতটা বোকা আর অনভিজ্ঞ মনে কর—ওরা তা নয়। আজ কাল চোখ চেয়ে তাকাতে শিখেছে—

—হুঁ! আমি বুঝতে পেরেছি! ওদের চোখ ফুটিয়েছে ওই

মৃত্যুঞ্জয়বাবু। আচ্ছা, আমারও নাম জনার্দ্দন সরকার—দেখে নেবো!

বিশু খুড়ো তাকে শান্ত করে বল্লেন' আরে ভায়া, চোটোনা. বোস বাপ-ব্যাটার মধ্যে ঝগড়া যে তুমিই লাগিয়ে দিয়েছ,·আর তুমিই যে মাঝখানে বসে কলকাটি নাড়ছ. সেটা কি ছেলেদের অজানা থাকে ভেবেছ? খামোকা ওদের ঘরের অতগুলো জমানো টাকা উকিল মোক্তারে লুটে পুটে খেলে। তার চাইতে আমি বলি কি, এইবেলা মিটিয়ে ফেল। ওই গাঁয়ের ছেলের দল আবার তোমার গলায় ফুলের মালা দিয়ে মিছিল বের করবে।

আম্‌তা আম্‌তা করে জনার্দন সরকার জবাব দিলে, কিন্তু মেটাতে চাইলেই কি মেটে? ভারী শক্ত মামলা! একেবারে জট্ পাকিয়ে গেছে। এ গেরো খোলা কি সোজা কাজ দাদা?

বিশু খুড়ো কাউকে খাতির করে কথা কয়না তাই বল্লে, তার মানে তোমারও বেশ দুপয়সা ঘরে আস্‌ছে এই মামলা মোকর্দ্দমার নাম করে! কাজেই তুমি মিটিয়ে ফেলতে দিচ্ছ না। এখনো বলছি, যদি ভালো চাও ত' বাপ-ব্যাটায় মিল-মিশ করিয়ে দাও। নইলে ওই ছেলের দলকে আমি লেলিয়ে দেবো তোমার পিছনে!

—সে কি কথা! সে কি কথা! তোমরা আপনার জন, এমন ভাবে লাগ্‌লে আমার ত' আর গাঁয়ে বাস করা চলেনা!

বিশু খুড়ো হাসতে হাসতে জবাব দিলে', সোজা পথে চলো—গাঁয়ে আম দুধ খেয়ে মনের আনন্দে বাস করতে পারবে।

হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলে বসলেন. ছেলেদের সবাইকে লাঠি খেলা

শিখতে হবে। সকালবেলা মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বাইরের উঠোনটায় সবাইকে হাজির হতে হবে।

ছেলেরা বল্লে, লাঠি শিখ্‌তে রাজি আছি। কিন্তু শেখাবে কে?

—কেন, আমাদের বসির মিঞা ত এখনও মরে যায়নি! না হয় একটু বুড়ো হয়েছে। তারপর চুপি চুপি বল্লেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু, জানিস ত ঐ বসির মিঞা এক কালে ডাকাতদলের সর্দ্দার ছিল। আমিই ওকে দল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি আমাদের স্বদেশী দলে। তারপর অনেক কথা—

ফটিক উৎসাহিত হয়ে বল্লে, বলুন না তার সেই গল্প।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু মুখ টিপে হাসতে থাকেন। তারপর বলেন, এখনো তোদের শোনবার সময় হয়নি।

ফটিক-রতনের দল ভেবে পায়না মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মনের সিন্ধুকে কি সব চাঞ্চল্যকর কাহিনী লুকিয়ে আছে, যা তারা শুনতে পারে না। ভারী কৌতূহল জাগে কিশোর মনে। কিন্তু অকারণ উৎসুক হয়ে কোন লাভ নেই। ওরা জানে যখন সময় হবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু ডেকে দাওয়ায় বসিয়ে নিজেই সেই গল্পের ঝুলি তাদের সকলকার জন্যে খুলে দেবেন। কিন্তু বসির মিঞার কথা মৃত্যুঞ্জয়বাবু ভোলেন না, দিব্যি গাট্টা-গোট্টা খাটো মানুষ। সব চুল তার একেবারে সাদা হয়ে গেছে। কোমরে একটা গামছা সব সময়েই জড়ানো থাকে। হাতে পায়ের পেশীগুলো দেখলে এখনো ভয় লাগে। যেন তাল তাল এঁটেল মাটি দলা পাকিয়ে শরীরের সব জায়গায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ফোক্‌লা দাঁতে ফিক ফিক করে হাসে আর বলে, তোমাদের ননীর দেহ খোকা বাবুরা, তোমরা কি লাঠি ধরতে পারবে?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ধমক দিয়ে জবাব দেন, কেন পারবে না? ওই ননীর দেহকে তুমি লোহা করে গড়ে তুলবে। তবে বুঝব তোমার ক্যারামতি!

বসির মিঞার চোখ দুটি বুঝি আনন্দে জ্বলে ওঠে। বিগত দিনের কথা, বীরত্বের কাহিনী বোধ করি তার মনের কোণে উঁকি দিতে থাকে। লাঠিটা বাগিয়ে ধরে এক দুর্দ্দান্ত দস্যুর মতো সে মৃত্যুঞ্জয়-বাবুকে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়। তার শিরায় শিরায় শোণিত যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে; বুকের আর হাতের পেশীগুলো লোহার মতো শক্ত বলে মনে হয়। সূর্য্যের আলো ঠিকরে পড়ে সেগুলিকে আরো কঠিন করে তোলে।

কি করে লাঠি বাগিয়ে ধরতে হয়, কি ভাবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হয়, এই সব কসরৎ বসির মিঞা কিশোরদের দেখায়। দাওয়ায় বসে মৃত্যুঞ্জয়বাবু মিটি-মিটি হাসতে থাকেন। ঘুমন্ত বাঘ এইবার জেগে ওঠে। আর তার কোন ভয় নেই।

—দেখ্—দেখ্! এই বেলা তোরা দেখে সব শিখে নে। উৎসাহের আতিশয্যে মৃত্যুঞ্জয়বাবু মোড়া থেকে উঠে পড়েন।

আর একটা লাঠি বাগিয়ে ধরেন নিজে। তারপর বসির মিঞার দিকে অগ্রসর হন।

কী আশ্চর্য্য! মৃত্যুঞ্জয়বাবুও খেলা জানেন! ছোটর দল উৎসাহিত হয়ে নড়ে-চড়ে বসে। ছেলেদের চীৎকার শুনে জ্যাঠাইমা রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে বলেন, বুড়ো বয়েসে আবার ভীমরতি ধরল নাকি! যখন বসির মিঞা এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই বুঝেছি—আজ একটা কেলেঙ্কারী না হয়ে যায় না।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু রসিকতা করে জবাব দিলেন, কেন? নিজের কথাটাও ভুলে গেলে নাকি? না হয় রান্নাঘর ছেড়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে একবার মহিষ-মর্দ্দিনী বেশে বাইরে এসে দাঁড়াও না!

ফটিক চোখ ছুটো বড় বড় করে শুধোলে, অ্যাঁ! জ্যাঠাইমাও লাঠি খেলা জানেন তাহলে ?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে জবাব দিলেন, হ্যাঁ ওর গুরু হচ্ছে ওই বসির মিঞা।

বসির মিঞা কোন জবাব দিলে না। ফোকলা দাঁতে শুধু ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো।

এইবার জ্যাঠাইমা সত্যি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন।

—বুড়ো হয়ে মরতে বসলে, তবু তোমার বুদ্ধি পাকলো না। ছেলেদের সামনে যা খুসি তাই বলতে শুরু করলে! মুখের এতটুকু বাঁধন নেই তোমার!

এর পর বসির মিঞা আর মৃত্যুঞ্জয়বাবুর লাঠি স্থরু হল। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ!

সূর্য্যের আলোয় তুজনের চোখই জ্বলে উঠছে! তারপর মুখে কি হাঁই-হুঁউ শব্দ। হাতের লাঠি ঘুরছে বন্-বন্ করে, কোথায় লাঠি তা বোঝবার যো নেই—যেন ছুটি ভোমরা গুণ্ গুণ্ করে দ্রুত গতিতে পাক খাচ্ছে।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে ছেলেরা দেখতে থাকে। উৎসাহে জ্যাঠাইমাও যে কখন রান্না ফেলে বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন—নিজেই টের পাননি।

ছয়

প্রতিদিন বিকেলবেলায় ছেলেদের একটা বিরাট দল দু'তিনখানা নৌকো নিয়ে নদীর পথে পাড়ি জমায়, একজন করে হাল ধরে আর সবাই ছপ্-ছপ্ করে ছোট বৈঠে ফেলে তালে-তালে। কণ্ঠে তাদের তখন গান জেগে ওঠে :—

"আমি ভয় করবো না—
দু' বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না।
তরীখানি বাইতে গেলে—
মাঝে মাঝে তুফান মেলে!
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে—
কান্না কাটি কোরবো না"

খালের দুপাশের চাষাদের ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসে তাদের সমবেত গান শুনে···নৌকো তীরবেগে এগিয়ে চলে নদীর দিকে।

খাল আর নদী যেখানে মিশেছে, সেখানে প্রবল স্রোতের টানে বড় বড় মহাজনী নৌকোগুলি পর্য্যন্ত হিম্‌সিম্ খায়।

বড় নদীতে পড়বার মুখে হালের ছেলেরা চীৎকার করে ওঠে 'হুঁসিয়ার!' এই সময় নৌকোকে ঠিক মত বাগে রাখতে না পারলে ভাটির টানে সেই কোন্ দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই সবাই-কার সমবেত প্রচেষ্টায় নৌকোগুলিকে উজানের পথে পাড়ি দিতে হবে তবেই ফেরবার সময় তাদের এতটুকু বেগ পেতে হবে না। সন্ধ্যা বেলা ঘর মুখো হবার পালা। নদীর একটা জায়গায় চমৎকার একটী দ্বীপের মতো আছে। চারদিক দিয়ে জল কুলকুল করে বয়ে চলেছে।

কাশ ফুল আর সবুজ ঘাসে জায়গাটা ভর্ত্তি। একটা প্রকাণ্ড বট গাছ নদীর দিকে হেলে পড়ে যেন দর্পণে নিজের ছবি দেখছে।

রতন হাততালি দিয়ে বল্লে, এই দ্বীপের মধ্যে একদিন বন-ভোজন করলে বেশ হয়!

খাওয়ার নামে সকলকার জিবই রসালো হয়ে উঠল। ফটিক বল্লে, মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে ব্যাপারটা জানানো হোক। তিনি ত' আমাদের কথা দিয়েছিলেন যে, রথের মেলায় যদি আমরা ভালো করে স্বেচ্ছা-সেবকের কাজ করি তবে একদিন আমাদের কপালে ভোজ জুটবে। ঘণ্টে লাফিয়ে উঠে বল্লে, ঠিক কথা মনে করেছিস ভাই ফটিক! সে খাওয়াটার কথা ত ভুলেই গিয়েছিলাম।

ষষ্ঠি ছিল হালে। সে ধমক দিয়ে উঠে জবাব দিলে, আরে গেল যা! খাওয়ার নামে কাছা-কোঁচা একেবারে বে-সামাল হয়ে গেল যে তোর! এমন করে লাফিয়ে উঠেছিস যে, আর একটু হলেই নৌকো কাৎ হয়ে উল্টে যেতো!

চট্‌পটি মধ্যস্থ হয়ে কইলে, যাক্ ওকে দোষ দিসনে ভাই! দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাই এমন রসালো যে, ওটার কথা মনে হলে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল একেবারে একাকার হয়ে যায়। ঘণ্টে জলে ছিল কি ডাঙ্গায় ছিল, সেইটে তার আদপেই খেয়াল ছিল না। চটপটির কথা বলবার ধরণ দেখে সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। সেই হাসির শব্দে নদীর তীরে বসা একদল চখা ডানা ঝটপট উড়ে চলে গেল।

সেই দিন সন্ধ্যা বেলা।

ছেলের দল মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দাওয়ায় সবাই গিয়ে জুটেছে। মৃত্যুঞ্জয়বাবু পিদিম জ্বালিয়ে একটা মোটা ইংরেজী বই পড়ছিলেন।

ওদের পায়ের শব্দে তাকিয়ে চশমাটা কপালের ওপর তুলে ফেল্লেন, তারপর কৌতুক করে বল্লেন, কিরে, দল বেঁধে এসে জুটেছিস, মারবি নাকি ?

ফটিকও তেমনি রসিকতা করে উত্তর দিলে, আজ্ঞে, প্রাণে মারবে না, তবে আপনার পকেট মারবার মতলবে আছে সবাই।

এইবার জ্যোঠাইমা খিল খিল করে হেসে উঠলেন। তিনি বারান্দায় বসে তোলা উনুনে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর রাতের বেলাকার রুটি সেঁক্‌ছিলেন। বল্লেন, তাহলে বাবা, তোমাদের পরিশ্রমই সার হবে। ওই ছেঁড়া জামার পকেটে একটা ঘসা আধ্‌লাও খুঁজে পাবে না। মৃত্যুঞ্জয়বাবু এইবার বই বন্ধ করে হো-হো করে প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠলেন।

—আসল উদ্দেশ্যটা কি তাহলে খুলেই বলো ? মৃত্যুঞ্জয়বাবু এইবার বইয়ের পঠিত অধ্যায় থেকে মনটা ছেলেদের দিকে ঘুরিয়ে আনলেন বলে মনে হল। ফটিক ওদের মুখপাত্র। সে-ই কথাটা স্নুরু করলে।

—আজ্ঞে আপনি আমাদের কাছে ঋণ করে বসে আছেন।

রতন সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন দিয়ে বল্লে, সেই ঋণ থেকে আপনাকে মুক্ত করতে এসেছি—

জ্যাঠাইমাও শুনে অবাক হয়েছেন বলে মনে হল। তিনি শুধোলেন, কিন্তু উনি ত' কারো কাছে ঋণ করেন না। কবে টাকা নিয়েছেন তোমাদের কাছ থেকে বলো ত ?

যথা সম্ভব মুখখানাকে আরো গম্ভীর করে চটপটি বল্লে, উনি আমাদের একদিন ভোজ দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

ঘণ্টে কথা জুগিয়ে দেয়—সেই রথের মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হবার ব্যাপার নিয়ে।

ফটিক চোখ টিপে বল্লে, বেশীদিন ঋণটি অনাদায়ী পড়ে থাকলে তামাদিও ত' হয়ে যেতে পারে—

এইবার স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মনের আনন্দে এক সঙ্গে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে ওঠেন।—তা বেশ ত! তোমরা ত ঘরের ছেলে, আমার এখানে ডাল-ভাত কবে খাবে বলো—আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। জ্যাঠাইমা মায়ের আদরে প্রশ্ন করেন ছেলেদের।

ফটিক মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বলে, উঁহু ডাল-ভাত নয়—ভোজ।

ঘণ্টে বল্লে, তাও এখানে নয়—

—তবে? জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রশ্ন করেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। চটপটি বলে, আমরা জায়গা দেখে এসেছি। নদীর মধ্যে যে দ্বীপ,—সেইখানে হবে আমাদের বন-ভোজন।

টোনা বল্লে, তোরা কিন্তু আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিস সবাই—

ছায়েদ এইবার উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলে, হ্যাঁ, জ্যাঠাইমাকে সেখানে গিয়ে নিজের হাতে রান্না করতে হবে—খিচুড়ী, মাংস, পরমান্ন, চাটনী···

ষষ্ঠী মাথা উঁচু করে কইলে, খুব সকাল বেলা আমরা তিনখানা ছৈ-ওয়ালা নৌকো নিয়ে রওনা হয়ে যাবো। সারাদিন থাকবো সেই বট গাছের তলায়। নদীতে স্নান-রান্না-গল্প-গান-খাওয়া-দাওয়া—

—তারপর সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসবো গাঁয়ে, কথাটা শেষ করলে মাকুন্দো।

চশমাটা কপাল থেকে খুলে খাপে পুরতে পুরতে মৃত্যুঞ্জয়বাবু জবাব দিলেন, তাহলে তোমরা সব পরিকল্পনা পাকা করে নিয়েই এসেছ। গণতন্ত্রের যুগে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করবে—কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে শুনি?

একটা প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে সেদিনকার সান্ধ্য-আসরের পরিসমাপ্তি হল।

বন-ভোজের যে ফর্দ্দ ছেলেরা তৈরী করেছিল জ্যাঠাইমার-হেঁসেলে তার চাইতে অনেক বেশী পদ পাওয়া গেল। মিললো—ছেঁচকি, লাউ ঘণ্ট, মাছের তেলের বড়া, আমসত্ত্বের অম্বল, পিঠে, পায়েস, আর ঘরে পাতা খাসা দৈ।

এছাড়া গরম গরম খিচুড়ী আর মাংসের কথা ত' বলাই বাহুল্য।

সারাটা দিন ওদের কাটলো ভারী আনন্দে।

রতন তাদের বাড়ী থেকে বহুকালের পুরোনো একটা কলের গান নিয়ে গিয়েছিল। গান বাজে বটে তবে সেটা যে কি গান বহুক্ষণ কানে হাত রেখেও বোঝবার যো নেই! রামপ্রসাদী না ভাটিয়ালী, ঠুংরি না গজল?

ষষ্ঠী বল্লে, রাখ্ তো ষ্টিভেনসনের আমলের ভাঙ্গা ইঞ্জিন ওপাশে সরিয়ে, তার চাইতে আমরা সবাই মিলে যে কোরাস্ গান গাইব তা এই দ্বীপটাকে মাতিয়ে তুলবে।

ষষ্ঠী মিথ্যে কথা বলেনি।

চটপটি, ঘণ্টে, মাকুন্দো, টোনা, ছায়েদ, রতন, ফটিক আর ষষ্ঠী মিলে তারস্বরে গান সুরু করে দিলে…

জ্যাঠাইমা দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরে বল্লেন, আমার কানের পোকা বেরিয়ে গেল, তোরা বাপু গান থামা দিকি—

—তবে কি আপনার উনুন নিভে গেছে আমাদের গানে?

—জল তুলে আনবো জ্যাঠাইমা?

—আমি কুট্‌নো কুটে আপনাকে সাহায্য করি?

—মাছের মুড়োটা দা' দিয়ে আমি গুড়িয়ে দিচ্ছি—

—মাংসে কি হলুদ-লঙ্কা মাখাবো?

—লাউটা নদী থেকে ধুয়ে আনবো? নানাদিক থেকে প্রশ্নের বানে জ্যাঠাইমা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তিনি দু'হাত তুলে বল্লেন, ওরে বাবা, তোরা থাম দিকি! সবাই খুব কাজের ছেলে বেশ বুঝতে পেরেছি। তোমাদের বাছা কিছু করতে হবে না—শুধু আমি কি করি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌—

মৃত্যুঞ্জয়বাবু এতক্ষণ বড় বট গাছটার ছায়ায় বসে সেই মোটা ইংরেজী বইটা এক মনে পড়ে যাচ্ছিলেন, এইবার হাতের আঙ্গুলের মধ্যে নিশানা ঠিক রেখে বল্লেন শোনো তবে বলি, তোমাদের জ্যাঠাইমার এরকম ব্যাপার অনেক অভ্যেস আছে। তারপর চোখ বুঁজে সময়টা ঠিক করবার চেষ্টা করতে করতে বল্লেন,—প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। একদিন গভীর রাত্রে দলবল নিয়ে এসে হাজির হলাম বাসায়। সবাইকার পেটে তখন খিদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ইট-কাঠ যা পড়বে একেবারে মুহূর্ত্তে ভস্ম হয়ে যাবে। বল্লাম, বারোজনের রান্না করতে হবে এক ঘণ্টার মধ্যে,—তা তোমাদের জ্যাঠাইমা পেছপা ছিলেন না।

ফটিক বিজ্ঞের মতো শুধালো, কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা অত রাত্তিরে ? নিশ্চয়ই স্বদেশী ডাকাতি করতে—

মৃতুঞ্জয়বাবু সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না, শুধু মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

রতন জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা কোথায় গিয়েছিলেন সে কথা না হয় থাক। সে রাত্তিরে জ্যাঠাইমা আপনাদের কি কি রান্না করে খাইয়েছিলেন সেই কথা আমাদের বলুন।

চটপটি ফোঁড়ন দিলে নিশ্চয়ই আমাদের মত ভাগ্যি ভালো ছিল না, আপনাদের। খুব যদি জুটে থাকে তবে ভাত-ডাল আর একটা তরকারী।

জ্যাঠাইমা এতক্ষণ মজা করে ওদের কথা শুনছিলেন। বল্লেন, না, মাগুর মাছ জিয়োনো ছিল।

—তা দিয়ে কালিয়া না ঝোল ? জিজ্ঞেস করলে ষষ্ঠী।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন অতদিনের কথা কি আর মনে আছে ? তবে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে যে সবাই পেট পুরে খেয়েছিলাম সে কথা আজও ভুলতে পারিনি। তৃপ্তিটা আরো ষোল কলায় পূর্ণ হলো— যখন ভোর রাত্তিরে পুলিশ এসে আমাদের সেই বারোজনকেই সরকারী শ্বশুর বাড়ীতে জামাই আদরে ধরে নিয়ে গেল !

হা-হা করে প্রাণ-খোলা হাসি হাসতে লাগলেন তিনি।

ফটিক লাফিয়ে উঠে বল্লে, আজ জ্যাঠাইমার হাতের রান্না খেয়ে আমাদের যে সে রকম কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না সে কথা আমি হলফ্ করে বলতে পারি ; চাই কি বাজি রাখতেও রাজি আছি।

জ্যাঠাইমা বল্লেন, বাজি রাখতে হবে না। তার চাইতে তুই বরঞ্চ

এক কাজ কর। খিচুড়ির ডেক্‌চিটা খুন্তি দিয়ে বারে বারে নেড়ে দে, নইলে তলায় ধরে যেতে পারে। আমি মাংসটা ততক্ষণে দই, পেঁয়াজ আদা দিয়ে মেখে ফেলি। ফটিক একটা কাজের মতো কাজ পেয়ে মালকোঁচা মেরে বল্লে, হ্যাঁ এইবার আমি সত্যি একটা কেরামতি দেখাতে পারবো। খুন্তিটা দিন দেখি আমার হাতে।

ফটিক খুন্তি নাড়তে লাগলো আর জ্যাঠাইমা চলে গেলেন মাংস মাখতে। খুন্তি নাড়তে নাড়তে ফটিক যে কখন রতনের সঙ্গে সাঁতারের প্রতিযোগিতা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে তা' নিজেই ঠাহর করতে পারেনি। আলোচনা যত বেশী জোরালো হ'য়ে উঠেছে খুন্তি নাড়ার কাজ তত বেশী মন্থর হয়ে গেছে! হঠাৎ ওদের দুজনের আলোচনা ধমক দিয়ে থামিয়ে মাঝখানে রণচণ্ডী বেশে এসে হাজির হলেন জ্যাঠাইমা।

চীৎকার করে বল্লেন, যা ভেবেছি তাই! আরে বাপু, ছাগল দিয়ে কি আর ক্ষেত চাষ হয়?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু চশমা কপালে তুলে ভয় পেয়ে শুধোলেন, কি হলো আবার?

জ্যাঠাইমা কপালে করাঘাত করে জবাব দিলেন, হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু!—খিচুড়িটা ধরিয়ে ফেলেছে। আরে বাবা, খিচুড়ি নাড়তে নাড়তে অত বেশী সাঁতার কাটলে চলে!

জ্যাঠাইমার কথা বলার ধরণ দেখে সবাই নতুন মজা পেয়ে হো-হো করে হেসে উঠল, কিন্তু ফটিক বেচারীর মুখ একেবারে চূণ!

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বল্লেন, খিচুড়ীটা তলায় একটু ধরলে বেশ একটা গন্ধ হয়—চমৎকার স্বাদ লাগে জিবে···কি বলো তোমরা?

ফটিকের দশা দেখে সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, ঠিক! ঠিক!

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়বাবু মিথ্যে বলেন নি। তলায় সামান্য একটু ধরেছিল বটে, খাওয়ার সময় খিচুড়িটা লাগল ভালো। জ্যাঠাইমা ভয়ে ভয়ে বেশ কিছু লঙ্কা ঘুটে দিয়েছিলেন।

ছেলেদের যত চোখের জল পড়ে—বলে, জ্যাঠাইমা, আর একটু দাও ত', ফটিকের খিচুড়ি-পোড়া বড্ড ভালো হয়েছে!

খাওয়া হয়ে গেলে ছেলের দল হাতে হাতে সমস্ত বাসন-কোসন নদীর ধারে বসে মেজে ফেল্লে। তারপর রওনা হবার পালা। তিন-খানি নৌকো এক সঙ্গে রওনা হল।

ঝির-ঝির করে গাঙের হাওয়া বইছে···আকাশে উঠেছে চাঁদ। নাম-না-জানা পাখী ডেকে চলেছে নদীর এপার থেকে ওপারে। ছেলেদের কণ্ঠে জেগে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের গান।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু চোখ বুঁজে বল্লেন, এর চাইতে বড় স্বর্গ আর আমি কামনা করি না।

সাত

ছেলেরা যাচ্ছিল দল বেঁধে বিলে সাঁতার দিতে, বিশু খুড়ো তাদের ডেকে বল্লেন, ওরে, আমি যে তোদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছি। ছেলের দল থমকে দাঁড়ালো, বল্লে, কেন বিশু খুড়ো? নেমন্তন্ন করবেন বুঝি? বিশু খুড়ো লাঠি ঠুকে বল্লেন, নেমন্তন্ন ত' নিশ্চয়ই—তবে আমার বাড়ি নয়—কালীবাড়ি। চাঁদা তুলতে হবে—তা হলেই ছাঁদা বাঁধতে পারবি।

ঘণ্টে বল্লে, ও! বুঝতে পেরেছি। কালীবাড়ির বার্ষিক পুজো এসে গেছে বুঝি?

বিশু খুড়ো উত্তর দিলে, হ্যাঁরে! গাঁয়ের যারা মাথা—তারা ত' বে-মালুম ভুলে বসে আছে। তোদের যে মনে পড়ে সেইটেই ত' আনন্দের কথা। আমরা আর ক'দিন? তারপর তোদেরই ত' গাঁয়ের পালা-পার্ব্বণ বজায় রাখতে হবে।

ফটিক উৎসাহিত হয়ে শুধোলে, আচ্ছা বিশু খুড়ো, এবার যাত্রা হবে না?

—হবে না কি-রে? তোরা ব্যবস্থা করলেই হবে। আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তোল। আমি ফর্দ্দ তৈরী করে রেখেছি—

কিন্তু ফর্দ্দ ধরে চাঁদা তুলতে গিয়ে মহা গোলমাল। ছেলেরা যদি বলে, ফর্দ্দে আপনার নামে ধরা আছে ॥৹ আনা অমনি গণেশবাবু লাফিয়ে উঠে বল্লেন, অ্যাঁ বল কি? ॥৹ আনা? না বাপু, ওটা তোমাদের লিখতে ভুল হয়েছে।

বরাবর আমি ৵৹ আনা দিয়ে থাকি। তোমরা বাপু বিশু খুড়োর কাছ থেকে পাকা খাতাটা একবার দেখে নাও—

—কিন্তু বিশু খুড়ো যে নিজে ফর্দ্দ করে দিয়েছেন।

—এই দেখ কাণ্ড! আমার গলা কাটার মতলব হয়েছে বুঝি খুড়োর? আচ্ছা, আজ আসুক সন্ধ্যে বেলা। তার সঙ্গে আমার একটা বোঝা-পড়া হয়ে যাবে! মুখখানা আমশীর মতো করে গণেশ বাবু জবাব দেন।

—তাহলে আপনি চাঁদা দেবেন না?

শোন কথা! চাঁদা দেব না কে বল্লে? তবে আট আনা চাঁদা

দেব না। বরাবরের যে দু'আনা তা' যদি তোমরা নাও এক্ষুনি বের করে দিচ্ছি—। মুস্কিল আসানের আশায় গণেশবাবু ওদের মুখের দিকে তাকান।

কিন্তু ওখানে একেবারে মরুভূমি, কোনো মরুদ্যানের সন্ধান সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ফটিক বল্লে, দেখুন আমাদের কাছে চাঁদা দিতে হলে ওই পুরো আট আনাই দিতে হবে। আর দু আনা দিয়ে যদি কাজ সারতে চান তবে বিশু খুড়োর কাছে দেবেন। ষষ্ঠী বল্লে, এবার আবার বলির পাঁঠার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হঠাৎ যেন গণেশবাবুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মনে হ'ল।

—বলির সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে? বিশু খুড়ো সায় দিয়েছে?

—হ্যাঁ, খুড়ো নিজেই ত' আমাদের বল্লেন।

—আচ্ছা বাবা—তবে আট আনাই নিয়ে যাও, কিন্তু একটা কথা। পাঁঠা যখন কিন্‌তে যাবে হাটে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও, দিব্যি পুরুষ্টু পাঁঠা মায়ের স্থানে বলি দিতে হবে।

ভক্তিতে গণেশবাবু গদগদ হয়ে ওঠেন যেন। আনন্দের আতিশয্যে ট্যাঁক থেকে একটি চক্‌চকে আস্তো আধুলি বের করে ছেলেদের হাতে দিয়ে এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন প্রকাণ্ড একটা রাজ্যিই তিনি ঝোঁকের মাথায় দান করে ফেল্লেন!

জনার্দন সরকারকে ছেলেরা পাকড়াও করলে হাটে যাবার পথে। ভুরু কুঁচকে সরকার মশাই প্রশ্ন করলেন, চাঁদা? কিসের চাঁদা?—যেন তিনি এ অঞ্চলেরই লোক নন্।

—বারে—! কালীবাড়ির বার্ষিক পূজো ? ছেলেরা আবদার জানালে—

—ও ! বিশু খুড়োর ব্যাপার। খুড়োর যেমন খেয়ে-দেয়ে কোনো কাজ নেই ! .

—আপনার নামে ফর্দ্দে এক টাকা ধরা আছে।

—এক টাকা ? বলো কি ? বাসায় গিয়ে একটা সিকি নিয়ে এসো।

—হাটে চলেছেন টাকাটা আজকেই দিয়ে দিন না ! পূজোর ত' আর বেশী দেরী নেই ? চাঁদা সংগ্রহ করেই ত' সব কেনা-কাটা করতে হবে।

জনার্দন সরকার যেন সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো প্রমাদ গণ্লেন। হঠাৎ চটপটির উপর তার দৃষ্টি পড়ল।

একটা পন্থা তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন, এই চট্পটি, তোর বাবা আমায় চারটে হাঁড়ি দিয়েছিল, চারটেই ফুটো। দামটা নিয়ে গেছে আগাম। তোর বাবার কাছ থেকে চেয়ে টাকাটা ওদের দিয়ে দিস্।

ফটিক বল্লে, বারে ! তার সঙ্গে এ চাঁদা কি করে কাটাকাটি হবে ?

তিনি বল্লেন, হবে রে হবে। একই গাঁয়ের ব্যাপার ত' ! না হবার কি আছে ?

পাছে ছেলের দল আবার তাকে পাকড়ে ধরে, তাই লম্বা লম্বা পা ফেলে একেবারে হাটের পথে হাওয়া হয়ে গেলেন !

ওরা সবাই ফর্দ হাতে জনার্দন সরকারের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দেখলে, বসির মিঞা হাট করে ফিরে আস্‌ছে ; ছেলেরা ছুটে গিয়ে ওকে ঘিরে দাঁড়ালো।

বসির মিঞা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে শুধোলে, কি লাঠিয়াল ভাইরা, কি মতলব ?

আমাদের কালী পূজোর চাঁদা দিতে হবে ওস্তাদজী—

বসির মিঞা একগাল হেসে জবাব দিলে, আমি গরীব মানুষ, যদি তোমরা নাও ত' একটা সিকি দিতে পারি—

ফটিক বল্লে, আচ্ছা বেশ, তাই দাও।

বসির মিঞা ওদের হাতে একটা সিকি দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

রতন বল্লে, দেখ ত আমাদের ওস্তাদজীর নামে কত চাঁদা ধরা আছে ?

ফর্দ খুঁজে কিন্তু বসির মিঞার নাম পাওয়া গেল না। ছেলেরা নাম বসিয়ে দিলে। এমনি করে চাঁদা উঠল নেহাৎ মন্দ নয়।

এই বাৎসরিক কালী পূজো উপলক্ষ্য করে প্রতি বছর কালী বাড়ির সামনের খোলা মাঠে একটা করে মেলা বসে। বাঁশ পুঁতে ছোটো-বড়ো ঘর এখন থেকেই তৈরী হচ্ছে। কোথায়ও পুতুল নাচ হবে ; কোথাও বসবে কদমা-ফেণী বাতাসার দোকান ; কোথায়ও ছুরি কাঁচি, জাঁতি ইত্যাদির দোকান ; কাপড়ের দোকান, চিনির সাজের দোকান, মাটির পুতুলের দোকান, কাঠের খেলনার দোকান, খাবারের দোকান—কিছুই বাদ যাবে না।

কোথায় কিসের দোকান গত বছর বসেছিল তাই নিয়ে গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে আলোচনা তর্ক আর বাজি রাখা চলছে।

কার খেতের ফসল কত ভালো হয় তারি একটা প্রতিযোগিতাও

চলে প্রতি বছর। রাশি রাশি তরমুজ, ফুটি, শশা, কলা, আঁক, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি এসে জমা হয়। গাঁয়ের মাতব্বরেরা বিচার করেন; পুরস্কার দেয়া হয়; তারপর সব তরিতরকারি ফল-মূল কালী বাড়ি চলে যায়।

এবারও তার উদ্যোগ চলেছে পুরোদমে। কালী বাড়ির সামনে—উঁচু মাচার ওপর নহবৎ বসেছে। প্রতিদিন অতি ভোরে সেই নহবৎ-বাদ্যে ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে গাঁয়ের লোকদের।

সব চাইতে উত্তেজক আলোচনা চলছে যাত্রাদল নিয়ে। এই ব্যাপারটা বিশু খুড়ো নিজে গিয়ে বায়না করে আসেন।

ফটিক গিয়ে শুধোলে, কিসের পালা হবে এবার বিশু খুড়ো? নহুষ-উদ্ধার, না নল-দময়ন্তী—?

বিশু খুড়ো মিটিমিটি হাসেন আর বলেন, সে কথা আসরে বসেই জানতে পারবে সবাই। আগে থেকে ফাঁস করে দিচ্ছিনে আমি।

প্রতি বছর গাঁয়ের লোককে এমনি ভাবে অবাক করে দেবার ভার গ্রহণ করেন বিশু খুড়ো।

চাঁদোয়া খাটানো হল কালী বাড়ির উঠানে।

কালী মন্দিরের পেছন দিকে যে ভোগ-ঘর—তারই একটা পাশ পর্দা দিয়ে ঘিরে নিয়ে হল—সাজ-ঘর।

বড় বড় সব কাঠের বাক্স এসে পড়েছে। তারই ভেতর ঠাসা যাত্রাদলের যত ভালো ভালো পোষাক। দুটো গরুর গাড়ী ভর্ত্তি হয়ে এসেছে এই সব কাঠের বাক্স।

এবার যে ব্যাপারটা একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু হবে তা উদ্যোগ পর্ব্ব দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। কাঠের বাক্সগুলির আকার ও ওজন দেখে

সমবেত ছেলে-মেয়ে মহলে নানা রকম আজগুবি আলোচনা সুরু হয়ে গেছে।

কেউ বল্লে, দেবাসুরের যুদ্ধ হবে। অসুরদের নানা রকম পোষাক আছে এর ভেতর। দেখিস-নে কি রকম. কাণ্ডটা হবে আসরের মধ্যে।

চটপটি হাততালি দিয়ে কইলে, সক্কলের আগে এসে বসতে হবে। কোনো ব্যাপারটা যাতে না ফাঁক যায়—

ষষ্ঠী রসিকতা করে জবাব দিলে, চটপটি ত' একটা অঙ্ক দেখেই ঘুমে ঢুলে পড়বে। শেষ পর্যন্ত যাত্রা শোনা ওর কপালে কোনো দিন হয় না। তারপর চটপটির দিকে তাকিয়ে বল্লে, আসরে যখন ঘুমিয়েই পড়বি তখন আগে থেকে একটা বালিশ জোগাড় করে নিয়ে আসিস্।

হো-হো করে হেসে উঠল সবাই।

সত্যি চটপটি ভারী ঘুম-কাতুরে।

সন্ধ্যের পর ওকে জাগিয়ে রাখতে পারে একমাত্র ভূতের গল্প।

ইতিমধ্যে বাড়ি ফেরার পথে গণেশবাবু এসে জিজ্ঞেস করলেন, কৈ বিশু খুড়ো, নিমাই সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করেছ ত?

বিশু খুড়ো মুখ ভেংচে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তোমার যেমন পছন্দ··· নিমাই-সন্ন্যাস! ফোঁৎ-ফোঁৎ করে কাঁদবে কে শুনি? তার পরের দিন ত' মহাপ্রসাদের ঠ্যাং এর জন্যে কামড়া-কামড়ি সুরু করবে সবাই!

গণেশবাবু দেখলেন, বিশু খুড়োর হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই—একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিচ্ছে—তাই চোখ টিপে বল্লেন, আরে বিশু খুড়ো, তোমার আর বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে কবে শুনি? ছেলে-মেয়েরা রয়েছে চারধারে, তার মধ্যে তুমি কি যা-তা বক্‌ছ শুনি?

বিশু খুড়ো ভাবলে, একটু বেঁফাস কথা হয়ে গেছে। তাই আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে না গণেশবাবুকে।

অবশেষে সত্যি সন্ধ্যেবেলা যাত্রা শুরু হল। চারদিকে বাঁশের সঙ্গে গ্যাস্ লাইট বেঁধে দেয়া হয়েছে।

গত বছর 'শম্ভু-নিশম্ভু' পালাতে বহু ঝাড়-লণ্ঠন ভেঙ্গে যাওয়ায় এবার আর সে জাতীয় রকমারী ও বাহারী আলো সাজানো হয়নি।

বিকেল থেকে আসরে লোক জমতে সুরু হয়েছে।

যেখানে যাত্রাভিনয় হবে আসরের সেই অংশটুকু বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে। তার চারদিক দিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভীড় করে বসেছে। ঘেরাও করা অংশটির একধারে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সঙ্গতের দল মৌজ করে বসেছে। তাদের বাঁয়া-তবলা ঠোকা, বেহালার কান মোচড়ানো, ঢোলকে চাঁটি, পাখোয়াজে ময়দার লেচি লাগানো প্রভৃতি সমবেত দর্শকবৃন্দের বিস্ময় জাগিয়ে তুলছে। সাজঘরের ওখানে ভীড় ঠেকানো মুস্কিল হয়ে উঠেছে। গ্রামের কয়েকটি ষণ্ডা হিন্দু ও মুসলমান লাঠি হাতে সে জায়গাটা চারদিক থেকে আগলে রেখেছে।

কন্‌সার্ট বেজে উঠতেই যাত্রাদলের জুড়িরা কানে হাত দিয়ে গান সুরু করে দিল।

দর্শকবৃন্দের কানাকানি সুরু হয়ে গেল। কি পালা? চিকের আড়ালে মেয়েদেরও উৎকণ্ঠার অবধি নেই। ছেলের দল ত' প্রশ্ন করে কেবলি ধমক খাচ্ছে। এমন সময় একটা গর্বের ভাব নিয়ে অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে বিশু খুড়ো এসে ঘোষণা করলেন—পালার নাম "কংশ বধ"। অনেক নাচ গান আর যুদ্ধ আছে। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে দেখতে পাওয়া যাবে শুনে গ্রামের লোক আনন্দে জয়ধ্বনি
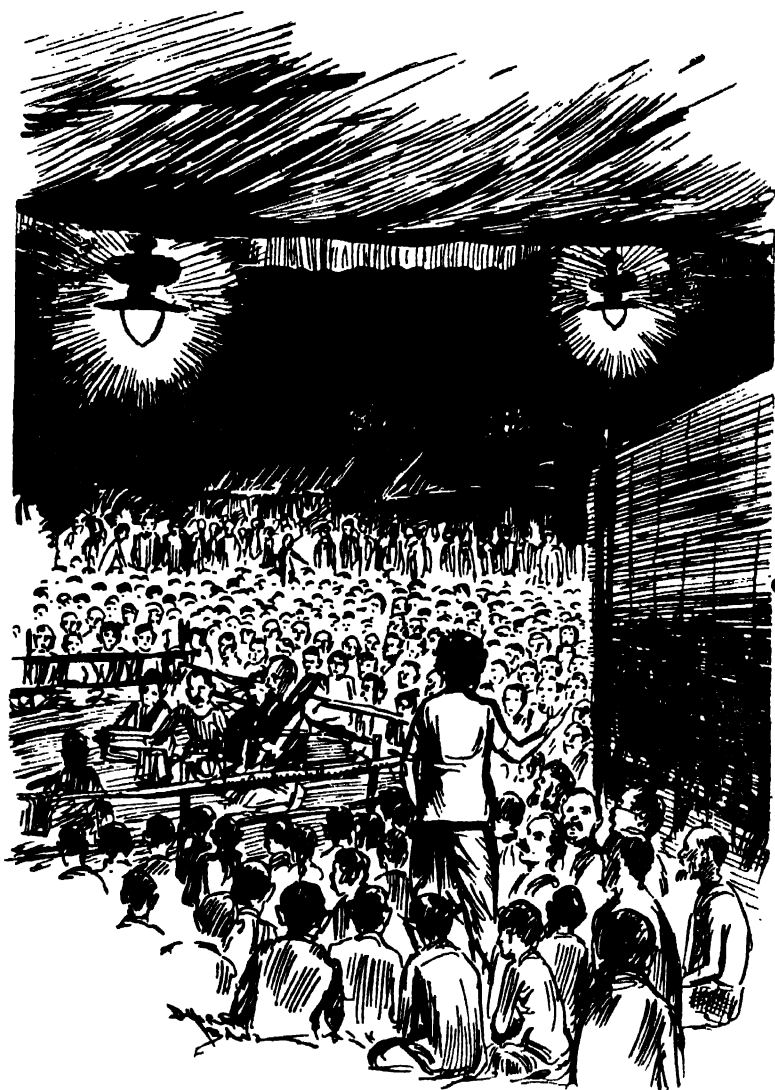
করে উঠলো। বিশু খুড়ো মনে মনে ভাবলে এই জয়ধ্বনি তারই প্রাপ্য।

দ্বিতীয় অঙ্কে পুতনা রাক্ষসী বধ হবার পর যাত্রা খুব জমে উঠল। দর্শকদল ঘন-ঘন করতালি দিয়ে অভিনেতাদের উৎসাহ দিতে লাগলো। বেহালা বাদক মাথা নেড়ে, টিকি দুলিয়ে ছড়ে টান দিলে।

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

যাত্রা শোনবার জন্যে নানা গ্রাম থেকে বহু লোকজন জমা হয়েছিল। কালী বাড়ি প্রাঙ্গনে তাদের স্থান হওয়া একেবারে অসম্ভব। তারই মধ্যে একটি দুষ্টু ছেলে টিকেতে আগুন ধরিয়ে বাইরে থেকে ছুঁড়ে একেবারে সামিয়ানার ওপর ফেলে দিয়েছে। আর যাবি কোথায়! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে পালা-পালা রব। গ্রামের ষণ্ডা-ষণ্ডা ছেলেরা এসে চারদিক থেকে সামিয়ানার দড়ি কেটে ফেলে কোন রকমে আগুন নিভিয়ে ফেল্লে। নইলে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যেত। কিন্তু যাত্রা ওই পর্য্যন্তই শেষ! যাত্রাদলের লোকেরা সেই রাত্রিতেই গরু গাড়ীতে মাল চাপিয়ে একেবারে পলায়ন!

বিশু খুড়ো মাথা চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে বল্লে, এমন সুন্দর "কংশ বধ" পালা ঠিক করলাম, তা কোন্ চ্যাংড়া ছোঁড়া একেবারে খাণ্ডব-দাহন করে ছাড়লে!

পরদিন রাত্রে কালীবাড়ি পূজো...তারপর ভোগের ব্যবস্থা... গ্রামস্থ লোকের নেমন্তন্ন। পল্লী অঞ্চলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের খাওয়া আলো জ্বালিয়ে হয়—, আর রাত্রিরের খাওয়া যে কখন হয় সেটা কেউ ঠিক করে বলতে পারে না।

ছেলেদের দল অনেক রাত্তির পর্যন্ত নাচানাচি করে বলি দেখলে তারপর ঘুমে যখন চোখ জড়িয়ে এলো সবাই যে যার বাড়ী চলে গেল। বিশু খুড়ো বল্লেন, সবাইকে ডেকে নিয়ে আস্‌বো। ওরা চাঁদা তুলেছিল তবেই না পূজো হল। ওদের বাদ দিয়ে আবার কিসের ভোগ ?

বিশু খুড়োর যে কথা সেই কাজ ! তার পাল্লায় পড়ে শেষ রাত্তিরে ছেলের দল চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে কালী বাড়ির উঠোনে এসে বসল। ফটিক তাকিয়ে দেখলে সত্যি, গ্রামস্থ লোক এসে জড় হয়েছে। সবাই উঁচু হয়ে বসেছে, সামনে কলাপাতা। শাক থেকে সুরু করে মহাপ্রসাদ এসে যখন হাজির হল তখন সবাই একটি করে বাটি বের করে দিলে পেছন থেকে। ওটা যাবে প্রত্যেকের বাড়িতে। বাসি মাংস খেতে নাকি ভারি ভালো লাগে। বড় হাতার এক হাতা করে মাংস বাটিতেও পড়ল। যারা সঙ্গে বাটি আনেনি তারা ঠকে গিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলো। তারপর পায়েস, দুর্গা-দই আর রসগোল্লা দিয়ে যখন প্রসাদ খাওয়া শেষ হল—পূব আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে—আর কালী বাড়ির বকুল গাছে—কাক ডেকে উঠল—কা-কা-কা।

আট

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, খুব ত' তোমরা কালীবাড়িতে মায়ের প্রসাদ খেলে, যাত্রা দেখলে, আর জয় ঢাক বাজিয়ে গাঁয়ের লোকের কানে তালা লাগিয়ে দিলে, কিন্তু কালবাড়ীর উঁচু ভিটি যে কেবলি ধ্বসে যাচ্ছে সেদিকে নজর আছে কারু ?

মাথা চুলকে চটপটি বল্লে, তা আমরা কি করবো বলুন ? আমরা ত খুব ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলেছিলাম ; তা না হলে কালীপূজো আদৌ হত না।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু মুচকি হেসে জবাব দিলেন, একটা কথা আছে জানতো '—কথা বলবে যে, পাত কাটবে সে।' তা কথা যখন তোমরা একবার বলেছ শেষ পর্য্যন্ত পাত তোমাদেরই কাটতেই হবে।

ফটিক শুধোলে, তার মানে আপনি বলতে চান যে, এ কাজটার ভারও আমাদের নিতে হবে ?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু কপালের ওপর চশমাটা তুলে বল্লেন, নিশ্চয় !

—কিন্তু এখন চাঁদা চাইতে গেলে লোকে লাঠি নিয়ে আসবে—মন্তব্য করলে যষ্ঠি।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, চাঁদাই যে চাইতে হবে তার কি মানে আছে ? মাটি নিজেরা কেটে নেবে ; শুধু জোগাড় করে নিতে হবে কয়েকটি কোদাল আর গোটা কয়েক ঝুড়ি। নিজেরা বয়ে বয়ে মাটি তুলবে। শরীরে শক্তি বাড়বে, ক্ষিদে হবে খুব, মাছ-দুধ খাবে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাল কাজও শেষ করা হবে।

ছেলেরা তবুও এ-ওর মুখের দিকে তাকায় ; হাজার হোক

মাথায় করে মাটি কাটার ব্যাপার! চট্ করে যেন রাজী হতে পারে না।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু সবাইকে উৎসাহ দিয়ে বল্লেন; আরে তোরা এত ভাবছিস কি? এতে ভাবনার আছেই বা কি? প্রথম ঝুড়ি মাটি আমিই মাথায় ক'রে বয়ে নিয়ে যাবো।

এর পর আর কোন মতেই আপত্তি করা চলে না। অনেকের বাড়ীতেই কোদাল আছে; তাই সেটা সংগ্রহ করতে বেশী বেগ পেতে হয় না।

প্রশ্ন ওঠে ঝুড়ি নিয়ে। চটপটি বলে, আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে গোটাকয়েক ঝুড়ি আছে সেগুলো আমি বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবো'খন। এই ভাবে একটা দুটো করে ঝুড়িও জুটে যায় মেলা।

সত্যিকারের আন্তরিক ইচ্ছা যদি থাকে, তবে উপায় একটা হয়ই।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর যে কথা সেই কাজ। প্রথম ঝুড়ি মাটি তিনি মাথায় করে নিয়ে কালীবাড়িতে ফেল্লেন। জয়ধ্বনি করে উঠল সবাই!

প্রবল উৎসাহে ছেলেরা কাজ সুরু করে দিলে।

কয়েক দিনের মধ্যেই অদ্ভুত কাজ দেখা গেল।

পয়সা দিয়ে মজুর খাটাল যা না হত—ছেলেদের কর্মকুশলতায় তার দ্বিগুণ কাজ হল এক সপ্তাহের ভেতরে। প্রথমে বুড়োরা বাঁকা চোখে নানা রকম মন্তব্য করেছিল।

—হ্যাঁ, কামার মানুসের কুমোরের কাজ!

—যত তারা ছিল বুনে, সব হল কীর্ত্তুনে!

—লেখাপড়া চুলোয় গেল, এখন মাটি কেটে মর!

দু একটী ছেলে অভিভাবকদের কাছে প্রহারও যে না খেল সে কথা কোনোমতেই জোর করে বলা চলে না।

তবু কাজ এগিয়ে যায় অতি সুন্দর ভাবে।

একদিন কিন্তু ওই মাটি কাটা নিয়েই গোলমাল বেঁধে গেল। যে জায়গাটা থেকে মাটি কাটা হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে গাঁয়ের দশ সরিকের জমি। হঠাৎ এক সরিকের কি কুবুদ্ধি হল—সে এগিয়ে এসে বল্লে, আমি আমার জমি থেকে কিছুতেই মাটি কাটতে দেব না।

ছেলেরা অত শত বোঝে না,—তারা খবর পাঠালো মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে। তিনি সংবাদ পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন। বল্লেন, তোমার ত বাপু এক পয়সার অংশ এখানে, সে এক পয়সা আমরা স্পর্শও করবো না। তবু লোকটি নাছোড়বান্দা! আসল কথা হচ্ছে এই যে, তার ছেলেও এই মাটি কাটার দলে ছিল। কিন্তু সেটা সে আদপেই বরদাস্ত করতে পারছে না। নানাভাবে ঝগড়া বাঁধাতে চেষ্টা করতে লাগল।

হঠাৎ তার ছেলে একদিন গোপনে এসে খবর দিল যে, তার দিদির বিয়ে ঠিক হয়েছে এক বুড়োর সঙ্গে। বুড়ো ভিন গাঁয়ের তেজারতি কারবারী এক মহাজন; লোককে টাকা ধার দিয়ে আর সুদ নিয়ে প্রচুর অর্থ জমিয়েছে। এই বিয়ের জন্য মেয়ের বাপকে অনেক টাকা দেবে। ভাইয়ের নাম টোনা। সে-ই সব খবর মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে দিয়ে বল্লে, দিদি রাত দিন কাঁদছে, আপনি ওকে বাঁচান।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, এইবার মাটি না কাটতে দেবার শোধ নিতে হবে; দাঁড়াও না, আমি কি করি দেখ! ছেলেদের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়বাবু গোপনে কি পরামর্শ করলেন কাক পক্ষীতেও জানতে পারল না।

বেশী রাত্তিরে বিয়ের লগ্ন। পাছে লোক জানাজানি হয়ে যায় সেই জন্যে অরক্ষণীয়া মেয়ের বিয়ে ভাদ্র মাসেই গোপনে ঠিক করা হয়েছে। মাত্র দু'জন লোক নিয়ে বর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রাত বারটার পর এসে কনের বাড়ীতে হাজির হল—সারা গাঁয়ের লোক তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে; কিন্তু গাঁয়ের কয়েকটি ছেলে কচুবনে লুকিয়ে মশার কামড় খাচ্ছে আর সব কিছুর দিকে নজর রাখছে।

সবে বর সভাস্থ হয়েছে, এমন সময় মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে সামনে রেখে গাঁয়ের ছেলের দল একেবারে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল। ব্যাপার দেখে বর ভয় পেয়ে গেল। বল্লে, আমি বিয়ে করতে চাইনে—আমার টাকা ফেরৎ দিয়ে দাও, আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। ছেলের দল বল্লে, সেটি হবে না। আমরা কচুবনে বসে সারা রাত মশার কামড় খেয়েছি, আর পাহারা দিয়েছি। ওই টাকা দিয়ে বরযাত্রদের ভোজ হবে। বরযাত্র ত' এখন আমরা—বর আমাদের সঙ্গেই আছে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু এগিয়ে এসে বল্লেন, ছেলেরা মিছে কথা বলেনি। মধুসূদন আমার পরিচিত ছেলে, ভালো চাকরী করে, বিয়ের বয়সও হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের গ্রামে বেড়াতে এসেছে। ওর সঙ্গেই আমরা টোনার দিদির বিয়ে দেবো, মেয়েটি সুখে থাকবে।

টোনার বাবা আমতা-আমতা করে কি আপত্তি করতে যাচ্ছিল; কিন্তু ছেলেরা বল্লে, আমরা আজ কোনো আপত্তি শুনতে চাইনে। মধুসূদনদাই বর, আর মৃত্যুঞ্জয়বাবু হচ্ছেন বর কর্ত্তা।

একদিকে বিয়ে চল্লো, আর একদিকে লুচি বেগুন ভাজা আর আলুর দম তৈরী হতে থাকলো। বরযাত্রদের খাওয়াতে হবে ত! মেয়ের মা এয়োদের নিয়ে এগিয়ে এলেন সব কাজে।

ছেলেরা বুড়ো মহাজনকে বল্লে, আপনার কিন্তু ছুটি নেই। বিয়ে হয়ে গেলে বর-কনেকে আশীর্বাদ করতে হবে, তারপর আমাদের সঙ্গে বসে গরম গরম লুচি খেতে হবে। চটপটি গেছে রসগোল্লার সন্ধানে। সে না জোগাড় করে ফিরবে না, সেটা আমরা জানি। আপনাকে মিষ্টি মুখ করে যেতেই হবে।

এর পর কালীবাড়ীর ভিটে বাঁধানোর কাজ শুধু যে নির্বিঘ্নে সমাধা হল তাই নয়, ছেলেরা জোগাড় যন্ত্র করে একটা ফুলের বাগানও তৈরী করে দিলে, তারপর বেড়া বেঁধে দিলে নিজেদের হাতে।

একদিন মৃত্যুঞ্জয়বাবু হেসে বল্লেন, এইবার তোদের ডাক পড়েছে রে—

ফটিক শুধোলে, কোথায় ?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু চশমাটা কপালের ওপর তুলে মাথা নাড়তে নাড়তে বল্লেন, এটা কি মাস আগে বল—?

ছেলেরা বল্লে, ভাদ্র মাস—

মৃত্যুঞ্জয় বল্লেন, তবে ?

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, জবাব, খুঁজে পায়না। মৃত্যুঞ্জয়-বাবু উত্তর করলেন, ওরে হাঁদারামের দল,—ভাদ্রমাসে তাল পাকে এটাও জানিস নে তোরা ? আমার গাছ ভর্ত্তি পাকা তাল। তোদের জ্যাঠাইমা তালের বড়া আর ক্ষীর তৈরী করে বসে আছে।

তখন ছেলের দলের হুল্লোড়ে কান পাতে কার সাধ্য।

গাঁয়ে বসন্ত লেগে গেছে।

এই সময় সকলের মনে পড়ে বুড়ী মোক্ষদা মাসীর কথা। এই মোক্ষদা মাসীর যে কত বয়স তা কেউ হিসেব করে বল্‌তে পারে না। মোক্ষদা মাসী বসন্তের অষুধ জানে। সাদা ছোট ছোট এক রকম বড়ি। সারা বছর ধরে অনুপান সংগ্রহ করে বুড়ি ওষুধ তৈরী করে। বুড়ির তিন কুলে কেউ নেই, গ্রামের এক প্রান্তে ছনের ঘরে থাকে।

গাঁয়ে বসন্ত লাগলে ধুমধাম করে মা শীতলার পূজো দেয়। সারা গাঁ প্রসাদ পায়।

অসুখ-বিসুখ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদা মাসীর স্মরণাপন্ন হল সবাই। মোক্ষদা মাসী অভয় দিয়ে বল্লে, কোন ভয় নেই ষোড়শো-পচারে মায়ের পূজো দিলে সব দোষ খণ্ডন হয়ে যাবে।

গ্রামের সবাই এসে পূজোর কাজে লেগে গেল। দশজনের সাহায্যে পূজোও নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল।

শরতের একটা ছোঁয়া লেগেছে যেন আকাশে বাতাসে। অতি ভোরে মনে হয় যেন কার বাঁশী বাজতে থাকে।

সকালের সোনা-গলা-রোদ দেখে মনে হয় শরৎ রাণী চিঠি পাঠিয়েছেন, এই আমি এলুম বলে! নদীর ধারে ধারে কাশ ফুল হাওয়ায় দুলছে— যেন সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে···শরৎ এলো, যে যেখানে আছো, ফিরে এসো গাঁয়ে। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি— আমার স্নেহাঞ্চলের আশ্রয়ে। কৃষাণের দল হুকো টানে আর বলে—

"আইলো আশ্বিন—
গা করে শিন্ শিন্।"

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, পূজোর সময় বাইরে থেকে গাঁয়েযত লোক এসে পৌঁছবেন, তাঁরা যদি এসে দেখেন আমাদের গ্রামের সবগুলি পুকুর আর খাল কচুরী পানায় ভর্তি হয়ে আছে, তবে তোমাদের ওপর কি খুব ভালো ধারণা তাঁদের হবে ?

মাথা নেড়ে ছেলের দল জবাব দেয়—মোটেই না। এবার প্রশ্ন আসে, তাহলে আমাদের কি করা উচিত ?

ফটিক মুচকি হেসে জবাব দিলে, কচুরী পানার নির্বাসন।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুসী হয়ে বল্লেন, ঠিক ধরেছ।

রতন শুধোলে, জল সাঁতরে সব কচুরী পানা তুলে নিয়ে আসতে হবে নাকি ?

—তুমি এক বোক্চন্দ্র ! কৌতুকের সঙ্গে জবাব দেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। গোটা কয়েক নৌকা জোগাড় করে নিতে হবে। তার ওপর কিছু কিছু করে লোক উঠবে। এক এক দল এক একটা অঞ্চল সাফ করবার ভার নেবে। গোটা গ্রামটা পরিষ্কার করতে চার পাঁচ দিনের বেশী লাগবার কথা নয়।

নতুন কাজের সন্ধান পেয়ে ছেলের দল আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। নৌকা সংগ্রহ করা বিশেষ শক্ত কথা নয়। কেননা প্রত্যেকের বাড়িতেই তু' তিনখানি করে নৌকা আছে এবং বর্ষাকালে হাট বাজার থেকে সুরু করে কিছুই নৌকো ছাড়া পারাপার করবার যো নেই।

ছেলেদের উৎসাহের সত্যি প্রশংসা করতে হয়। গায়ে কেরোসিন তেল মেখে তারা কাজে লেগে গেল, কেননা কচুরী পানার দামের মধ্যে প্রচুর মশা !

নয়

চটপটির বাবা এখন গ্রামের মধ্যে সব চাইতে ব্যস্ত-বাগীশ লোক। শুধু চটপটিরাই নয়, গ্রামের মধ্যে যে ক'ঘর কুমোর আছে তারা সবাই। এ গ্রামের চল্‌তি নিয়ম এই যে, প্রতি বাড়িতেই তুর্গোৎসব হয়।

কাজেই প্রতিমাও তৈরী হয় সব বাড়িতে।

প্রথমে হয় কাঠামো তৈরী, তারপর খড়ের মূর্তি তৈরী—ওরা বলে জরা বাঁধা ; তারপর এক মেটে, তু' মেটে, তিন মেটে। কোন্ বাড়ির সিংহ কি ভঙ্গিতে কেশর ফুলিয়ে অসুরকে আক্রমণ করবে আর কোন্ বাড়ির অসুর কি ধরণের বীরত্ব দেখাবে—সেই নিয়ে ছেলে মহলে আর আলোচনা-গবেষণার অবধি থাকে না।

ছোট খাটো খণ্ড যুদ্ধ পর্য্যন্ত হয়ে যায় এই নিয়ে। মা তুর্গা অসুরের কাঁধে ত্রিশূলের খোঁচা দেবেন—না, সোজাসুজি ত্রিশূলটা বুকে বসিয়ে দেবেন, তাই জানবার জন্যে ছোটরা প্রশ্ন করে কুমোরদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে!

ওদিকে মালাকারের দল নানা রকম শোলা আর রাংতার গয়না তৈরী করার কাজে উঠে পড়ে লাগে।

পাশের গাঁয়ে তৈরী হয় নানা রঙের শাড়ী আর নানা জমিনের ধুতি। পূজোর চাহিদা মেটাতে তারা হিম্‌সিম্ খেয়ে যায়। তাঁতের ঠক্-ঠকা-ঠক্ শব্দ চলেছে সে অঞ্চলে।

এই গ্রামে পাঁঠা বলি দেবার ভারী ঘটা। পূজোর এক মাস আগে থেকে প্রত্যেক বাড়ির ছেলেরা নিজেদের রক্ষণা-বেক্ষনে পাঁঠা-

গুলিকে ঘাস খাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোন্‌টা কার পাঁঠা সেটাও চিহ্নিত হয়ে থাকে। কালা-ধলায় মেশানো পাঁঠাটা বরুণের, কুচ্‌কুচে কালোটা হরিশের, সাদা পাঁঠা গণেশের। এই পাঁঠাগুলির নামকরণ পর্য্যন্ত হয়ে যায়। ব্যাঁ-ব্যাঁ, শিংয়ের গুতো, লম্বকর্ণ, মুক্তো দাঁতি··· এমনি কত নাম! এই নামকরণের ব্যাপারে বড়রাও ছোটদের সাহায্য করে থাকে। এই সব পাঁঠার কোনোটিকে যদি শেয়ালে কামড়ে ধরে কিম্বা ঠ্যাং খোঁড়া করে দেয়, তবে আর সেটা পূজোয় লাগবে না। পাঁঠার ক্ষুদে মালিকের সেজন্য ভারী আনন্দ, কেননা সে বলির হাত থেকে বেঁচে গেল! আবার যেদিন যে পাঁঠা বলি হয়, সেদিন তার মালিক বলি দেখে না, মাংসও ছোঁয় না···সারাদিন মন-মরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এই নিয়ম চলে আসছে চিরকাল।

গ্রামের খালটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানে রোজই ভীড় জমতে থাকে। ষ্টীমার ঘাট থেকে যারা আসে—এইখানেই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে।

—আজ দক্ষিণ বাড়ির দু'জন এসেছে—

—আজ সেনদের বাড়ির বাবুরা এলো।—

—আজ নয়া বাড়ির ঠাকুরুণরা এলেন।

যাদের বাড়ির লোকজন আসে তারা আনন্দে ডগমগ হয়ে লাফাতে থাকে। যাদের আসে না তারা ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফেরে। পরদিন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে খাল ধারে গিয়ে হাজির হয়। এমনি করে সারাটা গ্রাম ভর্ত্তি হয়ে ওঠে।

কলেজের ছেলেরা গাঁয়ে এসে জুটতেই সুরু হয়, থিয়েটারের মহলা। ওরা বাইরের জগৎকে দেখেছে, তাই স্থানীয় যাত্রায় তাদের মন ওঠে না। নিজেরা সামাজিক নাটক অভিনয় করে; কখনো বা করে ঐতিহাসিক নাটক।

গ্রামের মাইনর ইস্কুলের মৌলভী কাশেম আলি থিয়েটারের সিন্ আর সিংহাসন ইত্যাদি ভারি চমৎকার তৈরী করতে পারেন। এদিকে তাঁর হাত সুন্দর খেলে। কলেজের ছেলেরা বাড়ি এলে তাই মৌলভী সাহেবের ডাক আগে পড়ে।

—এবার সাজাহান নাটক ধরলাম মৌলভী সাহেব—

—তাহলে ত' একটা ময়ুর-সিংহাসন ভালো করে তৈরী করতে হয়।—সে আপনারা ভাববেন না। কেরোসিন কাঠের বাক্স আর পিচ্ বোর্ড দিয়ে সুন্দর হবে। মাঝে মাঝে লাল নীল কাগজ লাগিয়ে ভেতরে ছোট ছোট মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলে দেখাবে ভারী চমৎকার!

এ ব্যাপারে মৌলভী সায়েবের মুন্সীয়ানা আছে বলতে হবে।

পূজোর তিন দিন ঢাকের বাদ্যে কান পাতে কার সাধ্যি।

এ অঞ্চলে প্রতিমা বিসর্জন উৎসবের নাম আরঙ্গ। সার সার নৌকো মিছিল করে বের হয় নদীর দিকে। বড় বড় নৌকো; তার ওপর প্রতিমাকে তোলা হয়। নানাভাবে সাজানো হয় নৌকোগুলি। বাদ্যভাণ্ডে খাল আর নদীর দুধার গম গম করতে থাকে। নদীর ধারে বসে মেলা। আনন্দের আর সীমা থাকে না। এর পর বিজয়ার কোলাকুলি গ্রামের এক উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। বহুদিন আগে থেকে গাঁয়ের গিন্নিরা নারকোল নাড়ু, অবাক সন্দেশ, চিড়ে-জিড়ে, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি কত রকম মিষ্টি যে তৈরী করে রাখে তা গুণে শেষ

করা যায় না। আবাল-বৃদ্ধবনিতার প্রণাম আর আশীর্বাদ গ্রহণের সেই দৃশ্য না দেখ্‌লে সত্যিই বুঝতে পারা যায় না! ছেলের দল সঙ্গে থলি নিয়ে বেরোয়। যে সব সন্দেশ আর নাড়ু খেয়ে উঠতে পারে না, তা জমা হয় ঐ থলির ভেতর। তারপর অন্য সময় ওই খাবার দিয়ে আসর জমে ভালো!

সেবার ফটিক আর রতনের দল দু থলি খাবার সংগ্রহ করে সন্ধ্যে বেলা আর একটা মজার আসর বসালে নিজেদের মধ্যে।

সেন বাড়ীর সর্বেশ্বর সেন প্রতি বছর পূজোর ছুটিতে গ্রামের কুমার-কুমারী ভোজন করান; এই প্রথাটা বহুকাল থেকে চলে আসছে। শুধু তাই নয়—খাওয়ার পর সবাইকে আট আনা করে ভোজন দক্ষিণা দেয়া হয়। কাজেই এই দিনটির দিকে গ্রামের ছেলে মেয়েদের একটা লোভাতুর দৃষ্টি থাকবে সেটা খুবই স্বাভাবিক।

এবার কুমার-কুমারী ভোজনে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল সব চাইতে বেশী। গ্রামে সেন মশায়ের কৃপন বলে একটা বদনাম আছে। কিন্তু কুমার-কুমারীদের খাওয়ানোর ব্যাপারে অতি বড় শত্রুতেও তার ত্রুটি ধরতে পারবে না। এমন সুন্দর আর এমন নিখুঁত আয়োজন! ছেলে-মেয়েরা মিষ্টি খেতে ভালবাসে, তাই তিনি মেঠাইয়ের আয়োজন করেছেন সব চাইতে বেশী। যে যত খেতে পারে।

কোজাগরী পূর্ণিমায় গ্রামের দৃশ্য ভোলবার নয়। জ্যোৎস্নার জোয়ার লেগেছে সারা গ্রামখানিতে।

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন রূপোলী গুঁড়ো ঝরে পড়ছে—গাছের ওপর, খালের ধারে ধারে, চল্‌তি মানুষের মাথায় মাথায় আর শাপলা ফুলের আশে পাশে।

যেন এক স্বপ্নরাজ্যে এসে পৌঁছেচি।

মা-লক্ষ্মীর আসন পাতা আছে, জ্যোৎস্নায় পা ধুয়ে তিনি কখন এসে গ্রামে পৌঁছুবেন কেউ জানে না।

গাঁয়ের বৌ-ঝিরা নিপুণ হাতে যে আলপনা দিয়েছে মাটি-লেপা মেঝেতে—তা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবার। সারাটা উঠোন নিকোনো, একগাছা কুটো পর্য্যন্ত পড়ে নেই।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমাতে নেমন্তন্নের প্রয়োজন হয় না।

গোটা গাঁয়ের লোক অফুরন্ত পুলকে বেরিয়ে পড়েছে। যে বাড়িতে যাচ্ছে, মাটিতে বসে পড়ছে আর হাত পেতে প্রসাদ পাচ্ছে। দু'রকম প্রসাদেরই ব্যবস্থা আছে। নারকেল জল থেকে সুরু করে যত রকম ফল আর মিষ্টি, আর রয়েছে পাকা প্রসাদ—খিচুড়ী, বেগুন, ভাজা, ছোলার ডাল, লাবড়া, পায়েস ইত্যাদি। এসো, বোসো, খাও—এমনি ব্যবস্থা।

ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেয়া হচ্ছে। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে, ধূপের গন্ধ, ফুলের সুবাস, ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ···সব মিলে, মনকে সত্যি সুরভিত করে তোলে।

ফটিক, রতন, ঘণ্টে, চটপটি, মাকুন্দো, ষষ্ঠী, টোনা, ছায়েদ সবাই নৌকো করে বেরিয়েছে। গাঁয়ের এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি প্রসাদ পেতে হবে। ছোট বৈঠে প্রত্যেকের হাতে, একজন শুধু হাল ধরেছে কণ্ঠে তাদের গান—

"আলো ঝলোমল পূর্ণিমারি জ্যোছনা রাতে—"

লক্ষ্মী-ঠাকুরুণ আসতে 'পাছে ভয় পান, সেই জন্যে এই কোজাগরী

পূর্ণিমায় ঢাকের বাদ্যি কিম্বা কোনো জোরালো বাজনা বাজানো একেবারে বারণ।

—অ-বৌ-মা, ধীরে ধীরে পা ফেলো—

—ছেলে মেয়েরা, আজ রাত্তিরে উঠোনে দুপদাপ করতে নেই।

—সারারাত ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস টেপীর মা—

—দরজা খুলে আজকে শুতে হয়। মা-লক্ষ্মী ফিরে না যান—এমনি সব বিধি-নিষেধের কথা বলেন গাঁয়ের বর্ষিয়সী মহিলারা।

অনেক গেরস্ত বাড়ির লোকেরা সত্যি সারা রাত জেগে থাকে আর বৌরা ঘিয়ের প্রদীপ উস্কে দেয়।

শেষ রাত্তিরের দিকে একটা মিঠে বাঁশীর সুর যেন আকাশ থেকে ভেসে আসে। সে সুর কেউ শুনতে পায়, কেউ পায় না।

যারা জেগে থাকে, ফিস্ ফিস্ করে বলে, লক্ষ্মী ঠাকরুণ লক্ষ্মী পেঁচার পিঠে চড়ে পূজো নিতে পৃথিবীতে নেমে আসছেন।

মাঠে মাঠে ধানের শীষে তখন যেন কিসের দোলা লাগে!

এবার পূজোর পরে-পরেই এলো মুসলমানদের পরব মহরম। মহরম ঠিক উৎসব নয়,—হাসান হোসেনের শোক-গাঁথা। কিন্তু এখন পূর্ববঙ্গে সেটা প্রায় উৎসবের পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তাজিয়া তৈরী আর লাঠি খেলার কসরৎ অনেক দিন থেকেই চলেছে গাঁয়ের মুসলমান পাড়ায়।

এজন্যে হিন্দু পাড়ায়ও আগ্রহের কিছুমাত্র অভাব নেই। পাড়ার মাতব্বরেরা শুধোয়, ও বসির মিঞা, তোমাদের মহরমের মিছিল কবে বেরুবে?

বসির মিঞা জবাব দেয়, আর দেরী নেই কর্তা, এসে গিয়েছে দিন। এইবার আপনাদের প্রাণভরে লাঠি খেলা দেখাবো। গত সন গতর ভালো ছিল না বলে কিছু করতে পারিনি।

—বেশ—! বেশ! বাড়ির ছেলে-পেলেরা, বৌ-ঝিরা আগ্রহ করে আছে, কবে তোমাদের লাঠি খেলা দেখবে।

—সেত' ঠিক কথাই কর্তা। আপনাদের হিন্দু পাড়া থেকে ইনাম মিলবে, বকশিস মিলবে, নতুন ধুতি পাবো—খেলা দেখিয়ে ত' ওখানেই সুখ।

তারপর সত্যিই কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল,—বেরুল রঙ-বেরঙের তাজিয়া···

মুসলমান চাষিদের দল মাথায় গামছা বেঁধে নিলে।—

সুরু হল লাঠি খেলার কসরৎ দেখানো···আজ এপাড়া, কাল ও পাড়া।

—ও মিঞা-ভাইরা, আমাদের বাড়ি এসো;—গাছের লাউ দেব, ক্ষেতের ধান দেবো···আর দেব নয়া গামছা।

—বেশ চলো, মা-ঠাকরুণকে বলে এক জোড়া নয়া ধুতি দিতে হবে কিন্তু।

খেলা জমে ওঠে এক একদিন এক এক প্রাঙ্গণে।

দর্শকবৃন্দ কিন্তু বেশীর ভাগই হিন্দু, কিন্তু তাতে আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। আপনার গাঁয়ে আপনার উৎসব—মন মত না হলে ত' নিজেদেরই বদনাম!

এরই মধ্যে আবার এসে পড়ে দ্বীপান্বিতা। কিন্তু গাঁয়ের

লোকদের মনে একবারও একথা ওঠে না যে, ওটা মুসলমানের আর এটা হিন্দুর উৎসব। গাঁয়ের পালা-পর্বণ। আসবে—দেখবে—খাটা-খাটুনি করতে হবে বৈকি ?

ও করিম ভাই, হাটে যাচ্ছ বুঝি ?

—হ্যাঁ কর্তা, হাটটা বেলাবেলি সেরেই আসি। বাড়িতে আবার কুটুম এসেছে।

—কুটুম এসেছে? হাটের ফিরতি পথে মাছ নিয়ে যেও। পুকুরে আজ জাল ফেলেছিলাম কি-না ?

—তাহলে ত' কর্তা ভালই হয়।

—শোন করিম ভাই, সাম্‌নে কালী পূজো। হাট থেকে আমার জন্যে একটা পাঁঠা কিনে এনো।

—কেন আন্‌বো না কর্তা? আমাকে ত' যেতেই হচ্ছে। টাকাটা চট্‌পট্‌ ফেলে দাও।

—এই নাও ভাই টাকা, যাওয়ার পথে মাছ নিয়ে যেও।

—সে-কি আর ভুলি কর্তা, তোমাদের খেয়েই ত' মানুষ।

এমনি আন্তরিকতা গাঁয়ের পরস্পরের মধ্যে। একজনের প্রয়োজনে আর একজন এসে সাহায্য করে। একজনের বিপদে আর একজন পাশে দাঁড়ায়।

এসে পড়ে দীপান্বিতা।

প্রতিটী বাড়ির সামনে কলা গাছ দিয়ে তোরণ তৈরী করা হয়েছে। তারি মধ্যে কাঠি বসিয়ে সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে! পুকুরের জলে পড়েছে তার ছায়া। মনে হচ্ছে, লক্ষ প্রদীপ জলে সাঁতার কাটছে।

এর মধ্যে আর এক কাণ্ড !

ছুপুর রাত্তিরে ছেলেদের চীৎকারে গোটা গাঁয়ের লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চটপটি নাকি ষষ্ঠীর সঙ্গে বাজি রেখে এই অমাবস্যার রাত্তিরে শ্মশানে গেছে একা। বহুক্ষণ কেটে গেছে, তার আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

ছেলের দল মশাল জ্বালিয়ে রওনা হল তার সন্ধানে। সঙ্গে গেল বসির মিঞা।

যা ভয় করা গিয়েছিল তাই।

একটা লতার সঙ্গে পা জড়িয়ে চটপটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে শ্মশানের খালের ধারে। চোখে মুখে অনেকক্ষণ ধরে জলের ঝাপ্‌টা দিতে তবে তার জ্ঞান ফিরে আসে।

চেতনা পেয়েই সে চীৎকার করে উঠল, ওরে কে আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। ছেলের দল হো-হো করে হেসে উঠে বল্লে, তোর পা জড়িয়ে ধরেছে এই বুনো লতা।

ষষ্ঠী মুখ কাচু-মাচু করে বল্লে, আমার খুব শিক্ষা হয়েছে !

—চল, কালী পূজোর পর গরম গরম মহাপ্রসাদ রান্না হয়েছে, তাই খেয়ে মনে বল কর্‌বি চল—।

ছেলেরা বল্লে, কিন্তু তার আগে গুড় জল খাইয়ে দিস ওকে। এই সাহস নিয়ে অমাবস্যার রাত্তিরে তুই শ্মশানে আসিস একা ?

এই ঘটনার ছুদিন পরের কথা।

ভাই ফোঁটার দিন ফটিকের ছুই বোন—উষা আর সন্ধ্যা ভায়েদের ফোঁটা দিচ্ছে; এমন সময় বাইরে থেকে ছায়েদ হাঁক দিলে, ফটিক

ভাই, বাড়ি আছিস ?—শীগ্‌গির আয়—সাপ নাচাতে এসেছে আমাদের পাড়ায়—

ঊষা-সন্ধ্যা বল্লে, সাপ ঝাঁপিতে বন্ধ আছে, পালিয়ে যাবে না তুমি দাওয়ায় উঠে এসো ছায়েদ ভাই,— ভাই-ফোঁটা নিয়ে যাও—

ছায়েদ অবাক হয়ে শুধোলে, আমায় তোমরা ফোঁটা দেবে বোন?

ঊষা বল্লে, কেন দেবো না? তুমি দাদার বন্ধু, তুমিও দাদা। এগিয়ে এসো—এই আসনে বোসো…হ্যাঁ, এই প্রদীপের পাশে। চন্দন আর কাজল দিয়ে ফোঁটা দেয় দুই বোন। তারপর এগিয়ে দেয় খাবারের থালা। ছায়েদের দুচোখ অতি আনন্দে জলে ভরে ওঠে।

ছায়েদ বল্লে, সত্যি ভাই ফটিক, আমাদের এই গাঁয়ে সবাইকার মধ্যে যেমন মিল্‌মিশ্‌ তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। এই যে দুটি বোন আজ আমায় ভাইফোঁটা দিলে, একথা জীবনে আমি কখনো ভুলতে পারবো? আমাদের এই গাঁ সতিাই সোনার গাঁ। সোনার মানুষ থাকে এইখানে। তারাই আমাদের আপনার জন।

ফটিক বল্লে, আমার মনের কথা তুই বলেছিস ছায়েদ ভাই। এই গাঁ ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আমি সুখ পাবো না।

দশ

লোকে কথায় বলে, মরা কার্ত্তিক।

এই সময়টায় গাঁয়ে 'মালোয়ারি' জ্বরের প্রকোপ সুরু হয়ে যায়।

জ্বর যখন আসে, লোকে কাঁথার ওপর কাঁথা চাপিয়ে দেয়—মনে হয় হুঁ-হুঁ শব্দে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উঠে যাচ্ছি।

অনেক সময় তোষক অবধি তুলে তিন-চার জন মিলে চেপে ধরে রোগীকে!

শীতকে কিছুতেই বাগে আনা যায় না!

সারাটা দেহ থর্-থর্ করে কাঁপতে থাকে। চোখ লাল হয়ে ওঠে। কি সব আবোল-তাবোল কথা মনে জাগে⋯

ছায়া ছবির মতো ভেসে বেড়ায় অসংলগ্ন ঘটনায় টুক্‌রোগুলি! চোখ মেলে তাকালেই দেয়ালের টিক্‌টিকিটা খুব বড় হয়ে দেখা দেয়। কখনো এগিয়ে আসে⋯কখনো খুব পেছিয়ে যায়!

কবে মাছ ধরবার সময় পায়ে কাঁটা ফুটেছিল⋯⋯

মনে হয় সেই মাছের মুড়োটা রাক্ষসের মুখের মতো বড় হয়ে হাঁ করে তাকে গিলে খেতে আস্‌ছে।

এম্‌নি ধাঁই-পাঁই মালোয়ারী জ্বর হয়েছে চট্‌পটির। চট্‌পটির কেবলি মনে হচ্ছে যে, খাল-বিল-নদী-নালায় যত জল আছে সব এক চুমুকে সাবাড় করে দিতে পারে।

হঠাৎ চট্‌পটি চীৎকার করে উঠ্‌ল, আমি কাঁচা তেঁতুল দিয়ে পান্তা-ভাত খাবো।

ওর বাবা বল্লে, খাবি বৈকি! ওই ত' মালেয়ারীর অযুধ। জ্বরটা একটু নরম হোক⋯হু'দিন যাক্⋯খাস্ এখন।

রতন এসেছিল তার মায়ের জন্যে একটা কুঁজো কিন্‌তে। এসে দেখে, চট্‌পটির দরুণ জ্বর। কপালে হাত দিয়ে দেখে গা পুড়ে যাচ্ছে।

সে চট্‌পটির বাপকে বল্লে, এ তোমরা কি করেছ কুমোর খুড়ো? দারুণ জ্বর উঠেছে যে ওর। ১০৬° এর কম নয়। এক্ষুনি যে মাথায় রক্ত উঠে যাবে—

তামাক টান্‌তে টান্‌তে চট্‌পটির বাবা জবাব দিলে, না দাদাবাবু, ও কিছু নয়। মালোয়ারী জ্বর অমনিই ধাঁই-পাঁই করে ওঠে⋯আবার

সুড়-সুড় করে নেমে যায়। তখন চান করে পান্তা খেলে আর কিছু থাকে না।

রতন ভয় পেয়ে বল্লে, না-না। তোমরা ঠিক বুঝ্‌তে পারছ না। চট্‌পটির মাথায় এখন জল ঢাল্‌তে হবে। তারপর ন্যাকড়া ভিজিয়ে মাথায় জলপট্টি দিতে হবে।

কুমোর খুড়ো তামাক টান্‌তে টান্‌তে রসিকতা করে জবাব দিলে, সে দাদাবাবু তোমাদের পোষাকী জ্বরের জন্যে। আর আমাদের জ্বর হচ্ছে বারোমাসী, পোষ মানা জ্বর। যেমন ঝট্ করে আসে আবার তেমনি হুট্ বল্‌তে চলে যায়। ওর জন্যে তুমি কিছু ব্যস্ত হয়ো না; তোমার কি রকম কুঁজো দরকার সেই কথা আমায় খুলে বল, আমি ভালো দেখে একটা বেছে দিচ্ছি—

এই সময় চট্‌পটি চীৎকার করে উঠ্‌ল, নহুষের প্রেতাত্মা ছুটে আস্‌ছে আমায় এক্ষুনি ধরবে···

চট্‌পটির বাবা হেসে বল্লে, দেখেছ ছেলের কাণ্ড! সেই যে গত বছর কালী বাড়িতে যাত্রা দেখেছে নহুষের প্রেতাত্মা! জ্বরের ঘোরে তারই স্বপ্ন দেখ্‌ছে। ও তুমি কিছু ভেবো না দাদাবাবু। ওই পিঁড়েটে নিয়ে দাওয়ায় ভালো হয়ে বোসো—

রতন কিন্তু কুমোর খুড়োর কথায় অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, না বাপু। তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝ্‌তে পারছ না। দেখ্‌ছ না চট্‌পটি কেমন পাগলের মতো চোখ বড়-বড় করে তাকাচ্ছে আর হাঁ করে খালি জল খেতে চাইছে! আমার জ্বরটা মোটেই ভালো ঠেক্‌ছে না। দাঁড়াও, আমি মৃত্যুঞ্জয় জ্যাঠাকে ডেকে নিয়ে আসি—

রতনের মুখে চট্‌পটির জ্বরের খবর পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছেলেদের নিয়ে

এসে হাজির হলেন, তারপর কুয়ো থেকে সবাই মিলে ঘড়া ঘড়া জল তুলে ওর মাথায় ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন। আধ ঘণ্টা ধরে এই ভাবে মাথায় জল ঢাল্‌বার পর জ্বরটা নরম হল আর সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সেই অস্থির ভাবটাও কেটে গেল।

কয়েকটা দিন ধরে এইভাবে জ্বরটা ওঠ-নামা করতে লাগ্‌লো।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু আর একদিন বিকেল বেলা বেড়াতে এসে মাথা নেড়ে বল্লেন, উঁহু! এ ভাবে চট্‌পটির জ্বর কমবে না। আমি আস্‌বার সময় তাকিয়ে দেখ্‌লাম,—চারদিকে বিস্তর ঝোপ-জঙ্গল। রোজ রোগীকে মশায় কাম্‌ড়াচ্ছে। ওকে মশারীর ভেতর রাখতে হবে।

কুমোর খুড়ো ঠিক আগের মতোই তামাক টান্‌তে টান্‌তে জবাব দিলে, তোমাদের যেমন কথা দাদাবাবু! আমাদের আবার মশারি, আবার খাট-পালঙ্ক ··তোষাক···পাশ-বালিশ! বাপ-ঠাকুর্দ্দার আমল থেকে যে ভাবে চল্‌ছে সেই ভাবেই চল্‌বে। ধুম ধাড়াক্কা করে জ্বরও আস্‌বে, আবার পান্তা দিয়ে তেঁতুল গোলা খেলে পালাতে পথ পাবে না! ওর জন্যে তোমরা এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বুঝ্‌তে পারছি নে!

মৃত্যুঞ্জয়বাবু আবার মাথা নেড়ে বল্লেন, উঁহুঁ! বাপ্‌-ঠাকুর্দ্দার আমল চলে গেছে। তারা যা খেতে পেতো আর খেয়ে হজম করত আজকালের দিনের ছেলেরা কি তাই খেতে পায়? এ জ্বরের সঙ্গে বুঝ্‌বে কি করে? কাজেই জ্বর থেকে একেবারে শক্ত ব্যামো টায়ফয়েড্‌ ধরে যায়। পেটটা যাতে রোগীর ভালো থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে দিতে হবে। আর মশারি একটা অবশ্য জোগাড় করতে হবে।

ফটিক বল্লে, আমাদের বাড়িতে এক জনকার একটি বাড়তি মশারী আছে, আমি ঠাকুমাকে বলে সন্ধ্যে বেলা নিয়ে আস্‌বো'খন।

কুমোর খুড়ো দু হাত নেড়ে বল্লে,না-না দাদাবাবু, তোমাদের বাড়ীর মশারি কি আমরা'ঘরে আন্‌তে পারি? কর্ত্রী ঠাক্‌রুণকে তুমি ও সব কথা বোলো না যেন! আমরা ত তাঁদের খেয়েই মানুষ,—তাদের মশারী আমাদের বাড়িতে? না—না, সে দরকার নেই, ছেলে আমার পান্তা খেলেই দু'দিনে ভালো হয়ে যাবে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু একটা ধমক্ দিয়ে উঠ্‌লেন, তুমি থামো দেখি কুমোর খুড়ো, মশারিটা ত' ফটিকদের বাড়ীতে বাড়্‌তি হিসেবে পড়েই আছে। সেটা কাজে লাগালে যদি চট্‌পটি ভালো হয়ে ওঠে তবে কারো কোনো ক্ষতি ত' নেই। তুমি না হয় ভালো করে কেচে, পাট করে দিও—তা হলেই আর কোনো দোষ থাক্‌বে না।

ফটিক এগিয়ে এসে বল্লে, জ্যাঠাইমশাই ত' ঠিক কথাই বলেছেন। একটা মশারির চেয়ে একটা মানুষের জীবনের দাম বেশী! কি বলেন জ্যাঠামশাই?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ফটিকের মাথায় তার ডান হাতটা রেখে বল্লেন, তোমার মনের পরিচয় পেয়ে আমি খুব খুশী হলাম ফটিক। কুমোর খুড়ো হতাশ হয়ে জবাব দিলে, তোমাদের যা' খুশী করো বাপু! আমি এর মধ্যে নেই!

তারপর আপন মনেই গুড়ুক গুড়ুক তামাক টান্‌তে লাগ্‌ল।

ছেলেরা অবিশ্যি কোনো কথাই শুন্‌লো না। ফটিক যথা সময়ে তার ঠাকুমাকে বলে মশারিটা নিয়ে এসে খাটিয়ে দিলে। মশারি

আর কুইনিনের সাহায্যে তখন চট্‌পটির জ্বর তাকে ছেড়ে পালাতে পথ পেলো না।

কুমোর খুড়ো বল্লে. জ্বর নেমে গেছে—এইবার যা'—কলের জলে একটা ডুব দিয়ে বেশ করে পান্তা কচ্‌লে খেয়ে নে - শরীর একেবারে ঝর্‌ ঝরে হয়ে যাবে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, সর্ব্বনাশ! আমরা যখন আছি, তখন ও পুরোনো ব্যবস্থা কোনো মতেই চল্‌বে না। প্রথম দিন কৈ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে হবে।

যষ্ঠি আর মাকুন্দো বল্লে, আমরা কৈ মাছ মেরে নিয়ে আস্‌বো বঁড়শী দিয়ে,—সেজন্যে কাউকে ভাব্‌তে হবে না।

চট্‌পটি বল্লে, আমার মনে হচ্ছে—গাঁয়ে যত চাল আছে তার ভাত রান্না হলে—আমি সবটা একাই খেয়ে ফেল্‌বো।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু হেসে বল্লেন, জ্বরের পর অমনি খাই-খাই ভাবই হয়। মুখে যদি অরুচি না হয়ে থাকে তাকে শুভ লক্ষণ বল্‌তে হবে। পল্‌তা পাতার ঝোল খেতে হবে ওকে।

পলতা পাতা গাঁয়ে আছে প্রচুর। তুলে আন্‌লেই হবে। ঘণ্টে বল্লে, আমি এনে দেবো পল্‌তা পাতা, কত চাই?

এই ভাবে ছেলেদের কড়া ব্যবস্থায় চট্‌পটি ভালো হয়ে উঠ্‌ল।

রোগী যখন একেবারে সুস্থ হয়ে আগেকার মতো আবার ছেলেদের দলে ভীড়ে গেল তখন হঠাৎ গাঁয়ের বিশ্বম্ভর ডাক্তার একদিন কুমোর-বাড়ী এসে হাজির।

একথা, সে কথা, মোড়ায় বসে আলাদা হুঁকোয় অনেকক্ষণ ধরে তামাক টানার পর বিশ্বম্ভর ডাক্তার বল্লেন, তা বাবা, তোমাদের আর

বেশী কি মুখ ফুটে বল্‌বো। চট্‌পটি আমার অষুধেই ত ভালো হয়ে উঠ্‌ল! তোমাদের কাছ থেকে ত' আর ভিজিট নিতে পারিনে··· তাই বল্‌ছিলাম কি, আমাকে না হয় কিছু ধরে দিও। গাঁয়ের প্রাচীন ডাক্তার আমি। ঔষধের দাম না দিলে ত' ফল ফলে না। তাই চিকিৎসকের ব্যবস্থাটা আগে করতে হয়।

এইবার কুমোর খুড়ো পড়ল বিপদে। কেননা ডাক্তারকে ডাক্‌বার মতো সঙ্গতি তার নয়। ছেলেরা দল বেঁধে কি করেছে সেকথা ছেলেরাই জানে। 'মালোয়ারী'তে পান্তা খেতে হয়—এই ওদের একমাত্র অষুধ। এখন যদি হাঁড়ি-কুঁড়ি বিক্রী করে তাকে ডাক্তারের ভিজিট শোধ করতে হয়—তবে বেচারীকে সপরিবারে উপোস করে থাক্‌তে হবে।

ওর ভাগ্যি ভালো যে ঠিক সেই সময় রতন এসে পড়ল। বিশ্বম্ভর ডাক্তারকে মোড়ার ওপর বসে থাক্‌তে দেখে সে ব্যাপারটা খানিকটা আঁচ করে নিতে পারলে।

কুমোর খুড়োর মুখের অবস্থা অনেকটা এই রকম যে, ডুবে যাবার মুখে রতনকে হাতের কাছে পেয়ে সে যেন তাকে আশ্রয় করে ভেসে উঠ্‌তে চায়! তাই সে কাতর কণ্ঠে বল্লে, শোন ত' দাদাবাবু, আমরা গরীব মানুষ, ডাক্তারবাবুকে ভিজিট দেবার যোগ্যতা কি আমাদের আছে? পেটে ভাত জোটে না, অষুধের টাকা দেবো কোত্থেকে?

রতন ব্যাপারটা চট্‌ করে সব বুঝে নিলে। আর বিশ্বম্ভর ডাক্তারের খাইয়ের কথাও এ গাঁয়ে কারো অজানা নয়।

তাই বল্লে, ডাক্তারবাবু, চট্‌পটি ত' আপনার কুইনিন খেয়ে ভালো হয়নি—

বিশ্বম্ভর ডাক্তার সেই কথা শুনে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন। জবাব দিলেন, গাঁয়ে আর কটা ডাক্তার আছে শুনি? এই বিশ্বম্ভর ডাক্তারের কাছে সব শর্ম্মাকেই আস্‌তে হয়!

রতন বল্লে, সে কথা ত' সতিই ডাক্তারবাবু! আপনিই ত' এ গাঁয়ের ধন্বন্তরী, আর চট্‌পটির অসুখে আমিই ত' আপনার কাছ থেকে প্রথম কুইনিন এনেছিলাম।

এইবার বিশ্বম্ভর ডাক্তরের মুখে হাসি ফিরে এলো। বল্লেন, শোনো কুমোরের পো—শোনো রতন ছোঁড়ার কথা। ছেলেটি সত্যি ভালো। আমি বরাবর দেখে আস্‌ছি কি না।

ওদিকে কুমোর খুড়োর মুখ শুকিয়ে আম্‌শী হয়ে উঠেছে!

রতন সেদিকে লক্ষ্য করে বল্লে, তবে একটি কথা ডাক্তারবাবু। আপনার কুইনিন সত্যি চট্‌পটিকে খাওয়ানো হয়নি। যখন দেখা গেল আপনার দেয়া কুইনিনে শুধু ময়দায় গুড়ো মেশানো তখন মৃত্যুঞ্জয় জ্যাঠা নিজের বাক্স থেকে আসল কুইনিন বের করে দিলেন। তাতেই ত' চট্‌পটির ম্যালেরিয়া জ্বরটা চট্‌ করে বন্ধ হল।

এবার কিন্তু বিশ্বম্ভর ডাক্তারের মুখের অবস্থাটা সত্যি দেখবার মতো হল। তিনি শুধু বিড়-বিড় করে বল্‌তে লাগ্‌লেন, ও! মৃত্যুঞ্জয়বাবু! নিজের ভালো কুইনিন্‌···আচ্ছা বেশ!

আস্তে আস্তে ডাক্তারবাবু মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তামাকের আকর্ষণও আর তাঁকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারল না!

ওদিকে অঘ্রাণ মাসে সোনাধান ভর্ত্তী মাঠের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়।

কৃষাণদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় যে, এ বছর যেমন মা লক্ষী দয়া করেছেন তেমন কৃপা গত দশ বছরের মধ্যে নাকি তিনি করেন নি।

গভীর রাত্রে যখন জ্যোৎস্নার ঢল নামে সারাটা গ্রাম জুড়ে—চাষীর দল এক সঙ্গে অনেক সময় বেরিয়ে পড়ে নিজেদের ক্ষেত-ভর্ত্তী ধান দেখ্‌তে। ঝির ঝিরে হাওয়াতে পাকা ধান দোলে···মনে হয় মা লক্ষী ইসারা করে ডাক্‌ছেন, আর প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন। বহুদূর থেকে একটা মেঠো বাঁশী বাজ্‌তে থাকে আর মনে হয় তাদের মনের কথা ক্ষেতের আল ধরে কে যেন কানে কানে বলে বেড়াচ্ছে। এবার আর চাষীদের কোনো দুঃখ-দৈন্য থাক্‌বে না গ্রামে। খালের ধারে, হাটের পথে সকলেরই মুখে এক কথা। মুখে হাসি গাঁয়ের কিষাণদের, মুখে হাসি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র-লোকদের মুখে হাসি জমিদারের নায়ের গোমস্তাদের।

ফটিক-রতনের দল রোজ বিকেল বেলা গাঁয়ের ধান-ক্ষেতের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। ধানের শীষগুলি যেন আদর করে ওদের গায়ে স্থুড় স্থুড়ি দিতে থাকে।

গ্রামের অতি বৃদ্ধরা হুঁকো খেতে-খেতে মন্তব্য করেন, তা হলে মা লক্ষী এদ্দিন বাদে আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন! চঞ্চলা মা লক্ষী আবার অচলা হয়ে বস্থন এই ঠাঁই,—আমরা এই ত' চাই—!

কৃষাণেরা কাস্তেয় ধার দেয়।

কামার পাড়ার খাটুনি বেড়ে যায়।

তা বাড়ুক! আনন্দের সঙ্গে ওরা গল্প করে আর কাস্তেয় শান দেয়।

যার যার উঠোন পরিষ্কার করে গেরস্তরা।

মা লক্ষী ঘরে আস্‌ছেন পায়ে হেঁটে।

গোবর জলের ছড়া দিতে হবে, উঠোন ভালো করে নিকুতে হবে—যেন সিঁন্দূরটুকু পড়লে হাত দিয়ে তুলে নেয়া চলে।

আর দিতে হবে চিত্র-বিচিত্র লক্ষীর আলাপনা!

তুলসী তলার পিদিম নতুন আশ্বাস নিয়ে আসে গাঁয়ে।

ওদিকে ধান কাটা সুরু হয়ে গেছে মাঠে-মাঠে। পাকা ধানের গন্ধে সারাটা গ্রাম একেবারে ম' ম' করছে।

সোনা ধানের ওপর পড়েছে সোনালী রোদ।

তাই ত কৃষাণদের কণ্ঠে জেগে উঠেছে গান।

ওদের গানের গলা কিন্তু বেশ!

দল বেঁধে এক সঙ্গে কাঁচি চালায় হাতে—আর গান গায় গলা ছেড়ে। সেই গানের কথা আর সুর সারা মাঠময় পাগ্‌লা হাওয়ার কাঁধে চেপে ভেসে বেড়ায়।

যে সব পথিক পাশের জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে পথ চলাচল করে তারাও বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে এ গাঁয়ের কিষাণদের গান নীরব দুপুরে খানিকক্ষণ কান পেতে শুনে যায়।

ধান কাটা শেষ হয়ে গেলে লোকের মাথায় মাথায় সেই সব ধান এসে গেরস্ত বাড়ীর উঠোনগুলি ভর্ত্তী করে ফেলে।

তারপর কিছুদিন চল্লো ধান আর খড় আলাদা করবার পালা।

ঢেঁকীতে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা ধান ভানে, তার শব্দ এ পাড়া থেকে ও

পাড়া অবধি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ী ভরে যায়।

নবান্নের উৎসবে সারা গাঁয়ের লোক মেতে ওঠে। মিঠে লাল চালের গন্ধে—অন্ধ আতুর ভিখিরীর দল এসে ভীড় জমায়।

তাদের কিন্তু ফেরাতে নেই, মা লক্ষী তা হলে মুখ ফিরিয়ে নেন; বাড়ীর ছেলে মেয়েরাই তাদের আঁচল ভরে চাল তুলে দেয়।

এগারো

এইবার গাঁয়ের বুড়ী দিদিমা-ঠাকুর মার দল দাঁতে মিশি মাখ্‌তে মাখ্‌তে বল্লে, বৌ-ঝিরা, কাঁথা, দোলাই. লেপ-তোষক রদ্দুরে দাও। শীত এসে গেছে।

প্রত্যেক বাড়ীর উঠোন জোড়া বাঁশ খাটানো হয়েছে। সেখানে সারে সারে রদ্দুরে দেয়া হয়েছে—পুরোনো আমলের পদ্ম-কাঁথা, দোলাই, কাশ্মিরী শাল, কম্বল, লেপ, তোষক, ঠাকুর্দ্দার আমলের সব গরম জামা।

সত্যি শীত এসে [illegible]

সকালের সোনালী রদ্দুরটুকু ভারী মিঠে লাগে।

বুড়োর দল কাপড়ের খুঁট্ গাঁয়ে দিয়ে দাঁতন করতে করতে গাঁয়ের চোরাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ায়। কার কটা খেজুর গাছ আছে সেই সম্পর্কে আলোচনা চলে। খেজুর গাছের তলাগুলো পরিষ্কার করে দিতে হবে। কাম্‌লা ডেকে হাঁড়ি বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে।—খেজুরের রসের দিন এসে গেল যে!

সেন বাড়ীর বুড়ো সর্ব্বেশ্বর সেন বল্লেন, শীতের দিনেই ত' খাওয়া দাওয়ার সুখ। পিঠে খাও, পায়েস খাও, সর-পড়া বেগুন্ খাও, চিতল

মাছের ঝোল ডালের বড়ি দিয়ে খাও……কপির ঘন্ট খাও—যা খুশী।

বিশু খুড়ো জিব দিয়ে খানিকটা রসালো শব্দ করে জবাব দিলে, কেন আর ও সব কথা মনে করিয়ে দাও ভায়া – কতদিন যে ভালো-মন্দ জিনিস খাইনে সে কথা ভুলেই গেছি।

জনার্দ্দন সরকার মুখ চট্‌কে জবাব দিলে, সেজন্যে আর আমাদের ভাব্‌নাটা কি? প্রতি বছর পৌষ-পার্বণে সন্ধ্যে বেলা সেন মশায়ের ওখানে সারা গ্রাম পাত পাতে। সেই পৌষ-পার্ব্বণের উৎসব ত' দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসে যাবে।

সত্যি, উৎসব আস্‌বার অনেক আগে থেকেই ছেলে মহলে চল্লো আলোচনা আর পিঠের ফর্দ্দ তৈরী। কে কত পিঠের নাম করতে পারে তাই নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। ক্ষীরের পুলি, আস্‌কে পিঠে, পাটি সাপ্‌টা, চন্দ্রপুলি, আউলা-ঝাউলা, পুলি পিঠে, চন্দ্রকাট, চিতৈ পিঠে, গোকুল পিঠে, পরচিত্ত-হরণী, রসপুলি, মুগ সাউলী আরো কত মজাদার নাম—যা মুখস্ত করে রাখ্‌তে হয়। এছাড়া পরমান্ন আছে আবার কত রকমের।

যারা নিজেরা নাম বল্‌তে পারে না বাড়ী থেকে ঠাকুমা-দিদিমার কাছ থেকে নাম জেনে নিয়ে আসে।

প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা কবে থেকে চালের গুড়ো তৈরী করার কাজে লেগে গেছে!

ঢেঁকির শব্দ শোনা যাচ্ছে এবাড়ী থেকে ও বাড়ী—আর এ পাড়া থেকে—ও পাড়া!

ছেলের দল জিব দিয়ে ঠোঁট চাট্‌তে-চাট্‌তে বলে, খেলেই ত' ফুরিয়ে গেল···ভাব্‌তেই মজা লাগে।

পৌষ-পার্ব্বণের সময় ডাং-গুলি খেলার ধূম পড়ে যায় গ্রামে। খটাস্ খটাস্ শব্দ···আর সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে উড়ে যায় গুলি—যেন ভোম্‌রা উড়ে যাচ্ছে—বন্‌বনিয়ে।

খেলার নেশায় মেতে ওঠে সারা গায়ের ছেলের দল।

ছেলেদের মতো মেয়েরা ত' আর ডাণ্ডা-গুলি খেল্‌তে পারে না, তারা মা, মাসি, পিশি, ঠাকুমা, দিদিমাদের হাতে-হাতে জোগান দেয় আর পিঠে তৈরীর কলা-কৌশলটা শিখে নেয়।

পৌষ-পার্ব্বণের আগের দিন সেন বাড়ির সর্ব্বেশ্বর সেন মশাই নিজে একজন পুরুত সঙ্গে নিয়ে সারা গ্রাম নেমন্তন্ন করতে বেরোন। এতে চিরকাল বুড়োর ভারী উৎসাহ।

—ওরে ক্ষেন্তি, তোর জ্যাঠামশাইকে ত' বাড়ীতে পেলাম না।

—সবাই মিলে যাবি বুঝ্‌লি? বৌমাদের বল্···আমি নিজে নেমন্তন্ন করতে এসেছি। না গেলে ভারী দুঃখ পাবো। বলে দে সবাইকে—আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

এমনি ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুড়োর সবাইকে নেমন্তন্ন করা চাই। নইলে তাঁর মন ওঠে না।

—মালতির ছোট মেয়েটার অসুখ বুঝি? গত বছর ও চেয়ে চেয়ে পাটি-সাপ্‌টা খেয়েছিল। আমি এবার বেশী করে পাটি সাপ্‌টা তৈরী করতে বলেছি। ও যেতে পারবে না শুনে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল।

—মুকুন্দ, তুই কাওনের পরমান্ন বড্ড ভালোবাসিস্। গত

বছর দেরী করে গেলি,—ফুরিয়ে গিয়েছিল। এবার একটু সকাল সকাল যাবি।

এমনি করে পালা-পার্ব্বণে সারা গায়ের লোককে আদর করে ডাক্‌তে একমাত্র সেন মশাই-ই পারেন। নিজেও যেমন খেতে পারেন - খাইয়েও তাঁর তেমনি তৃপ্তি।

সর্ব্বেশ্বর সেন যখন মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন—তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

দাওয়ায় মোড়া পেতে দিয়ে তিনি বল্লেন, আপনি ত' জানেন সেন মশাই, আমি কোথায়ও নেমন্তন্ন খাইনে। তবে সারা গাঁয়ের লোকের ভোজ দেখাও ত' পুণ্যির কাজ। আমি সেই পুণ্যি-সঞ্চয় করতে আপনার ওখানে গিয়ে ঠিক হাজির হব।—ভুল আমার হবে না।

সেনমশাই মাথা নেড়ে বল্লেন, হ্যাঁ, বৌমাকে নিয়ে যেতে কিন্তু ভুলো না। হয়ত গাছ-কোমর হয়ে তাঁকে পরিবেশনের কাজে লাগ্‌তে হবে। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা তাঁর ভারী বাধ্যের—কাজেই তাঁকে পায়ের ধূলো দিতেই হবে।

মাথা নেড়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলেন, আপনার আদেশ কি কেউ ঠেলতে পারে?—যাবে বৈ কি, নিশ্চয়ই যাবে। ঐ দিকে দেখুন, আপনার বৌমা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছেন।

খুশী হয়ে সেনমশাই বল্লেন, বেশ! বেশ! এইবার আমি একেবারে নিশ্চিন্ত।

সেইদিন একটু বেশী রাত্তিরে গাঁয়ের ছেলেদের এক গোপন বৈঠক বসল। ঘণ্টে, চট্‌পটি, মাকুন্দো, ষষ্ঠি, টোনা, ছায়েদা, ফটিক, রতন সবাই সেই বৈঠকে হাজির।

রতন বল্লে, তোরা যাই বলিস্, সেনমশাই যা আয়োজন করেন তা' তাকিয়ে দেখবার মতো। পিঠের পাহাড় আর পায়েসের সরোবর বল্লেও চলে। গোটা গাঁয়ের লোক খেয়ে শেষ করতে পারে না।

ফটিক জবাব দিলে, সেকথা ত' আমরা অস্বীকার করছি না। আমাদের বল্‌বার কথা হচ্ছে একটু মজা করতে হবে। শুধু শুধু দল বেঁধে গেলাম—আর পাতা পেতে পিঠে পায়েস খেয়ে পেট জয়ঢাক করে ফিরে এলাম—তাতে কোনো মজা হয় না। খাওয়াও চাই, মজাও চাই—

টোনা শুধোলে, আচ্ছা, মজাটা কি শুনিই না—?

ফটিক জবাব দিলে, তবে বলি শোন! সেনমশায়ের রান্না ঘরটা বাড়ীর এক কোনে! বাইরের দিকে একটা বড় জানালাও আছে। তারপর ফিস্ ফিস্ করে ছেলেদের যে কি বল্লে কিছুই শোনা গেল না!

তখন সকলে খুশী মনে শীস্ দিতে দিতে যে যার বাড়ী চলে গেল।

সেন মশায়ের বাড়ীর মেয়েরা সারাদিন ধরে নানা রকম পিঠে-পায়েস তৈরী করে সন্ধ্যের মুখে সবাই দল বেঁধে গেছেন পুকুরে গা ধুতে। ফিরে এসে ঘরে ঘরে সন্ধ্যে বাতি দেখিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে তাঁদের চোখ একেবারে কপালে গিয়ে উঠ্‌ল!

পিঠের বড় বড় থালা, পায়েসের গাম্‌লা সব উধাও! পেছন-দিকের জান্‌লাটা খোলা!

এক্ষুণি গাঁ শুধু লোক খেতে আস্‌বে!

কি লজ্জার কথা!

খবরটা সেনমশায়ের কাছে নিয়ে পৌঁছুলো।

তিনি ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলেন রান্নাঘরে। এতগুলো গাম্‌লা, ডেক্‌চি,

কড়াই কি করে উধাও হল ! রান্নাঘরে কি ভীম সেন আর ঘটোৎকচ গোপনে ঢুকেছিল !

সেনমশাই একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

গাঁয়ের মোড়লের দল অনেকেই ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁদের গ্রামে যে হঠাৎ একটি বক-রাক্ষসের আবির্ভাব ঘটেছে···এই খবর কারো জানা ছিল না ! মোড়লদের হাতে হাতে হুঁকো ঘুরতে লাগ্‌লো। তামাকের ধোঁয়ায় উঠোন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল ; ওই শীতেও অনেকের টাকেই ঘর্ম্ম-বিন্দু দেখা দিল···কিন্তু এই আকস্মিক বিপদের কোনো কারণই খুঁজে বের করা গেল না !

বিশু খুড়ো বল্লেন, থানায় খবর পাঠানো যাক্ সেনমশাই·· নইলে এমন একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনার কিনারা করা যাবে না।

বিশু খুড়ো গ্রামের অনেক চাষা ভূষোকে খবরের কাগজ পড়ে শোনায় তাই "চাঞ্চল্যকর", "সঙ্কটজনক পরিস্থিতি" প্রভৃতি কথাগুলো তাঁর বিলক্ষণ জানা আছে।

জনার্দ্দন সরকার কপালে একটা করাঘাত করে বল্লেন, হায়-হায়-হায় ! এমন অঢেল আয়োজন ··এইভাবে সাত-ভূতে লুটে নিয়ে গেল···গাঁয়ের কাক-পক্ষীতেও জান্‌তে পারল না। বাড়িতে বলে এলাম যে রাত্তিরে কিচ্ছু খাবো না ! এখন আমায় রাত-উপোসী থাক্‌তে হবে দেখ্‌ছি।

বসির মিঞা রসিকতা করে বল্লে, ভয় কি সরকার মশাই, সেন মশায়ের ঘরে প্রচুর চাল-ডাল জমা আছে—আর কিছু না হোক···গরম খিচুড়ি ত' পাকানো যাবে !

অকূলে কূল পেয়ে সেন মশাই বল্লেন, ঠিক ! ঠিক। বসির

মিঞা খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছে। আমার বাড়ি থেকে পৌষ-পার্ব্বণের দিনে সবাই খালি মুখে চলে যাবে—এ কখনো হ'তে পারে না !

তিনি বাড়ির মেয়েদের চাল-ডাল বের করতে বল্লেন, এমন সময় ছেলের দল এসে উপস্থিত।

রতন জিজ্ঞেস করলে, এত হৈ-চৈ কিসের ? সব পিঠে-পায়েস আমরা আস্‌বার আগেই ফুরিয়ে গেল নাকি ?

জনার্দ্দন সরকার চটে-মটে উঠে জবাব দিলেন, হুঁ। পিঠে খাবে না, উনুনের ছাই খাবে—

সেন মশাই হাঁ-হাঁ করে মাঝখানে এসে পড়লেন। বল্লেন, আজ পৌষ-পার্ব্বণের দিন। ছেলেদের কি এমন অলক্ষুণে কথা বল্‌তে আছে ? আমি কত আদর করে সবাইকে আমার বাড়িতে ডেকে এনেছি।

ফটিক একেবারে ভেজা বিড়ালটির মতো শুধোলে, আচ্ছা ব্যাপারটা কি তাই আপনারা কেউ বলুন না। মনে হচ্ছে কি একটা ঘটনা ঘটেছে যা আপনারা সবাই আমাদের কাছ থেকে গোপন করছেন। খুলে বল্লে হয়ত আমরা সবাই মিলে সমস্যার একটা সমাধান করতে পারি—বিশু খুড়ো বল্লেন, হুঁ। হাতি ঘোড়া গেল তল—এখন ভেড়া বলে কত জল।

জনার্দ্দন সরকারের মনে দাগা লেগেছিল বোধকরি সব চাইতে বেশী। কাজেই তিনি মারমুখো হয়েছেন যেমন উগ্রভাবে—তেমনি সব কথা গড়গড় করে বলে গেলেন সবাইকার আগে !

ফটিক যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল !

বল্লে, আমরা গাঁয়ে থাক্‌তে এমন কাণ্ড হবে! আমাদের মুখের গ্রাস খেয়ে যাবে কোন্ বক-রাক্ষস? এ আমরা কিছুতেই হতে দেবোনা—!

ছেলের দল হুঙ্কার দিয়ে বল্লে, কখনই নয়।

ফটিক আবার আকাশে হাত তুলে বল্লে, যে করে হোক পিঠে-পায়েস আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

ছেলের দল আবার চীৎকার করে বল্লে, নইলে আমরা সারারাত না খেয়ে থাক্‌বো, গোটা গ্রাম তোলপাড় করে তুল্‌বো। আসল চিজ আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

সেনমশাই ছুটে এসে ফটিকের হাতটা জড়িয়ে ধরে বল্লেন, এ কাজ যদি তোমরা করতে পারো বাবা, তবে আমার মান রক্ষে হয়, নইলে গোটা গাঁয়ের লোকের কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে?

ফটিক বল্লে, খুঁজে আমরা বের করবোই। কিন্তু আপনি আমাদের কি পুরস্কার দেবেন বলুন?

সেনমশাই আকুল আগ্রহে শুধোলেন, কি তোমরা চাও বল?

ফটিক জবাব দিলে, আজ ত' পিঠে-পায়েসের নেমন্তন্ন···তাহলে বলুন আপনি আমাদের ছেলের দলকে আর একদিন ভরপেট পোলাও-মাংস খাওয়াবেন!

সেনমশাই আনন্দের সঙ্গে মাথা নেড়ে বল্লেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়!

তখন ছেলেদের মধ্যে খোঁজ-খোঁজ রব উঠে গেল! এ ছুট্‌ছে এদিকে, সে ছুট্‌ছে ওদিকে···আর একজন যাচ্ছে আর একদিকে—

ভানুমতীর খেলে কি হল বলা শক্ত!

আধ ঘণ্টা বাদে ছেলের দল ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরে এসে বল্লে,

সব দিক ত' দেখা হল, কিন্তু রান্না ঘরটা ত' একবার আমরা দেখে যাই নি !

জনার্দ্দন সরকার রাগে যেন একেবারে ফেটে পড়লেন ! তেড়ে-মেরে উঠে একেবারে হাত নেড়ে বল্লেন, এতক্ষণ বাদে তোমরা এসে রান্নাঘর দেখ্‌তে চাচ্ছ ! খুব বুদ্ধি যা হোক ! সেখানে যে সব হাঁ-হাঁ করছে।

—তবু তদন্তটা পরিষ্কার করে হওয়া ভালো। ফটিক বিনীতভাবে অনুরোধ জানালে।

হতাশার সুরে সেনমশাই বল্লেন, চলো···, রান্নাঘরে আর কি দেখ্‌বে—

বাড়ীর মেয়েরা গিয়ে শেকল খুলে দিলে,—পেছনে গ্রামের মোড়লগণ আর ছেলের দল !

কিন্তু দড়াম করে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুক্‌তেই সকলের কণ্ঠে একটা বিস্ময়ের সুর জেগে উঠ্‌ল !

একি !

থালে থালে. ডেক্‌চি, কড়াইতে— সব পিঠে-পায়েস···যেমনটি ছিল তেমনিই আছে ! এতটুকু খোয়া যায়নি !

বিশুখুড়ো চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বল্লে, অ্যাঁ ! তাহলে কি সত্যিই ভানুমতির খেল !

জনার্দ্দন সরকার ভয় পেয়ে বল্লে, কিন্তু এ পিঠে-পায়েস আমি মুখে দিচ্ছিনে ! শেষকালে রাত্তিরে উঠে দেখবো আমি শুদ্ধ্‌ হাওয়া হয়ে গেছি !

ফটিক মৃদু হেসে কইলে, আসল কথা কিন্তু তা নয়। আমাদের

সেন বাড়ীর ঠাকুমা আজ সন্ধ্যেবেলায় আফিম খেতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি রান্নাঘরে ঢুকে সব আঁধার দেখেছিলেন!

একটা প্রবল দমকা হাসির মধ্যে নিমন্ত্রণ ফস্কে যাবার উদ্বেগ কেটে

গেল! সবাই কলাপাতার খোঁজ করতে লাগ্‌লো। এমন সময় সস্ত্রীক মৃত্যুঞ্জয়বাবু উঠোনে ঢুকে বল্লেন, আপনারা সবাই এক সঙ্গে বসে যান। পরিবেশনের জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না!

হাসির রোল প্রবলতর হয়ে উঠ্‌ল!

বারো

পৌষ-পার্ব্বনের পিঠে ভরপেট খেয়েও ছেলেরা কিন্তু পোলাও-মাংসের কথাটা ভোলে নি।

মাঘমাসের শীতে সবাই ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপে। এবার শীতটাও পড়েছে একটু বেশী।

চটপটি কাঁথাটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বল্লে, এ শীত কিছুতেই যাবার নয়। সেনমশাই সেই যে পোলাও-মাংসের কথা বলেছিলেন না—?

ছায়েদ মুখ চটকে জবাব দিলে, মনের কথা টেনে বলেছিস ভাই চট্‌পটি! চল, সবাই গিয়ে একদিন সেনমশাইকে কথাটা মনে করিয়ে দেয়া যাক্‌—

ফটিক রসিকতা করে বল্লে, যা শীত পড়েছে—সেনমশাই নিশ্চয়ই তাঁর দেয়া কথা ভুলে গিয়েছেন।

ছায়েদ উৎসাহিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, সেই ভালো রে—সেই ভালো। চল, আবার মনে করিয়ে দেবো আমরা।

রতন ফোঁড়ন কাট্‌লে, আচ্ছা ছায়েদ, তোর এ ব্যাপারে এত উৎসাহ কেন বলত? তুই ত' জবাই করা মাংস ছাড়া খাবিনে!

ছায়েদ মাথা নেড়ে বল্লে, হুঁ! বাপজান জান্‌তে পারলে ত? তোদের সঙ্গে বসে খাবো—তার মজাই আলাদা! এই বলে সে মুখ চোট্‌কাতে লাগ্‌লো।

সেদিন সকাল বেলা সেনমশাই রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বেশ আমেজ করে গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টান্‌ছিলেন। ছেলের দল এই সময় গিয়ে হাজির হল তাঁর বাড়ীতে।

অনেকখানি ধোঁয়া এক সঙ্গে মুখ থেকে বের করে দিয়ে তিনি হাসিমুখে বল্লেন, মনে করিয়ে দিতে এসেছ বুঝি? এই হাড়-কাঁপানো-শীতে আমার রোজই মনে পড়ছে। ওই দেখ, সরু চাল আনিয়ে রেখেছি। কাল রোদ্দুরে দিয়ে পরিষ্কার করে ঝেড়ে রেখেছে। শুধু এখন একটা পুরুষ্টু পাঁটা কিন্‌লেই হয়।

ছায়েদ আনন্দে লাফিয়ে উঠে বল্লে, আজকে উত্তুর চরের হাট। সেইখানে ভালো-ভালো পাঁটা কিন্‌তে পাওয়া যায়—, তা আপনি যদি অনুমতি করেন ত' আমরাই না হয় দল বেঁধে নৌকো করে গিয়ে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সেনমশাই উত্তর করলেন, নিশ্চয়ই তোমরা কিনে নিয়ে আস্‌বে। এই পাঁচটি টাকা নিয়ে যাও, আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি। তোমরা না এলে আজ আমিই তোমাদের ডেকে পাঠাতাম! এই বলে তিনি ট্যাঁক থেকে পাঁচটি নগদ টাকা বের করে দিয়ে আবার গুড়ুক্-গুড়ুক্ তামাক টান্‌তে সুরু করে দিলেন।

এতে যদি উৎসাহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে না ওঠে—তবে আর কিসে উঠ্‌বে? ছেলের দল সেনমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তক্ষুণি নৌকো ঠিক করতে চলে গেল!

উত্তুর চরের হাটে প্রচুর জিনিস ওঠে। তার ভেতর গৃহপালিত পশু-পাখির সংখ্যাও বড় কম নয়!

নতুন ওঠা চরে যে সব হিন্দু-মুসলমান কৃষাণ কুঁড়ে ঘর তুলে ঝড়-তুফানের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে নদীর কিনারে বাস করে তারাই পালে হাঁস, মুরগী, পাঁটা, ছাগল, পায়রা···আরো অনেক পাখী। উত্তুর চরের হাটে সেই সব পশুপাখীর আমদানী বেশী বলেই দরটাও বেশ সস্তায় পাওয়া যায়।

কালী পূজোর বলির পাঁটা দরকার···যাও উত্তুর চরের হাটে; ছেলেরা চড়ুই ভাতি করবে? সদর থেকে দারোগা এসেছে কোন খুনের খানাতল্লাসীতে? জমিদারের পাইক ছুট্‌লো উত্তুর চরের হাটে মুরগী কিন্‌তে। কাজেই এই অঞ্চলের ছেলেদের রসনা উত্তুর চরের হাটের নামে লালাসিক্ত হয়ে উঠে! পেটুক বলে যাদের দুর্নাম আছে তারা নাকি ভাত মাখ্‌বার সময় মনে মনে ঠাকুর দেবতার নাম না নিয়ে উত্তুর চরের হাটের কথা স্মরণ করে। শুধু নুন ভাতও থালা-থালা কোথায় উড়ে যায় কেউ টের পায় না! উত্তুর চরের হাটের এমনি নাম-মাহাত্ম্য! সেই হাটের উদ্দেশ্যে চল্‌লো আজ দল বেঁধে ছেলেরা।

হাত-বৈঠে টান্‌তে টান্‌তে ফটিক বল্লে, আচ্ছা, একটা বড়-সড়ো দেখে খাসি কিন্‌লে কেমন হয়? দিব্যি খাসির তেলের বড়া হবে'খন।

রতন নাক কুঁচ্‌কে জবাব দিলে, না-না। খাসির মাংস অনেকে ভালোবাসে না! তার চাইতে কচি পাঁঠাই ভালো। যদি একটাতে না কুলোয় তবে দুটো কচি পাঁঠা কিনে নিলেই তার সঙ্গে গরম পোলাও জম্‌বে ভালো।

ঘণ্টে বল্লে, গাওয়া ঘীটা সরেস হওয়া দরকার। নইলে যত কচি পাঁঠাই কিনে নিয়ে যাও না কেন—এক ঘটি দুধে এক ফোঁটা চোনার মতো সব নষ্ট হয়ে যাবে !

মাকুন্দো মাথা দুলিয়ে জবাব দিলে, সেজন্যে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। সেনমশাই নিজে খাইয়ে লোক। চিরজীবন ভালো-মন্দ খেয়েছেন; লোককেও খাইয়েছেন প্রচুর। তিনি নিজে ব্যবস্থা করে যে ঘী কিনবেন···সেটা সরেস না হয়ে কি নিরেস হবে নাকি ? একথা তুই ভাব্‌তে পারলি কি করে !

ঘণ্টে মাকুন্দোর ধমকানি খেয়ে চুপ করে গেল।

ফটিক বল্লে, মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই ভাই; ভগবান মাপ্‌লে খাওয়া আমাদের ভালোই হবে। এখন আয় সবাই মিলে গান ধরি -- তাহলে গানের তালে-তালে হাতের বৈঠে চল্‌বে ভালো।

পরামর্শটা ভালো, তাই সবাই আর কোনো আপত্তি না করে, সকলে জানে এমন একটি গান সুরু করে দিলে।

—বৈঠা চালা জোরে জোরে
প্রাণে বাজে সুর—
গাঙের জল কয় রে কানে—
হাট যে অনেক দূর !

ওদের গলা বেশ ভালোই।

তাই নদীতে বৈঠার তালে তালে গাইবার জন্যে নিজেরাই অনেক গান তৈরী করে নিয়েছে ! যখন যে গানটা প্রাণে গুণ-গুণ করে ওঠে ওরা গলা ছেড়ে গাইতে থাকে—

আশে-পাশে যে সব নৌকো হাটের দিকে চলেছিল তাদের মাঝিরাও কান খাড়া করে গান শোনে আর গুড়ুক্-গুড়ুক্ তামাক টানে।

নদীর ওপর গান ত' শুধু কয়েকটি মিল·দেওয়া কথা নয়! গানের সুর মিশে যায় নদীর স্রোতের ছল্‌ছলানির সঙ্গে, কাশ ফুলের দোলনের তালে, উড়ে যাওয়া বেলে হাঁসের ডাকের সাথে, ঝির ঝিরে হাওয়ার তালে-তালে, নীল আকাশের রঙের মধ্যে-মধ্যে। সবাই মিলে যেন হাততালি দিয়ে গানের সঙ্গে সঙ্গত্ করতে থাকে। মনে হয়—সারাটা ভুবন ছুটে এসে তোমাদের সবাইকার সঙ্গে মিতালি পাতালো।

হ্যাঁ, হাট বল্‌তে হয় বটে একে!

এমন টাট্‌কা জিনিস্ আর কোথায় মিল্‌বে সহর অঞ্চলে? আনাজ, তরী তরকারী একেবারে লক্‌লক্ করছে—যেন মাটির সঙ্গে সংযোগ এখনো ওদের ছিন্ন হয় নি।

নদীর চরে জন্মেছে লাউ, কুমড়ো, পেঁয়াজ দেখ্‌লে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। পেঁয়াজকলিগুলো এত তাজা যে হাত দিয়ে টান্‌তে ভয় হয়, বুঝি গায়ে ব্যথা পাবে! পেঁপের মুখ দিয়ে বেয়ে পড়ছে সাদা কস্···মনে হয় তুলে আনা হয়েছে বলে ওদের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে নীরবে। এমন তাজা তরী-তরকারী হাতে নিতেও সুখ।

শুধু কি তরী-তরকারী? পাকা ফলেরও অভাব নেই এখানে। যে দিনের যা—গাছ দু হাত মেলে দান করে যায়! রসে টুলটুল করছে, ভেজাল বল্‌তে কিচ্ছু নেই।

তাঁতিদের হাতে তৈরী; লোকে—বলে—জোলার ধুতি আর

গামছা। তাও সাজানো হয়েছে একদিকে থরে থরে। হুঁকো কল্‌কে তামাক টিকে—যত খুসী কিনে নাও। মাস বরাদ্দের সওদা কিনে অনেকেই নৌকো বোঝাই দিয়ে বাড়ী চলে যায়।

সকলের শেষের দিকে রয়েছে—ছাগল, গরু, ভেড়া, পশু-পক্ষী, হাঁস-মুরগীর হাট। কচি ঘাস খেতে পেয়েছে বলে ওদের তৈল-চিক্বণ দেহ সুন্দর দেখাচ্ছে। জল আর মাটির দেয়া নির্ম্মল খাদ্য ওরা পেট পুরে খেয়েছে, তাইত—পশুগুলির দেহেও কোনো রোগ-বালাইয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। পেটুকদের জিব যে আপনা থেকেই লালাসিক্ত হয়ে উঠ্‌বে—এতে আর ভুল কি ?

ছায়েদ চোখ টিপে সবাইকে আগে থেকেই সাবধান করে দিলে, তোরা আবার দর-দস্তুর করতে যাস্‌নে যেন !

—কেন ? কেন ? জিজ্ঞাসা করে ফটিক।—তুই কি আমাদের বোকা পেয়েছিস যে দর করলেই ওরা আমাদের ঠকিয়ে দেবে ?

ছায়েদ বল্লে, এ বোকা-চালাকের কথা নয়। এ হাটের দর-দস্তুরের নিয়ম কানুনই আলাদা। তোরা সে সব অন্ধি-সন্ধি ত' কিছু জানিস্‌নে ! কি বল্‌তে কি বলে ফেলে আট্‌কা পড়ে যাবি ওদেরই কথায়। আমি বাপজানের আর ব্যাপারীদের সঙ্গে কতবার এসেছি। দর-দস্তুরের নমুনাটা কিছু কিছু শিখে নিয়েছি। কাজেই আগে থেকে সাবধান হওয়াই ভালো।

ছায়েদের কথা বলার রকম-সকম দেখে সবাই সত্যি ভয় পেয়ে গেল ! কি পথে দর চড়াতে হবে না জানা থাক্‌লে নিজের কথাতেই নিজের ধরা পড়বার সম্ভাবনা রইল ! চার টাকার জিনিস যদি পাঁচ সিকে থেকে দর সুরু করতে হয় তবে একটা প্রাণের ভয়ের কথাও

রইল। চরের লোকদের মেজাজ নাকি সব সময় একটু চড়া সুরে বাঁধা থাকে! যদি এক ঘা লাঠি বসিয়ে দেয় ত' আপিল করবার আর ফুরসৎ পাওয়া যাবে না!

কাজেই ছায়েদই দর করুক। লাঠি পড়বার আগে ও নিজেকে সাবধান করে মাথা বাঁচিয়ে ফেল্‌তে পারবে।

নদীর কিনারে কিনারে খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে অঢেল পুরুষ্ট পাঁঠা! অনেক সময় ভুল হয় যে, এগুলি হয়ত সারবন্দী কালো পাঁঠা নয়,— রামের আদেশে সমুদ্র তীরে সমবেত হয়েছে বানর সৈন্য। সুগ্রীব নল, নীল, অঙ্গদ···হনুমানের আদেশ পেলেই লাফিয়ে উঠে সমুদ্র-বন্ধন করতে সুরু করে দেবে।

কিন্তু ক্রমাগত ব্যাঁ-ব্যাঁ ডাকে সে কল্পনার জাল আপনা থেকেই ছিঁড়ে যায়। বহু পাঁঠা আবার নৌকো থেকে নামানোই হয়নি। তারা পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে দিব্যি খোস-মেজাজে আর মহা আরামে কাঁঠাল পাতা চিবুচ্ছে।

ছায়েদের অসীম উৎসাহ!

সে কিন্তু চুপ করে বসে নেই। ক্রমাগত দর-দস্তুর চালিয়ে যাচ্ছে চরের কৃষাণদের সঙ্গে। মনে হয় এবারকার হাটে দরটা একটু চড়াই হাঁক্‌ছে ওরা। যেটা মনে মনে পছন্দ হয় সেটার হাঁক শুনে একটু পিছিয়ে আস্‌তে হয়; আবার যেটার দাম একটু মনোমত সেটাকে বড্ড ছোট বলে মনে হয়। ষাটের আশীর্ব্বাদে ওরা এতগুলি প্রাণী—আশ্ মিটিয়ে মাংস খাবে। কিন্তু খেতে বসে যদি কম পড়ে যায়—তবে হাত আর পাত চাটাই সার হবে।

হাটের এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে পায়ের গেরো

ছিঁড়ে যাহার উপক্রম হল—কিন্তু দরে আর বনে না। ওদিকে সূর্য্য ঠাকুর পাটে বস্‌লেন—আঁধার ঘনিয়ে এলো।

ষষ্ঠি ব্যস্ত হয়ে শুধোলে, হ্যাঁরে ছায়েদ, তোর কি মতলব যে, এ হাটে আমরা শুধু .দর-দস্তুরই করবো? ওদিকে সেনমশাই গরম পোলাও চাপিয়ে বসে আছেন।

ছায়েদ একটা হাই তুলে বল্লে, সত্যি, ঘুরতে ঘুরতে ক্ষিদে পেয়ে গেছে। চল সবাই মিলে মুড়ি আর গরম জিলিপি কিনে ওই বটগাছ তলায় বসে খাওয়া যাক্।

খোঁজাখুঁজির ডামাডোলে ছেলের দল ক্ষিদের কথা বেমালুম ভুলেই বসেছিল। ভাব্‌ছিল, অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি হয়েছে তাই শরীর বোধ করি ঝিমিয়ে পড়েছে—পা আর চল্‌তে চাইছে না! কিন্তু সেটা যে আসলে ক্ষিদে—তা ধরা পড়ল ছায়েদের কথায়। সবাই সায় দিয়ে মাথা নাড়্‌তে লাগ্‌লো। টোনা বল্লে, মুড়ির সঙ্গে গরম জিলিপি? অ্যাঁ? সেটা মনে হচ্ছে পোলাও মাংসের চাইতেও খেতে ভালো লাগ্‌বে।

ওদের বরাৎ সত্যি ভালো।

একটা খাবারের দোকানে তক্ষুণি খোলা চাপিয়ে গরম গরম তেলে-ভাজা জিলিপি তৈরী হচ্ছে।

কে কতো খাবে—বসে যাও।

ছায়েদ ইতিমধ্যে কোঁচড় ভর্ত্তী গরম মুড়ি নিয়ে এসে হাজির করলে। শীতে আর অবসাদে সবাইকার দেহ-মন এতক্ষণ ঝিমিয়ে পড়েছিল। গরম মুড়ি আর জিলিপি খেয়ে সবাই নতুন করে চাঙা হয়ে উঠ্‌ল!

খাওয়া শেষে হঠাৎ চট্‌পটি বল্লে, এই রে ! মুড়ি দিয়ে পেট ভর্ত্তী করে রাখ্‌লাম—পোলাও-মাংস খাবো কি করে ?

টোনাও তার কথা শুনে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠ্‌ল। কইলে, আমি যে ক্ষিদের চোটে পোলাও মাংসের কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম ! এখন উপায় ?

ফটিক তখন ফোঁড়ন দিলে, আগে ছায়েদ পাঁঠা কিনুক তবে ত' খাওয়া ! যা নমুনা দেখ্‌ছি···শেষ পর্য্যন্ত অজ আজ আমাদের কপালে নেই !

ততক্ষণে সন্ধ্যের আঁধার দিব্যি ঘনিয়ে এসেছে।

ছেলের দল আবার এসে নদীর ধারে হাজির হল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া ওদের কাঁপিয়ে তুল্‌ছিল। চুপ্‌চাপ সবাই পথ চল্‌ছে··· হঠাৎ কানে এলো—ব্যাঁ—অ্যা—অ্যা···!

শব্দ শুনে ছায়েদ একেবারে লাটিমের মতো ঘুরে গেল।

তাইত !

নধর পুরুষ্টু একটি লম্বকর্ণ—একা—একেবারে যাকে বলে দলছাড়া —গোত্রছাড়া।

ছায়েদ ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, চুপ ! যেমন ব্যাটারা সবাই গলা-কাটা দর হাঁক্‌ছিল—তেমনি খোদা আমাদের কথা শুনে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছেন—

টোনা—জিব দিয়ে পড়ন্ত লালাটাকে টেনে নিয়ে কইলে, তুই ঠিক বলেছিস্ ছায়েদ ! ভগবান ছোটদের আন্তরিক ডাক শুন্‌তে পান। ওটাকে নিয়ে চল। আশে-পাশে কেউ কোথায়ও নেই।

রতন ভয় পেয়ে বল্লে, না-রে! কেউ যদি দেখে ফেলে একেবারে কেলেঙ্কারীর সীমা থাক্‌বে না।

ছায়েদ চাপা গলায় ওকে একটা ধমক্ দিয়ে জবাব দিলে, আরে দেখবে কে? বিরাট হাট—কোত্থেকে একটা পাঁঠা দল থেকে ছট্‌কে পড়েছে—এখন হাজার হাজার পাঁটার মধ্যে সেটা খুঁজে বের করা কি সোজা কথা! আর আমরা যে এটাকে কিনি-নি তারই বা প্রমাণ

কি ? হঠাৎ সে টোনাকে বল্লে, ওরে টোনা, শীগ্‌গির একটা কাঁঠাল গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে আয় ত'।

টোনার তখন উৎসাহ অসীম।

ধ'রে নিয়ে আন্‌তে বল্লে, বেঁধে নিয়ে আসে।

সে গোটাকয়েক ডাল পাতাসমেত এনে হাজির কর্‌লে। ছায়েদ তার কোমরে জড়ানো দড়িটা দিয়ে পাঁটাটাকে বেঁধে অবলীলাক্রমে এগিয়ে চল্লো আর টোনা তাকে পরম আদরে কাঁঠাল পাতার লোভ দেখিয়ে সাহায্য করতে লাগ্‌লো।

ব্যাপারটা এমন তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, দলের কেউ আর টু-শব্দ করতে পারলে না।

যাক্‌—অবশেষে মাংসের ব্যবস্থাও তাহলে হল। ফটিক তখন রায় দিলে, ঠিক হয়েছে। ব্যাটাদের লোভের অন্ত নেই—এমন চড়া দর ওরা হাঁক্‌ছে। আমাদের কপালে নেহাৎ রয়েছে পোলাও-মাংস—কে খণ্ডাবে বলো ?

ছায়েদের পেছন পেছন তখন দলের সবাই গিয়ে নৌকোয় উঠে গান জুড়ে দিয়েছে—

"আমাদের যাত্রা হল সুরু ওগো কর্ণধার—
এখন বাতাস উঠুক, তুফান ছুটুক ফিরবো নাকো আর।"

তেরো

গ্রামের শান্ত জীবনকে আবার সচকিত করে তুললো—সরস্বতী পূজো। এই উৎসবে ছোটদের আনন্দ সব চাইতে বেশী।

গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা সারা বছর ধরে দিন গোনে আর আপন মনে ছড়া কাটে :

"কালী ঘুঁটি কালী ঘুঁটি সরস্বতীর পায়
যার দোয়াতের ঘন কালী—
আমার দোয়াতে আয়।"

সেই মা সরস্বতী আসছেন এক বছর পর। ছেলে-মেয়েরা নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়—রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে অঞ্জলি দেবার স্বপ্ন দেখে।

প্রতি বছরই গাঁয়ের সমস্ত ছেলে এক সঙ্গে জুটে একটা আসর বসায়। সেই আসরে পরামর্শদাতা হিসেবে উপস্থিত থাকেন মৃত্যুঞ্জয় বাবু। তখন ঠিক হয় সরস্বতী পূজো কিভাবে করা হবে—কি কি আমোদ-প্রমোদ হবে; কোন কাজের ভার কার ওপর দেয়া হবে–সব কিছু সেই ঘরোয়া বৈঠকে ফর্দ্দ করে ফেলা হয়।

এই পূজোতে চাঁদা তোলা সব চাইতে শক্ত কাজ। গ্রামের প্রতি বাড়িতে ছেলে-বুড়ো সকলকার কাছে দু'আনা, চার আনা করে চাঁদা সংগ্রহ করে পূজোর খরচ চালাতে হবে। অবশ্য অনেকে ছেলে মেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্যে নিজে থেকে ইচ্ছে করে বেশী চাঁদাও দিয়ে থাকেন। সেই খবর যখন ছেলে মহলে পৌঁছয় তখন দাতার নামের জয়-ধ্বনিতে গ্রামের আকাশ বাতাস গম্-গম্ করতে থাকে।

কারো ওপর ভার পড়ল চাঁদা সংগ্রহ করবার, কেউ কেউ দল বেঁধে

ফুল তোলার ভার নিলে; কয়েকজন ছেলে গেট্ সাজাবে, রঙীণ কাগজের শেকল তৈরী করে পূজা-মণ্ডপে লট্‌কে দেবে, কলা গাছ সংগ্রহ করবে কেউ কেউ; ভোগ রাঁধবার জন্যে প্রচুর বাসন দরকার। গাঁয়ের বাড়ী বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে সেগুলি জোগাড় করে আন্‌তে হবে। ভোগ রাঁধবার ভার নিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়বাবুর স্ত্রী। গাঁয়ের মেয়েরা তাঁকে হাতে-হাতে সাহায্য করবে।

অন্যান্য বার সরস্বতী পূজো উপলক্ষে বাইরে থেকে যাত্রাদল ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়। ফটিক, রতন, ছায়েদ এবার মহা উৎসাহিত হয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে প্রস্তাব পেশ করলে যে, তারা নিজেরা যাত্রা করবে। বাইরের লোকের হাতে অতগুলি টাকা গুনে দেবে না।

মজাদার খবর শুনে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মুখের হাঁ-টা বেশ বড় হয়ে গেল। তারপর তিনি হো-হো করে হেসে বল্লেন, আরে, তোরা কি যাত্রা করতে পারবি? ভেবে দেখ সবাই। চটপটি বল্লে, আপনি যদি আমাদের একখানা যাত্রার বই লিখে দেন তবেই আমাদের আর কোনো অসুবিধে নেই।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুব হাস্‌তে লাগলেন। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে জবাব দিলেন, তোদের জন্যে আমায় যাত্রার দলের অধিকারী হতে হবে নাকি রে? তা—কাজটা নেহাৎ মন্দ নয়। শুন্‌তে পাই যাত্রাদলের অধিকারীরা খায় ভালো। সেরা জিনিস, মাছের মুড়ো, দুধটুকু মেরে ক্ষীরটুকু, গরম ভাতে গাওয়া ঘিটুকু—বলেই মৃত্যুঞ্জয়বাবু আবার হো-হো করে ছেলে মানুষের মতো হাস্‌তে লাগলেন।

কিন্তু ছেলেদের দলও নাছোড়-বান্দা। কিছুতেই তারা ওঁকে ছাড়বে না।

অবশেষে তিনি কথা দিলেন যে, ওদের যাত্রা করবার মতো এক ঘণ্টার একখানি বই তিনি লিখে দেবেন, বইখানির নাম হবে—“একলব্য”।

খোস্ খবর শুনে তখন সবাই খুব খুসী!

কে কি ভূমিকায় নাববে তাই নিয়ে আবার জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়ে গেল।

মৃতুঞ্জয়বাবু তাদের থামিয়ে দিয়ে বল্লেন, আগে ত’ বই লেখা হোক—পার্টের কথা পরে হবে। কে অর্জ্জুন, কে একলব্য আর কে দ্রোণাচার্য্য সেটা গুণপনা দেখে ঠিক করা হবে। যে ভালো বল্‌তে পারবে—তার ভালো পার্ট। বেশী চাঁদা দিয়ে কেউ রাজার পার্ট আদায় করতে পারবে না আমার কাছ থেকে।

শুনে কেউ কেউ খুসী হল, আবার কেউ বা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

মৃত্যুঞ্জয় বাবুর যে কথা সেই কাজ।

কে ভাবতে পারবে, যে মানুষটি একদিন স্বদেশের জন্যে জীবন নিয়ে পাশা খেল্‌তে বসেছিলেন, তিনিই ছোটদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে রাত জেগে যাত্রার বই লিখতে বস্‌বেন।

সত্যিই সারা রাত জেগে লেখা চল্লো তার।

তাঁর স্ত্রী রসিকতা করে বল্লেন, আদি কবি বাল্মীকি বুঝি বস্‌লেন ‘রামায়ণ’ রচনা করবার জন্যে? আগে জানা থাকলে কিছু উইয়ের মাটি সংগ্রহ করে রাখা যেতো।

ছেলেরা শুনে ভারী মজা পায়। বলে, জ্যাঠাইমা, এই সব কথা বলে আপনি সব কাজ ভণ্ডুল করে দেবেন। এখন আর অন্য কথা

নয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা, খাবার, পায়েস এই সব এনে হাজির করবেন—একেবারে নীরবে। তাতে ত' লেখায় প্রেরণা আস্‌বে।

জ্যাঠাইমা মুখ টিপে বলেন, রামায়ণ রচনার সময় মহাকবি বাল্মীকিকে কে পায়েস জোগাতো? বুদ্ধদেবকে সুজাতা পরমান্ন খেতে দিয়েছিলেন জানি। কিন্তু আদি কবি হয়েও বাল্মীকির সে সৌভাগ্য হয় নি।

ফটিক ফোঁড়ন দিয়ে বল্লে, রামায়ণ রচনা করে বাল্মীকি যে সুবিধে পান নি—আমরা "একলব্যের" নাট্যকারকে তাঁর চাইতে বেশী সুবিধে দিতে চাই। আর ও ব্যাপারে আপনি যদি সাহায্য না করেন তবে আমাদের 'যাত্রা' একেবারে পণ্ড হবে।

হাস্‌তে হাস্‌তে জ্যাঠাইমা বল্লেন, আচ্ছা, তোমরা যা চাইছ তার কিছু কিছু না হয় মঞ্জুর করা যাবে, কিন্তু আমার কি লাভ হবে? কি মিল্‌বে বলো?

রতন এগিয়ে এসে জবাব দিলে, আমরা যখন 'একলব্য' যাত্রা করবো—তখন আপনি নারী-বাহিনীর সকলকার আগে বসবার অনুমতি পাবেন।

ছায়েদ বল্লে, আর একটি মালা পাবেন ছেলেদের পক্ষ থেকে—নাট্যকারকে প্রেরণা জোগাবার জন্যে।

লেখা থামিয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবু আবার হো-হো করে হেসে ওঠেন।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর উৎসাহের প্রশংসা করতে হবে। জ্যাঠাইমার প্রেরণা জোগানোর জন্যে কিনা বলা যায় না—তবে তিনদিনের মুখে তিনি 'একলব্য' নাটক শেষ করে ছেলেদের হাতে তুলে দিলেন।

এর পর এলো ভূমিকা-বণ্টনের পালা!

মৃত্যুঞ্জয়বাবু একেবারে কড়া বিচারক।

'ড়' এর যায়গায় 'র' অথবা 'চাঁদ' এর স্থানে 'চাদ' বল্‌লে তাঁর কাছে নিষ্কৃতি পাবার যো নেই! ভালো এবং পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ কর্‌তে না পার্‌লে. তিনি পার্ট দেবেন না—সে যতই চাঁদার লোভ দেখাক্ না কেন!

চিরটাকাল পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশে কাটিয়েছেন বলে নানা ভাষার উচ্চারণভঙ্গী তাঁর অতি সুন্দর। প্রতি সন্ধ্যায় তাই তাঁর দাওয়াতেই মহলার আসর বস্‌তে লাগ্‌ল। গাঁয়ে যে এত গুণী লুকিয়েছিল একথা ছেলেরা'ও জান্‌তো না; আর মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ছিল ধারণার অতীত। ফলে কন্‌সার্ট পার্টি আপনা থেকেই এইভাবে গড়ে উঠল। কেউ ভাঙা বাঁশী, কেউ তালিমারা ঢোলক, কেউ ভাঙা খোল, কেউ তার-ছেঁড়া বেহালা নিয়ে এসে হাজির হল। তারপর যে ঐক্যতান বাদন সুরু হল—বুঝি তার তুলনা মেলা শক্ত।

যেমন বাজে বাদ্যি—তেমনি চলে অ্যাক্‌টিং।

জ্যাঠাইমা গরম মুড়ি আর শশার কুচি জোগাতে জোগাতে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলেন। বল্লেন,—কাজ করতে ভয় পাইনে। কিন্তু কন্‌সার্টের শব্দে কানের পোকা বেরিয়ে গেল বাপু!

পুকুর ঘাটে মেয়েরা বলে, আপনার ভারী সুবিধে। আগে থেকেই সব কিছু শুনে আর জেনে নিচ্ছেন।

জ্যাঠাইমা বিরক্ত হয়ে জবাব দেন—সে সুবিধেটে তোমরা বাপু ভাগ করে নাও। আমায় রেহাই দাও। তোমরা গিয়ে সন্ধ্যে থেকে সবাই কন্‌সার্ট শোনো, আর আমাকে তোমাদের বাড়িতে ঠাঁই দাও।

কেন? কেন? কেন?

নানা দিক থেকে এক সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে।

জ্যাঠাইমা বলেন, শুন্‌বে—কেন? সন্ধ্যে থেকে কন্‌সার্ট পার্টির জন্যে কল্‌কে-কল্‌কে তামাক সাজতে হয়। ভদ্রলোকের ছেলেরা এত রাত অবধি গলা ফুলিয়ে বাজাচ্ছে—তাদের না বল্‌তে পারিনে। সবাই প্রায় আমার ছেলের বয়সী। তাই ওদের সুখ-সুবিধেটা দেখতে হবে বৈ কি!

একজন বয়স্কা মহিলা শুধোন, আর কি বায়নাক্কা ওদের শুনি?

—বায়নাক্কা খুব বেশী নয়। মুড়ি, শশা, বাতাসা এই সব জোগাতে হয় মাঝে মাঝে—নইলে অত দম থাক্‌বে কেন? তবে হ্যাঁ;—সব চাইতে বিপদ হচ্ছে সেই কন্‌সার্ট পার্টির সবাই যখন এক সঙ্গে বাজাতে সুরু করে। মনে হয়—ব্রহ্মতালু অবধি শুকিয়ে উঠ্‌ল, আর কানের পোকা যদি কিছু থাকে সব বেরিয়ে এলো!

নতুন শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে—এমন একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু জ্যাঠাইমা কন্‌সার্টই সব নয়। যখন অ্যাক্‌টিং সুরু হয়—ভারী ভালোলাগে কিন্তু। শুন্‌লাম 'একলব্য' পালা হচ্ছে। তা জ্যাঠাইমা 'এক'ই বা কে সাজবে, আর 'লব'ই বা কে হবে?

জ্যাঠাইমা হাসি গোপন করে জবাব দিলেন, সে ভাই অত কথা আমি জানিনে। তেল নুন দিয়ে মুড়ি মাখ্‌বো, না তামাক সাজবো, না 'বক্তিমে' শুন্‌বো? ও যাত্রার পালা যে লিখেছে তাকেই গিয়ে না হয় একদিন জিজ্ঞেস করো।

মেয়েটি বল্লে, যাবো। নিশ্চয়ই যাবো। মেসোমশাইকে সব শুধিয়ে জেনে আস্‌বো। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আবার হ্যাওরদের কাছে

গল্প কর্‌তে হবে ত' যে, আমার বাপের বাড়ী কেমন ধুম করে যাত্রা হয়।

—কেন? তোমার শ্বশুরবাড়ীতে যাত্রা হয় না? জ্যাঠাইমা জিজ্ঞেস করেন মেয়েটিকে।

মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে জবাব দেয়, ম্যাগো! একেবারে পাড়া গাঁ! না আছে ইস্কুল, না পোষ্টাপিস, না যাত্রা-গান। তবে হ্যাঁ, যে দিকে তাকাবেন শুধু ধান ক্ষেত। পৌষ মাসে নবান্নের সময় পাকা ধানে বাড়ীর উঠোন ভর্ত্তি হয়ে যায়।

জ্যাঠাইমা খুসী হয়ে বলেন, তবে ত' মা-লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা। এর চাইতে আনন্দের কথা আর কি আছে? বড় খুসী হলাম মা, তোমার কথা শুনে। আমরা ধান-চাল কিনে খেয়েই ত' অ-লক্ষ্মী হয়ে গেছি।

গ্রামের মাতব্বরেরা যখন শুন্‌লেন যে, মৃত্যুঞ্জয়বাবু যাত্রার বই লিখেছেন, ছেলেরা অভিনয় করছে আর গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা একটি "কন্‌সার্ট পার্টি" গড়ে তুলেছেন—তখন তাঁরা সবাই এসে ধরলেন যে, কালী বাড়ীর বিরাট প্রাঙ্গণে যাত্রার আসরটি বসাতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু রসিকতা করে বল্লেন, আপনাদের প্রস্তাবে আপত্তির কোনো কারণ নেই, কিন্তু জানেন ত' ছেলেরা পোষাকের কোনো ব্যবস্থা করতে পারেনি, আপনাদের চাঁদা দিতে হবে যাতে ওরা পাশের গঞ্জ থেকে পোষাক নিয়ে আস্‌তে পারে।

সেনমশাই উত্তর করলেন, এ ত' অতি উত্তম যুক্তি। আর কেউ না দেয় আমি একাই চাঁদা দেবো। ফলে দেখা গেল সবাই এক কথায় চাঁদা দিতে রাজী হয়ে গেলেন।

ছেলেদের উৎসাহের 'ব্যারোমিটার' তখন আরো কয়েক ধাপ ওপরে উঠে গেল।

সেনমশায়ের বাড়ীতে বহুকালের পুরাণো একটা বড়ো সামিয়ানা আছে। ছেলেরা তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সেটা সবাই মিলে ধরাধরি করে রদ্দুরে মেলে দিলে।

ওদিকে প্রতিমা নির্ম্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। ছেলেদের দৃঢ়পণ তারা এবার নিজেরা মূর্ত্তি তৈরী করবে—কোনো কুমোরের দ্বারস্থ তারা হবে না। সত্যি ওদের বাহাদুরী দিতে হয়। দলের মধ্যে দুটি ছেলে খুব ভালো মূর্ত্তি তৈরী করতে পারে। খেলনা তৈরী করে তারা অবসর সময়ে বিক্রী করে পড়ার খরচ চালায়, তবু কারো কাছে হাত পাতে না। সেই ছেলে দুটি ভার নিয়েছে প্রতিমা তৈরীর। অন্যান্য ছেলেরা এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে আস্‌ছে, ফাই-ফরমাস্‌ খাট্‌ছে, রাংতা জোগাড় করছে প্রতিমাকে সাজাবার জন্যে; কেউ তৈরী করছে বীণাপানির বাহন হাঁস, আবার কেউবা বীণাপানির বীণা তৈরীর কাজে উঠে-পড়ে লেগেছে।

যেখানে প্রতিমা বসানো হবে—তার পেছনে—ইট, কাঠ, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার এক পাহাড় তৈরী করা হচ্ছে। মাথায় ইঞ্জিনিয়ারের বুদ্ধি খেলে এমন ছেলেরও অভাব নেই; ফলে সে টিন বসিয়ে কৌশলে এমন ব্যবস্থা করছে যাতে পাহাড় থেকে ঝরণা নেমে এসে মূর্ত্তির পেছন দিক দিয়ে বয়ে যেতে পারে। সেখানে এমন একটা আলো বসিয়ে দেয়া হবে যাতে বেশ বোঝা যাবে যে, চাঁদের আলো ঝরণার জলে পড়ে চিক্‌ চিক্‌ করছে।

পরিকল্পনারও অন্ত নেই, খাটুনিরও নেই সীমা! ওরা যত

পরিশ্রম করে তত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, আরো ভালো করা চাই। এ অঞ্চলের সবাইকার যেন দেখে তাক্ লেগে যায়!

পূজোর ফলের জন্যে ছেলেদের পয়সা খরচ করতে হয় না। সারা গাঁয়ে এতগুলি ফলের বাগান রয়েছে তবে কিসের জন্যে? তা' ছাড়া বহু কলাগাছ কেটে নিয়ে এসে এমন সুন্দর তোরণদ্বার নির্ম্মাণ করেছে যে, তাদের শিল্প-নৈপুন্যের প্রশংসা করতে হয়। মেয়েরা বসে গেছে যার যার বাড়ীতে রঙীণ কাগজের শেকল তৈরী করবার জন্যে। ছোট ছোট ভাইরা ছুটোছুটি করে জিকা গাছ থেকে আঁটা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দিদিদের মনোস্তুষ্টি করছে।

ছেলেদের মধ্যে কথা হচ্ছে—না খেয়ে অঞ্জলি দিতে হবে; নইলে বিদ্যে হবে না।

ঘণ্টে বল্লে, চট্পটি ত' সেই কবে কুল খেয়ে বসে আছে। ওর অঞ্জলি দিয়ে কি লাভ হবে শুনি?

চট্পটি ফোঁস করে উঠে জবাব দিলে, কেন, কুল খেলে কি হয়? —কী হয়? ঘণ্টের চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হল এমন আশ্চর্য্যজনক কথা সে জীবনে কখনো শোনে নি! ভ্রূ কুঁচ্‌কে বল্লে, কেন, যে কথাটা গাঁয়ের বাচ্চা ছেলে পর্য্যন্ত জানে তুই সে কথা জানিস্ না নাকি? সরস্বতী পূজোর আগে কেউ কুল খায়? যে খায় তার বিদ্যে হয় কাঁচকলা! এই বলে সে দুটো বুড়ো আঙুল উঁচু করে দেখালে!

এই জরুরী ঘোষণার পর চট্পটিকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হল। কেননা-তার পক্ষ টেনে কথা বলে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না!

চট্‌পটির মুখের অবস্থা দেখে রতনের ভারী দয়া হল। তাই সে বল্লে, আচ্ছা, কুল খেয়েছে বলে ওর যে পাপ হয়েছে—না খেয়ে অঞ্জলি দিলে সেটা কাটান যাবে।

শেষ রাত্রিরে উঠে ফল চুরি করবার একটা দল ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে। নষ্টচন্দ্রায় যেমন প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে কলা, শশা, ইত্যাদি না সরালে চলে না, তেমনি সরস্বতী পূজোয় ফুল চুরি করে নিয়ে না এলে পূজো নাকি পুরোপুরি হয় না—এমনি গাঁয়ের ছেলেদের বিশ্বাস।

যাত্রার 'দ্রোণাচার্য্য'—মানে চট্‌পটি হচ্ছে এই দলের পাণ্ডা। সঙ্গে টর্চ্চ, ছুরি, দড়ি, ঝোলা ইত্যাদি যা' যা' রাখতে হবে সে ইতি-মধ্যেই লম্বা ফর্দ্দ করে দিয়েছে। ছেলেরাও তার সেই হুকুম তামিল করেছে অক্ষরে অক্ষরে।

মোক্ষদা মাসির উঠোনে—গাঁদা ফুল ফুটেছে সব চাইতে বড়ো বড়ো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন গোলাপ ফুটে রয়েছে। দু'চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়। ছেলেদের সবাইকার দৃষ্টি ওই দিকে। কে আগে মোক্ষদা মাসির বাড়ীর গাঁদা ফুল নিয়ে এসে বাহাদুরী দেখাতে পারে! আরো সুবিধে যে মোক্ষদা মাসির বাড়ীতে ব্যাটা ছেলে কেউ নেই, জানতে পারলেও ধরা পড়বার ভয় থাকবে না!

সবাই আঁচ করে আছে যে সে সক্কলকার আগে গিয়ে এই বেপরোয়া কাজ করে অন্য সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে।

সেইদিন সন্ধ্যেয় মোক্ষদা মাসির এক বোনপো এসে হাজির। সে পাড়ায় শুনে গেছে যে মাসির গাঁদা ফুলের দিকে সবাইকার দৃষ্টি পড়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর বোনপো মজা করে মাসিকে সে

কাহিনী শোনাতে মাসি ত' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌ল। বল্লে, ও ছোঁড়াদের আমি টিট্‌ করবো। তুই আমায় একটু সাহায্য করবি বাবা?

বোনপো জবাব দিলে, কেন করবো না মাসি? কিন্তু তোমার মতলবটা কি সেইটে আগে বলো।

মাসি ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্লে, দেখ, বাগানে যাবার শুধু একটাই রাস্তা আছে। আমরা মাসি-বোনপোতে যদি প্রকাণ্ড একটা গর্ত্ত খুঁড়ে কলাপাতা আর মাটি চাপা দিয়ে রাখি তবে কেউ টের পাবেনা।

বোনপোর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে, তুমি ঠিক বলেছ মাসি। কোথায় তোমার কোদাল আছে—আমায় দেখিয়ে দেবে চলো। মাসি-বোনপোতে কোদাল আর শাবল দিয়ে গর্ত্ত খুঁড়ে তাতে কলাপাতা আর মাটি চাপা দিয়ে মনের আনন্দে ঘুমিয়ে রইল।

পরদিন সকাল হতে গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, কে যেন মোক্ষদা মাসির ফুল চুরি করতে এসেছিল কিন্তু গর্ত্তে পড়ে ঠ্যাং মচ্‌কে বাড়ী পালিয়ে গেছে! কে যে সে লোক কেউ বল্‌তে পারে না!

সন্ধ্যেবেলা সুরু হল ছেলেদের যাত্রা—'একলব্য।' দ্রোণাচার্য্যের আসরে আসার সঙ্গে সঙ্গে কানাকানি ফিস্‌-ফিস্‌ আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেল।

অর্জ্জুন শুধোলে,

গুরুদেব, আমি তব শ্রেষ্ঠ শিষ্য—
কি হেতু বিমর্ষ তুমি আজ?

দ্রোণাচার্য্য আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিলে—

গিয়াছিনু যমুনার তীরে—আহ্নিকের তরে—

অকস্মাৎ পদচ্যুত হয়ে—পড়িলাম অগাধ

সলিলে—

মোক্ষদা মাসির দুষ্টু বোনপোটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্লে—

নহে যমুনার তীরে—

গিয়াছিলে মাসির আলয়ে-

গাঁদা ফুল চুরি করা—এই ছিল বাসনা তোমার—;
গর্ত্তে পড়ে হল ঠ্যাং খোঁড়া—!

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হৈ-হৈ চীৎকার। ছেলের দল মহা উৎসাহে কুকুর-বেড়ালের ডাক ডাক্‌তে লাগ্‌লো। তার মধ্যে কান পাতে কার সাধ্যি!

চৌদ্দ

সরস্বতী পূজোর আনন্দে ছেলেরা নতুন ক্লাশে প্রমোশন পাওয়ার খুশীকে বেমালুম ভুলে বসেছিল।

এইবার নতুন বই কিনে নয়া-পাঠ স্বুরু করার পালা। যাদের বাবা কিম্বা অভিভাবক নতুন বই সঙ্গে সঙ্গে কিনে দিলেন তাদের উল্লাস দেখে কে! মনে হল—আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। যারা পায়নি সেই সব ছেলে মুখ গোম্‌রা করে ফিরতে লাগ্‌ল। আর মা-বাপের জীবন অতিষ্ঠ করে তুল্‌লো তাগিদের ঠ্যালায়।

নতুন-কেনা-বইয়ের একটি ভারী নেশা আছে।

ছবি, মলাট আর কাগজের এমন সুন্দর গন্ধ যে সব সময় কাছে কাছে রাখ্‌তে ইচ্ছে করে, নাকে গন্ধ শুঁক্‌তে বাসনা জাগে। যাদের বাড়ীর বাপ-খুড়োরা সহর অঞ্চলে যায়—সেই সব বাড়ীতে ক্যালেণ্ডার ঝুল্‌ছে চোখে পড়ে। এই ক্যালেণ্ডারের পুরোনো মাসের পাতা নিয়ে ছেলেদের মধ্যে মারামারি স্বুরু হয়ে যায়। ব্যাপার আর কিছুই নয়, ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলি বেশ মোটা—নতুন বইয়ের মলাট দিলে অনেক দিন থাকে। শহরের মতো এখানে রোজ কাগজ আসে না,

তাই ক্যালেণ্ডারের পাতার ওপর লোভ পড়ে থাকে সক্কলকার। অনেক সময় এমন কাণ্ডও ঘটে যে, মাস শেষ হয়নি, তবু দেয়াল থেকে দু'তিনটি পাতা উধাও হয়ে গেল!

কে নিলে—?—কে নিলে? চারদিক থেকে বড়দের প্রশ্নবানে সবাই জর্জ্জরিত হতে থাকে। শেষকালে দেখা যায় যে, মিণ্টু তার ভূগোলের মলাট দিয়ে বসে আছে; কিম্বা গোবিন্দ তার পাটিগণিতের ওপর আটা দিয়ে দিব্যি লেপ্‌টে দিয়েছে। এই জাতীয় ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

বছরের প্রথম দিকে নতুন বই পড়া যত না হয়—ঘটা হয় তার চাইতে অনেক বেশী। কে ক' খানা নতুন বই কিনেছে, কার বইয়েতে ক'টা ছবি আছে, কার বইয়ের ছাপা ভালো, রঙীণ ছবি কোন বইয়ে বেশী—এইসব আলোচনাই ছেলে মহলে বেশী চলে। অনেকে শ্লেট ভেঙে ফেলেছে, নতুন বই কেনার সময়ে নতুন শ্লেটও চাই। নইলে কান্নাকাটি সুরু করে দেবে! যারা একটু ওপরের ক্লাশে উঠেছে তাদের আবার শ্লেট-পেন্সিলে চলবে না, রুল টানা খাতা আর সেই সঙ্গে চাই পেন্সিল। এই পেন্সিল নিয়ে আবার নানা রকম ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়। সোজাসুজি গোল পেন্সিল কিন্তু ছেলে মহলে বিশেষ আদর পায় না। চারকোণ, আটকোণ পেন্সিল হবে, ঝক্ ঝকে বার্নিশ আর চক্‌চকে রঙ থাক্‌বে—তবে সেগুলি শিশু ও কিশোর মনে আনন্দের সঞ্চার করতে প্বারে। আবার যাদের পেন্সিলের পেছন দিকে খানিকটা রবার লাগানো থাকে—গর্ব্বে তারা ত' ক্লাশের মধ্যে কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বল্‌তেই চাইবে না! কাজেই নতুন ক্লাশে উঠে পড়ার চাইতে সাজ-সরঞ্জামের ঠাট্‌টাই বেশী চোখে ধরা পড়ে।

সেই পোষাকী ভাবটা একটু কাটে যখন পণ্ডিতমশাই শব্দরূপ মুখস্ত করবার জন্যে তাগিদ দেন, কিম্বা অঙ্কের মাষ্টারমশাই পাটিগণিত খুলে বোর্ড পাঠিয়ে দেন।

এই ভাবে আস্তে আস্তে পড়ার চাপে বইয়ের যত্ন কমে আসে। ক্যালেণ্ডারের পাতায় তৈরী মলাট কোথায় যে উড়ে চলে যায় তার আর কোনো হদিশ মেলে না। হঠাৎ একদিন বাবা কি কাকা কাণ ধরে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে ঘণ্টে, ইংরেজী বইয়ের সাম্‌নের চারখানা পাতা একেবারে গুলে খেয়ে বসে আছিস ? সারা বছর পরীক্ষা দিবি কি করে রে হতভাগা ?

ধীরে ধীরে পড়ার তাগিদ আরো জমাট হয়ে আসে, শীত আসে আস্তে আস্তে কমে। পিঠে-পায়েসের পালা আসে ফুরিয়ে,—ছেলেরা হঠাৎ তাকিয়ে দেখে আমের গাছে বোল ধরতে স্নুরু করেছে। সারাদিন ধরে আমের বনে ভোম্‌রার সে কি গুণগুনানি !

ফাল্গুনের শেষে দোল।

কিন্তু তার আগেই গাছের যত পুরোনো শুক্‌নো পাতা যায় ঝরে, পল্লী পথে পাঁপর ভাজার অনাহুত হরির লুট চলে। একদিন সবাই তাকিয়ে দেখে, নব কিশলয় গাছের ডালে-ডালে, শাখায়-শাখায় উঁকি দিয়ে তার সবুজ নিশান উড়িয়ে বসন্তের আগমন ঘোষণা করছে।

এপাড়া থেকে ওপাড়া কোকিলের অবিশ্রান্ত কূজন ধ্বনিত হতে থাকে।

কিন্তু মজা এই যে, মানুষেরা হোলি খেলবার আগেই প্রকৃতি দেবী গ্রামের পথের মুঠি-মুঠি ধূলি নিয়ে আপন খেয়াল-খুশীতে আবির ছড়াতে স্নুরু করে।

গাঁয়ের বিভিন্ন বাড়ীতে বিভিন্ন নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। কোনো বাড়ীতে গোপীনাথ, কোথায় লক্ষ্মী-জনার্দ্দন কোনো বাড়ীতে দামোদর—এক এক বাস্তু-ভিটে আলো করে বসে আছেন। সেখানে নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে।

এই সব বিগ্রহকে কেন্দ্র করে গ্রামে দোল উৎসব সম্পন্ন হয়। পূজো শেষে সব বাড়ার বিগ্রহ মিছিল করে গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানের একটি জায়গায় সমবেত হন। এই মিছিল করে যাওয়াকে বলে 'গস্তে' যাওয়া, আর যে ভিটায় সব বিগ্রহ দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় মিলিত হন—তার নাম হচ্ছে "দোল-ভিটি"।

দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় দোল ভিটিতে যেন আনন্দের প্লাবন ডেকে যায়। কিন্তু দোল-উৎসবের আগে আছে আর একটি পর্ব্ব। তার নাম হচ্ছে "কুঁড়ে-পোড়া" পর্ব্ব। যেখানে যেখানে বিগ্রহকে নিয়ে দোল পূর্ণিমার পূজো হয়—তার আগে সেখানে হয় কুঁড়ে-পোড়ার পর্ব্ব।

খড়, বাখারী ইত্যাদি দিয়ে ছোটো ছোট কুঁড়ে তৈরী করতে হয়, সেই কুঁড়ের ভেতর পুরোহিত ঠাকুর আনুসঙ্গিক পূজো শেষ করেন, শঙ্খ-ঘণ্টা-বাজে—তারপর পুরোহিত ঠাকুর বিগ্রহ নিয়ে বাইরে চলে আস্তে সেই কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। লেলিহান অগ্নিশিখা যত জ্বলে ওঠে—ছেলেরা তত হাততালি দিয়ে লাফাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পট্‌কা ফাটায়।

দোল আস্‌ছে তাই ছেলেরা পট্‌কা তৈরীর কাজে লেগে গেছে।

চট্‌পটিকে ক'দিন থেকে দেখা যাচ্ছে না!

মাকুন্দো একদিন ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্লে, ঘরের দরজা বন্ধ করে কাউকে না জানিয়ে চট্‌পটি চুপি চুপি পট্‌কা তৈরী কর্‌ছে।

কথা হচ্ছিল মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দাওয়াতে বসে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে শুধোলেন, কাজটা কিন্তু মোটেই ভালো নয়। আমরা ঘরপোড়া গরু কি না, সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লেই ভয় পাই।

ফটিক হাততালি দিয়ে বল্লে, বুঝতে পেরেছি, আপনি স্বদেশী করতেন, নিজে হাতে বোমা তৈরী করেছেন, তাই ভয় পাচ্ছেন—পট্‌কা তৈরী করতে গিয়ে ওর আঙুলটা না উড়ে যায়!

মুচকি হেসে মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, আজকের দিনে ছেলেদের আর কিছু বল্‌বার যো' নেই। পেট থেকে পড়েই সব বুঝতে পারে। একেই বলে বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি!

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কথা ভালো করে শেষ হয় নি—এমন সময় ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলো ছায়েদ। বল্লে, আপনারা আসুন, চট্‌পটি এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে!

—কি? কি? মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কণ্ঠে আশঙ্কা ফুটে বেরোলো।

ছায়েদ দাওয়ায় বসে পড়ে বল্লে, চট্‌পটি ঘরের দরজা বন্ধ করে পট্‌কা তৈরী করছিল। আমরা বাইরে থেকে কত ডাকাডাকি কিছুতেই দরজা খুল্‌বে না! রাগ করে বাড়ী চলে যাচ্ছিলাম! হঠাৎ ঘরের ভেতর হল একটা শব্দ! ওর বাপ জান্‌লা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে—বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা উড়ে গেছে!

অ্যাঁ! চীৎকার করে মৃত্যুঞ্জয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, আমি যে ভয় করেছিলাম তাই হল! চল সবাই, এক্ষুণি গিয়ে দেখি—। ব্যাপারটা সাজ্ঘাতিক হবার আগে একটা ব্যাণ্ডেজ ত' বেঁধে দিতে হবে।

ছেলের দল মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পেছন-পেছন চট্‌পটিদের দাওয়ায় এসে হাজির হলো:

কুমোর খুড়ো মোড়ার ওপর বসে ক্রমাগত তামাক টান্‌ছে আর কেবলি বকে যাচ্ছে!—গাঁয়ে ত' আরো অনেক ছেলে রয়েছে। তারা কেমন হেসে খেলে বেড়াচ্ছে; পড়াশুনা শিখ্‌ছে—! তোর মতো ঘরের দরজা বন্ধ করে খুন-খারাপির ব্যবসা কে সুরু করেছে শুনি? দূর হয়ে যা' তুই আমার বাড়ী থেকে। আর আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাই নে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, আহা কুমোর খুড়ো, মুখ না হয় এখন না-ই দেখ্‌লে। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার ছেলেটা বাঁচ্‌লো—না—মরলো। কোথায় সে হতভাগা?

কুমোর খুড়ো মুখ ভার করে উত্তর দিলে, ওই ঘরের ভেতর পড়ে গোঙাচ্ছে, মরুক হতচ্ছাড়া আমি দেখতে চাই নে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছুটে ভেতরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দলও! ছায়েদ এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ওর একেবারে উড়ে গেছে। চারিদিকে পট্‌কা তৈরীর জিনিসপত্তর ছড়ানো। যন্ত্রণায় চট্‌পটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, কিন্তু সবার আগে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া দরকার। ওষুধ আমার কাছে যা' কিছু ছিল—আমি পকেটে করে নিয়ে এসেছি। খানিকটা সাদা ন্যাকড়া যে দরকার। ময়লা হলে চল্‌বে না।

এইবার কুমোরখুড়ো হুঁকোটা রেখে আস্তে আস্তে উঠ্‌ল, তারপর একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া বের করে দিয়ে—একটি কথাও না বলে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টান্‌তে লাগ্‌ল। ছেলের দিকে একবার ফিরেও তাকালো না।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর প্রাথমিক চিকিৎসার গুণে চট্‌পটির হাতের ঘা আস্তে আস্তে সেরে উঠ্‌ল বটে, কিন্তু ছেলেদের শিক্ষা তাতে আদপেই হল না। ওরা আঙুল উড়ে যাওয়ার ভয়াবহতা দেখেও লুকিয়ে লুকিয়ে পট্‌কা তৈরী করতে লাগ্‌লো। দোলের দিনে পট্‌কা ছোঁড়বার এমনি ওদের নেশা!

অবশেষে এসে পড়ল সেই দোলের দিন।

সকাল থেকেই বিভিন্ন বাড়ী থেকে শঙ্খ, ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যেতে লাগ্‌লো। ঘৃতের দীপ উঠল জ্বলে; ধূপ-গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠ্‌ল।

ওদিকে ছেলেরা কখন আবির খেলা সুরু করে দিয়েছে। প্রথমে খেলা হল বাড়ীর ভাই-বোন, ঠাকুর্দ্দা-ঠাকুমাদের সঙ্গে। তারপর সুরু হল—পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ রঙে সবাই বহুরূপী সেজে পাড়াময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ননদে-ভাজে, জায়ে-জায়ে – কাদা গুলে আবীর খেলা চল্‌তে লাগলো।

বিগ্রহের ভোগ রান্না হচ্ছে বৈষ্ণব মতে। নারায়ণকে ত' মাছ-মাংস দিয়ে ভোগ দেওয়া চলে না। তাই রান্না হচ্ছে—খিচুড়ি, শাক, ছোলার ডাল, লাবড়া, ভাজা-ভুজি, ছানার ডাল্‌না, পায়েস মিঠাই-মণ্ডা দৈ, ক্ষীর—এমনি অনেক কিছু।

যারা ভূত সেজে সারাদিন দোল খেলে বেড়াচ্ছে—বাড়ীর কর্ত্তার হুম্‌কিতে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল পুকুরে—রঙ্‌ কাদা আর আল্‌কাতারা সাবান ও তেল দিয়ে ঘসে ঘসে তুলে ফেল্‌তে হবে। বেলা গড়িয়ে যায়—ছেলে-মেয়ের দল আর পুকুর থেকে ওঠে না! ওরা সবাই এক মজা পেয়ে বসেছে!

ওদিকে বিগ্রহের ভোগ হবে—পুরোহিত ঠাকুর ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছেন। ছেলেরা জয়ঢাক, ঘণ্টা, কাঁসর ইত্যাদি বাজাবে—এই চিরকালের প্রথা।

শেষকালে ঠাকুমা-দিদিমার দল যখন লাঠি নিয়ে তেড়ে চলেন—ওরা পুকুর থেকে উঠ্‌তে আর পথ পায় না!

বিগ্রহদের ভোগ পর্ব্ব সমাপ্ত হয়ে গেলে—সুরু হল ভোজ পর্ব্ব।

কলার পাতা বিছিয়ে সবাই সারে সারে বসে গেল। ঠাকুমা-দিদিমারা পরিবেশন করছেন,—পাতে না পড়তেই খিচুড়ি, শাক, ভাজা, তরকারী উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় আগে। তারপর পরমান্ন যখন এলো পেট একেবারে জয়ঢাক।

পরমান্নের ভেতর যে সবরী কলা দেখা গেল—তার স্বাদ নাকি সব চাইতে ভালো। এর জন্যে ছোট ছোট নাতি-নাত্নির দল অনেকদিন আগে থেকেই ঠাকুমার খোসামোদ সুরু করেছে।

ঠাকুমা খুব ছোটদের বেশী বেশী দিয়ে আর সবাইকে প্রসাদ হিসেবে ভাগ করে দিলেন। সোনা মুখ করে সকলে খেতে লাগ্‌লো। ঘরে-ঘরে এই বাল্য ভোজ গাঁয়ের সত্যি দেখ্‌বার জিনিস। সহর অঞ্চলে এতটা আন্তরিকতার সন্ধান মেলে না।

সবাইকার খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে এলো। ওদিকে বাইরের বাড়ীতে তখন বিগ্রহকে ‘গস্তে’ নিয়ে যাবার তোড়-জোড় চলছে। আসাসোঁটা, চামর, ছত্র ইত্যাদি নিয়ে মিছিলকারীর দল একেবারে তৈরী। বিগ্রহ নিয়ে পুরোহিত বেরুবেন—তাঁর মাথার ওপর ছত্র ধারণ করা হবে, দু’পাশে দুল্‌বে চামর—আগে আগে এক-জন গঙ্গাজল ছিটিয়ে পথকে পবিত্র করতে করতে চলবে। পেছনে

ছেলের দল—শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর ইত্যাদি নিয়ে। বাড়ী কর্ত্তারা সবাই চলেছেন মিছিলের সঙ্গে শুধু পায়ে। এইভাবে প্রত্যেক বাড়ী থেকে শোভাযাত্রা বেরিয়ে মিলিত হয়—দোলভিটেয়। সেখানে দোল-উৎসবের সঙ্কীর্ত্তন চল্‌বে—অনেকরাত ধরে।

ছেলেরা কিন্তু দোল ভিটেতে এসেই আবীর আবার খেল্‌তে সুরু করে দিয়েছে। সারা সকাল রঙে লাল হয়ে সারা দুপুর পুকুরে ঝাপ খেয়েছে তবু ওদের খেলা মেটেনি – তাই এবেলাও সুরু হয়েছে নতুন করে আবীর খেলা। অবশ্য এ বেলা কাদা, রঙ, আল্‌কাতরা ইত্যাদি চল্‌বে না, শুধু শুক্‌নো আবীর যে যতো খেল্‌তে পারে।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে আর নীচে ছেলে মেয়েদের ফাগ নিয়ে লুকোচুরি খেলা।

বুড়োর দলও কিন্তু চুপ্‌চাপ বসে নেই ; থেলো হুঁকো টানার ফাঁকে ফাঁকে তাদের চলেছে টাকে আর পাকা দাড়িতে ফাগ মাখানো। কীর্ত্তনীয়া দলও দোহা গাইতে গাইতে লাল হয়ে উঠেছে আবীরে।

রাত যত বেড়ে চলে—কীর্ত্তন তত জমে ওঠে।

বাড়ীর কর্ত্তারা এইবার ছেলেদের পাঠিয়ে দেন বাড়ীতে। নইলে তাদের অসুখ করবে।

ওরা রাত্তিরে মালপোয়া আর ঘন ক্ষীর খেয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুম তাদের চোখের পাতা থেকে ছুটি নিয়েছে।

গভীর রাত পর্য্যন্ত সবাই জেগে থাকে।

তখনো দূর থেকে ভেসে আসে দোল-ভিটের কীর্ত্তনের গানের কলি—

"তমাল শাখে বাঁধা ঝুলনা—
দোল খেলিব আমরা দু'জনা!"

সেই গানের মধুর রেশে কখন তারা ধীরে ধীরে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসির কোলে ঢলে পড়ে—তা' জান্‌তেও পারে না !

পনেরো

শীত বুড়ী এক বছরের মতো ছুটি নিয়ে—তার ছেঁড়া কাঁথা গুটিয়ে বিদায় নিচ্ছে,—এইবার ধীরে ধীরে সূর্য্যের তেজ উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌ছে, মাঠের জল যাচ্ছে শুকিয়ে, শুক্‌নো জমি মাঝে মাঝে ফেটে চৌচির হয়ে রয়েছে।

খালের জল যেখানে শুকিয়ে উঠ্‌ছে—গাঁয়ের জেলের দল সেখানে পেতেছে 'খরা'। কয়েকটি বাঁশের অপূর্ব্ব ক্যারামতিতে গড়ে উঠেছে এই 'খরা', তাতে জাল খাটানো। মাঝে মাঝে জালকে জলে ডুবিয়ে দেয়া হয়—তারপর বাঁশের হাতলে চাপ দিলে জাল ওপরে উঠে আসে আর তার সঙ্গে চোখে পড়ে—চাঁদা, পুঁটি, টাট্‌কিনি, বাটা, পাপ্‌তা প্রভৃতি নানা রকমের রূপোলি মাছ। সূর্য্যের সোনালী আলোতে মাছ গুলি ঝিক্ মিক্ করতে থাকে। এইখানে সকাল থেকে সব পাড়ার ছেলেদের ভীড়। ওরা 'খালৈ' নিয়ে অপেক্ষা করে আছে— কে কোন্ জাতীয় মাছ বাছাই করে নেবে। এই সব ছোট ছোট টাট্‌কা মাছের ভারী স্বাদ।

শেষ রাত্তির থেকে জেলের দল খালের এখানে-সেখানে 'খরা' পেতে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করে। যার বরাৎ ভালো সে প্রচুর মাছ মারে এই খরা দিয়ে। রোজগার ভালোই হয় তাদের। যার জমিতে খাল—ভালো-ভালো বাছাই করা কিছু মাছ তাকে আগে

সেলামী দিয়ে 'দেবতা-তুষ্ট 'রাখ্‌তে হয়। নইলে খরা বসানো চল্‌বে না।

এই খরা থেকে অতি উৎকৃষ্ট মাছ সংগ্রহ করবার জন্যে অনেক সময় ছেলেদের মধ্যে বাজী রাখা হয়। অন্ধকার থাকৃতে—কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি চলে আসে এক-একজন। তাদের কপালে প্রথম ক্ষেপে খুব ভালো মাছ জোটে।

সেদিন কথায় কথায় ছায়েদ আর ফটিক খুব উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল।

ফটিক বল্লে, আমি যদি ইচ্ছে করি রাত্তিরের যে কোনো সময়ে ঘুম থেকে উঠে মাছ নিতে আস্‌তে পারি।

ছায়েদ ভ্রূ কুঁচ্‌কে জবাব দিলে, আমার সঙ্গে আর পারতে হবে না। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্তির হোক—আর ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত হোক—আমার চোখ অন্ধকারে জোনাকীর মতো জ্বলে। কিছুতে আমি পেছ পা নই।

...আর আমিই বুঝি ভয় কাতুরে? ফটিক বুক চিতিয়ে জবাব দেয়। ছায়েদ বল্লে, অত কথা কাটাকাটি করে লাভ কি? একদিন দেখাই যাক্ না—

ফটিক বল্লে, বেশ বাজি রাখো—

ছায়েদ জবাব দিলে, ঠিক। বাজিতে আমি খুব রাজি।

বেশ - যে আগে এসে খরা থেকে মাছ জোগাড় করে নিতে পারবে তাকে অন্য জন দু'সের চমচম্ খাওয়াবে।

বাজি রাখ্‌বার সময় ছেলেদের উৎসাহ একেবারে ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো চড়াৎ করে উঁচু তাপে উঠে যায়।

দিনের আলোতে সকলের সাম্‌নে বাজি রাখা খুবই সোজা। কিন্তু

যখন আঁধার ঘনিয়ে আসে, গভীর রাতে কোন অজানা ঝোপ থেকে কুক্ পাখী ডাকতে সুরু করে, প্রহরে প্রহরে শেয়ালের কান্না শোনা যায়, শ্মশানের দিক থেকে মাঝে মাঝে বিকট আওয়াজ ভেসে আসে—তখন দিনের বেলাকার বাজি অনেক ফিকে হয়ে আসে।

ফটিক সেদিন সন্ধ্যো হতেই ক্ষিদে পেয়েছে বলে তাড়াতাড়ি রাত্তিরের খাওয়াটা শেষ করে নিলে। তারপর পড়ার গরজ দেখিয়ে লেপ-তোষক নিয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে আস্তানা গাড়লে। উদ্দেশ্য, সকাল রাত্তিরে বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর সুবিধে মত নিশুতি রাতে চুপি চুপি উঠে—বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে 'খরার' উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

অমনোযোগের সঙ্গে বই পড়তে পড়তে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে আদবেই টের পায় নি! যখন আচম্কা তার ঘুম ভেঙে গেল—গোটা বাড়ী একেবারে চুপ্চাপ নিঝুম্!

রাত্তির কটা কিছু বোঝবার যো নেই!

এমন ভুলো মন ওর—যে বাইরের ঘরে টাইম্-পিস্টা এনে রাখ্তেও ভুলে গেছে! ফটিক তার ঠাকুমার কাছে শুনেছিল যে, প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে; তাই শুনে আগেকার দিনে লোকে সময় ঠিক করত। সেইজন্যে অনেকক্ষণ সে ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে রইল।

কিন্তু কোথায় শেয়াল? শেয়ালগুলো কি সব নেমন্তন্ন খেতে অন্য গাঁয়ে চলে গেল নাকি? আচ্ছা, আরো খানিকটা চুপচাপ থাকা যাক্।

নাঃ—হু-হু করে সময় কেটে যাচ্ছে, কিন্তু শেয়াল পণ্ডিতদের কোনো সাড়া-শব্দ নেই! হঠাৎ দূরে—অনেক দূরে—শব্দ শোনা গেল—'বলো হরি—হরি বোল!'

নিশ্চয়ই শ্মশানে কেউ মড়া নিয়ে এলো।

রাত্তির বেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে—মানুষ কিম্বা জন্তু-জানোয়ারের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না—তখন কত দূরের কথা শোনা যায়। ভাব্‌তে গেলে ভারী অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু 'বলো হরি, হরি বোল' শুনে ভয় পেলে ত ফটিকের চল্‌বে না, কাল যে সবাইকার সাম্‌নে ছায়েদ—তাকে ভীতু বলে 'দুয়ো' দেবে—সে কিছুতেই তা' সহ্য করবে না! তার চাইতে মরে যাওয়াও ভালো।

মনের অস্থিরতায় ফটিক এ পাশ-ওপাশ করতে লাগ্‌লো।

সে ভাব্‌লে, এই বেলা উঠে পড়াই ভালো। নইলে ছায়েদ কোন ফাঁকে তার আগে গিয়ে হাজির হবে। বাজিতে ত' সে হেরে যাবেই —উপরন্তু নগদ টাকা খরচ করে ওকে দু'সের চম্‌চম্ খাওয়াতে হবে। না-না, লজ্জায় একেবারে মাথা কাটা যাবে ফটিকের।

উত্তেজনায় উত্তপ্ত লেপ ফেলে সে বিছানার ওপর উঠে বসল। বাড়ীর ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না!

রাক্ষসের নিঝুম পুরীর মতো সব যেন পাথর হয়ে গেছে! একটা ছোট ছেলেও ত' কেঁদে উঠ্‌ছে না কোথায়ও!

গরম আলোয়ানটা বালিশের কাছে ভাঁজ করা ছিল। সেইটে ভালো করে গায়ে মাথায় জড়িয়ে নিয়ে পা টিপে-টিপে ফটিক বাইরে এসে দাঁড়ালো। বাইরে থেকে শেকল লাগিয়ে দিল ঘরে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ফাল্গুন মাসের শেষ—কিন্তু বেশ শীত আছে। শীত বুড়ী যেন যেতে-যেতে একবার মরণ কামড় দিয়ে নিচ্ছে!

আকাশের দিকে একবার তাকালো। কৃষ্ণপক্ষ। সারা আকাশ

জুড়ে তারাগুলি ঝিক্ ঝিক্ করছে। যেন দামী নীল মখমলের ওপর কোন অদেখা-স্যাঁকরা রাশি-রাশি সোনার তারা বসিয়ে রেখেছে!

নীরব কবিত্ব করবার সময়ও তার হাতে বেশী নেই। আনা আষ্টেক পয়সা মার কাছ থেকে আগেই চেয়ে রেখেছে। মাছ কিনে নিতে হবে ত জেলেদের কাছ থেকে। নইলে আগে গিয়েও বাজি জেতা যাবে না!

চিরচেনা গ্রাম!

তাই অন্ধকার হলেও পথ চল্‌বার কোনো অসুবিধে নেই।

হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে ফটিক।

রাশি রাশি ঝিঁ ঝিঁ পোকা পল্লী পথের দু'পাশে ঐক্যতান বাজিয়ে চলেছে। জোনাকী সুরু করেছে দীপালী উৎসব।

ফটিক হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু তার কেবলি মনে হচ্ছে যে, আর একটি লোক তার পেছন পেছন আসছে। সে যদি পথের মাঝখানে থম্‌কে দাঁড়ায় তবে পেছনের লোকটিরও পায়ের শব্দ যায় থেমে। কিন্তু হঠাৎ পেছন দিকে ফিরে তাকালে—কেউ কোথায়ও নেই!

একবার মনে হল—ছায়েদই দুষ্টুমী করে তার সঙ্গে এই রকম লুকোচুরি খেলা খেল্‌ছে! কিন্তু ছায়েদই যদি হবে তবে ত' সে ভেল্কি বাজিতে উড়ে যাবে না! পেছন ফিরে একবার না একবার তাকে ধরা যাবেই।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা!

পায়ের শব্দ ঠিকই কানে শোনা যাচ্ছে,—চট্ করে পেছনে তাকালেই মানুষটি হাওয়া।

এইবার ফটিকের কেমন যেন ভয় করতে লাগ্‌লো।

সাম্‌নে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে—যেদিকে তাকায় শুধু রাশি-রাশি অন্ধকার। মানুষ ত' নেই-ই—একটা কুকুর, বেড়াল কিম্বা চামচিকের পর্য্যন্ত টিকি দেখ্‌বার যো নেই!

মনে হল নিজের বুকের ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ শব্দ সে নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে। শীতও যেন তার আরও বেশী মনে হল। আলোয়ানটা বেশ ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ভয় তাড়াবার জন্যে ফটিক চীৎকার করে হেঁড়ে গলায় গান ধরল! কিন্তু যত চীৎকার করে সে গাইবে ভেবেছিল—গলার স্বর ততটা চড়া হচ্ছে না কেন? পেছনকার অদেখা লোকটি তার গলার সুরও চুরি করে নিচ্ছে নাকি?

ফটিকের গলা ওই শীতেও শুকিয়ে উঠ্‌ল। মনে হল তার ভয়ানক জল তেষ্টা পেয়েছে।

শুধু সে মরিয়া হয়ে পথ চলছে!

হঠাৎ সে ওপরের দিকে তাকালো। এখানে অনেকগুলি ঝাঁকড়া গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে অন্ধকারটাকে আরো গাঢ় করে তুলেছে।

ওপরের নক্ষত্রলোক থেকে যে পরিমাণ আলো এসে পৃথিবীতে পৌঁছয়—তাতে দেখা গেল—সাদা থান পরা একটা মেয়েছেলে দুটি ডালে দুই পা রেখে—একটা গাছের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

ফটিক পথের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ অন্য এক দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখের ভুলও ত' হতে পারে!

সমস্ত বিষয়টাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার জন্যে সে আবার সেই গাছের ডালের দিকে তাকালে

কী আশ্চর্য্য ! সেই মেয়েটি একই ভঙ্গীতে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার আঁচলটা একটু একটু উড়ছে বলে মনে হল।

ফটিক চোখ কচ্‌লে নিয়ে আবার দেখ্‌লে।

হঠাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে যেন তার বিদ্যুৎ খেলে গেল।

গত বছর ধোপাদের বৌটা এইখানেই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল না?

মনে হল রাশি রাশি ঝিঁঝিঁ পোকা তার মগজে ঢুকে পড়েছে! ফটিক কিছু ভাব্‌তে পারছে না। তারাদের মৃদু আলোও যেন তার চোখে নিভে আস্‌ছে!

গাছশুদ্ধ মূর্ত্তিটা কি তারই দিকে এগিয়ে আস্‌ছে?

মেয়েছেলেটার মুখে খিল্‌ খিলে বিকট হাসি।

ফটিক জ্ঞান হারিয়ে সেই পথের ওপরই পড়ে গেল।

আরো খানিকক্ষণ বাদে সেই রাস্তা দিয়েই এগিয়ে আস্‌ছিল ছায়েদ। সে মনে মনে ভাব্‌ছিল—খরার কাছে পৌঁছুতে তার বুঝি দেরী হয়ে গেল। তাই সে আরো জোরো পা চালিয়ে দিলে। পা যখন তাড়াতাড়ি চলে তখন মানুষ রাস্তাটা খুব ভালো করে দেখ্‌তে চায় না। মনে হয় আরো এগিয়ে যাই—আরো—আরো—ছায়েদও চরণমাঝিকে মনে মনে চাবুক লাগিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ সে পথের মাঝখানে একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

সে সহজে ভড়কাবার ছেলে নয়।

উঠে গা থেকে ধূলো ঝেড়ে তাকিয়ে দেখ্‌লে, একটা লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে!

কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, কী সর্ব্বনাশ। এ যে ওদের ফটিক!

আশে পাশেই দু একটি মুসলমান গেরস্তর বাড়ী ছিল—ওর চেনা। তাদের ডাকা ডাকি করে জাগালে।

ওরা মাঝ রাত্তিরে ভয় পেয়ে কুপি জ্বালিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। গাঁয়ের ছেলে ফটিক—সবাই তাকে চেনে। ধরাধরি করে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

যার বাড়ীতে ফটিককে তোলা হল—পড়ার সবাই তাকে করিম চাচা বলে ডাকে। করিম চাচা বয়স্ক লোক। সবাই তাকে মানে আর খাতির করে। ফটিকের ঠোঁট ফাঁক করে মুখের ভেতর আঙুল চালিয়ে দিয়ে বল্লে, কী বিপদ! একেবারে দাঁত কপাটি লেগে গেছে যে!

তুক্‌তাক্ জানা আছে করিম চাচার। ছায়েদের দিকে তাকিয়ে বল্লে, ভয় পেয়ে এমন হয়েছে। তা তোমাদের রাত বিরেতে অন্ধকার দিয়ে যাওয়ার কি বাপু? সাপ-কোপেরও ত' ভয় আছে। আমি জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌ছি এক্ষুণি,—কিন্তু ওর বাড়ীতে একবার খবর দেয়া উচিত—

ছায়েদ আঁৎকে উঠে বল্লে, না-না। এত রাত্তিরে আবার বাড়ীর মানুষদের ব্যস্ত করে কি লাভ? আমিই ত' রয়েছি সঙ্গে, তুমি যা হয় ব্যবস্থা করো করিম চাচা—

তক্ষণি বাইরে গিয়ে বাগান থেকে খুঁড়ে কি গাছের শেকড় নিয়ে এলো করিম চাচা। তারপর সেইটে ফটিকের নাকের কাছে ক্রমাগত ঘোরাতে লাগ্‌লো।

মিনিট দশেকের মধ্যে ফটিক চোখ মেলে তাকালো।

প্রথমে ওর কিছুতেই মনে আসে না—কোথায় সে আছে! তারপর ছায়েদের দিকে চোখ পড়তে সব কথা তার স্মরণে এসে গেল।

ফটিক নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লে, বাজি আমি কিছুতেই হারতাম না – কিন্তু ওই ভূ—ত!

—ভূ—ত! আঁৎকে উঠ্‌ল ছায়েদ।

শুধোলে, কোথায় ভুত দেখ্‌লি তুই শুনি?

ইতিমধ্যে করিম চাচা নিজের গোয়াল ঘর থেকে সদ্য দোয়ানো এক বাটী দুধ নিয়ে এসে হাজির। বল্লে, এইটুকু গরম গরম খেয়ে ফেল দেখি। সদ্য বাঁট থেকে এনেছি—দেখছ না এখনো গরম রয়েছে—ফুলে আছে ফানায়। কথাটি কয়ো না; ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেল দেখি—শরীরে বল পাবে।

ফটিকের কোনো আপত্তি টিক্‌লো না। ফ্যানা শুদ্ধ এক বাটি দুধ তাকে ঢক্ ঢক্ করে খেতেই হল শেষ পর্য্যন্ত। বাটি নিয়ে করিম চাচা চলে যেতে ঘর আবার নিরিবিলি হল।

ছায়েদ ওকে ফিস্ ফিস্ করে শুধোলে, হ্যাঁরে ফট্‌কে, ভূত দেখ্‌লি তুই কোথায়? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছিনে!

চোখ দুটি বন্ধ করে ভীতিকাতর কণ্ঠে ফটিক আস্তে আস্তে জবাব দিলে, ভুত নয় রে ছায়েদ—পেত্নী!

—পেত্নী!—ছায়েদ আবার যেন আঁৎকে ওঠে! ভাগ্যিস তোকে একা পেয়ে ঘাড় মটকায় নি।

ফটিক এইবার চোখ মেলে তাকিয়ে বল্লে, সেই সময় 'রাম' নামটা কিছুতেই মনে হল না! নইলে কি আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি?

ওদিকে পূব দিক ফর্সা হয়ে এসেছে।

ছায়েদটা গোঁয়ার গোবিন্দ আছে। বল্লে, কিন্তু আমি তোর পত্নীকে না দেখে কিছুতেই যাচ্ছিনে। যায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে।

ফটিক এইবার অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। জবাব দিলে হ্যাঁ

ভাই, দু'জনে হলে আমি ঠিক যেতে পারবো—চল ত' গিয়ে একবার গাছটা দেখে আসি—

ছায়েদ শুধোলে তুই যেতে পারবি ত ?

ফটিক বল্লে, নিশ্চয়। দু'জনে এসে সেই গাছটার নীচে দাঁড়ালো। কিন্তু কোথায় পেত্নী ? একখানা খবরের কাগজ হাওয়ায় উড়ে গিয়ে উঁচু গাছের ডালের সঙ্গে আট্‌কে আছে,—আর সকাল বেলাকার ফুরফুরে হাওয়ায় দিব্যি আঁচলের মতো উড়ছে !

ষোলো

চৈত মাসে চড়ক পুজোর মেলার ভারী ধূমধাম !

গাজনের সন্ন্যাসীর দল গৈরিক কাপড় পরে ঢাক বাজিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়।

এই চড়কের মেলার আগে অনেক তামাসা, অনেক ধূম।

বহুকাল আগের কথা।

ফটিকের ঠাকুর্দ্দার বাবা স্বপ্ন দেখেছিলেন,—পাট ঠাকুর' বলছেন—ওরে, আমি তোর খিড়কীর পুকুরে ডুবে আছি। অমুক তারিখে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর শেষ রাত্তিরে—আমি ভেসে উঠ্‌বো। তুই সারাদিন শুদ্ধ দেহে-মনে উপবাস করে থাক্‌বি। তারপর তোর পুকুর থেকে আমায় তুলে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করবি। তোর বাড়-বাড়ন্ত হবে।

ফটিকের ঠাকুর্দ্দার বাবা ত্রৈলোক্যবাবু অতি নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। স্বপ্নের কথা ঘুনাক্ষরেও কাউকে জানালেন না, কিন্তু

চতুর্দ্দশীর রাত্রে উপবাসে থেকে সারারাত জেগে রইলেন। শেষ রাত্তিরে উঠে তিনি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরুলেন। মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা দোলায়মান।

আকাশের কোনে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে।

এক পা দু-পা করে তিনি খিড়কীর ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। বিস্ময়ে তাঁর দেহ কাঁপ্তে লাগ্লো।

সত্যি খিড়কীর পুকুরের সিঁড়ির কাছে তেল-সিঁদুর মাখা পাট-ঠাকুর ভাস্ছে!

'জয় শিব শম্ভু' বলে তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মাথায় করে সেই 'পাটঠাকুর' তুলে নিয়ে এসে তিনি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন।

লোকের মুখে-মুখে খবরটা রটে গেল। দলে দলে লোক এলো বিভিন্ন গ্রাম থেকে পাটঠাকুরের দর্শনের আশায়। সেই থেকে এই গ্রামে চড়কের মেলার প্রবর্ত্তন হল।

এখন গাঁয়ে প্রতি বছরই সারাটা চৈত্‌মাস ধরে গাজনের আনন্দ চলে। যে সব ঢাক অনেক দিন ধরে ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখে চৈত্রের খরা রৌদ্রের সঙ্গে তাদের বের করে নিয়ে আসা হয়। ঢাকের বাদ্যিটা যাতে খুব চড়া হয় সেজন্যে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করতে হয়—আর রদ্দুরে দিতে হয় ঢাক।

ভোলা মহেশ্বরের নানরকম কেচ্ছা আর চূড়া কাটা নিয়ে সুরু হয় গাজনের উৎসব।

'পালি জাগান' বলে একটা ব্যাপার আছে।

প্রতি বাড়ীতে পালা করে রাত জাগানো হয়। এই সব পালায়

গাজনের সন্ন্যাসীরা নানারকম মুখোস পরে—শিব নাচ, কালী নাচ বুড়ো-বুড়ির নাচ, রঙ্-তামাসা প্রভৃতির আয়োজন করে।

এই জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান আর রঙ্-তামাসায় পল্লী-কবিদের খুব খাতির বাড়ে। নতুন-নতুন কবিতা লিখ্তে হবে, ছড়া কাট্তে হবে। গাঁয়ের সমাজ-জীবনের কথা, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীর কাহিনী, রস-রসিকতার বিবরণী—সব গাঁয়ের কবিরা মুখে-মুখে তৈরী করে দেয়। ওদের অধিকাংশই লেখাপড়া জানে না নিরক্ষর; কিন্তু তাদের কবিত্বশক্তি আর মিলের বাহাদুরী দেখে বিস্মিত হতে হয়। বুড়ো-বুড়ীর মুখ দিয়ে গ্রামের অনেক ঘটনা কৌশলে বলে দেয়া হয়—যা' শুনে এক দল রেগে টং হয়ে ওঠে,—আবার আর এক দল—হাততালিতে বাহোবা দেয়!

মুখোস পরে কালী নাচ সত্যি দেখ্বার মতো।

ঢাকের তালে-তালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা নেচে চলে এতটুকু পরিশ্রান্ত হয় না, এই আশ্চর্য্য।

মাঝে মাঝে নাচতে নাচ্তে নর্ত্তক ভিরমী খেয়ে পড়ে যায়। ক্রমাগত মাথাটা পাগলের মতো ঘোরাতে থাকে। তখন লোকে বলে মা কালী 'ভর' করেছেন।

গাঁয়ের লোক সেইসময় একেবারে হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে। যার যা জিজ্ঞেস করবার ব্যস্ত হয়ে শুধোতে থাকে। কোন্ বউয়ের ছেলে হয় না—অষুধ চাই, হাঁপানির ব্যামো সারিয়ে দিতে হবে, কে মাম্লা নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে—ফলাফল জান্‌য়ে চায়! সবাই যে জবাব পায় তা নয়। যার উত্তর মিল্‌লো—সে খুশী হল—, যার মিল্‌লো

না সে মুখ কালো করে আর এক বছরের জন্যে অপেক্ষা করে। নিরক্ষর গ্রামবাসীরা এর নাম দিয়েছে—'বায়াল ধরা'।

সাময়িক ভাবে এই সব লোকের কাঁধে যে দেবী এসে 'ভর' করেছেন একথা তারা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে আর 'বায়াল ধরা' লোকের কথা শোন্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে সবাই।

মেয়েরা ছুটে গিয়ে 'বায়াল ধরা' সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো নেয়, কেউ কেউ সিঁদুরের কৌটো ছুঁইয়ে নিয়ে যায় পায়ে—ওদের বিশ্বাস এই সিঁদুর অক্ষয় হয়ে থাকবে, ওরা জীবনে বিধবা হবে না! মেয়েদের এইটেই সব চাইতে বড়ো কামনা।

শিবের নাচ নাচে বিশ্বম্ভর দত্ত। বিরাট ভূঁড়ি নিয়ে সে যে কি করে বহুক্ষণ ধরে এই অসাধ্য সাধন করে সেটা ধারণার অতীত। এই শিব নাচ নাচ্‌বার পর সে যখন গাঁয়ের পথে বেরোয় ছেলের দল তার পিছু নেয় আর হাততালি দিয়ে ছড়া কাটে—

"শিব ঠাকুরের ভূঁড়ি
যেন কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি!
সবার চেপ্টে গেল মুড়ি
নিস্‌নে রে নাম—থুড়ি!"

চড়কের মেলা বসে কালীবাড়ীর নীচেকার মাঠটাতে।

অনেকে আগেকার দিনে পিঠ ফুঁড়ে চড়ক গাছে লোকে ঘুরপাক খেতো। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তবু ঢাকে কাঠি পড়লে চড়ুকের পিঠ সুড়-সুড় করে ওঠে।

মেলাটা সত্যি হয় সুন্দর।

নানা যায়গা থেকে সওদা আসে। হাঁড়ি-কুঁড়ি, ধামা-কুলো, খৈ-মুড়ি থেকে সুরু করে খেল্‌না-কাপড়, গামছা, পুঁতির মালা, বাসনের দোকান, মেঠায়ের ভিয়েন, সুগন্ধী তেল, গাছ-গাছড়া, শেকড়-বাকড় পশু-পাখী, ঢোলক-বাঁশী, বাঁয়া-তব্‌লা, ছুরি-কাঁচি এমন কি ম্যাজিক দেখাবার তাঁবু অবধি আসে!

কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখ্‌বে ? কোনটা ফেলে কোন্‌টা কিন্‌বে ? ছেলেরা যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে যায় !

বানর নাচের খেলা ? সে-ও মিল্‌বে এই মেলাতে।

পাড়ার বিষ্টু বাগ্‌দী পাতার ভেঁপু তৈরী করে হাঁপিয়ে ওঠে। ছেলে-মেয়েরা ভ্যাঁ-পোঁ শব্দে বাজায় আর সারা মেলা ঘুরে বেড়ায়।

গাঁট-কাটারও অভাব নেই— এই মেলাতে !

এই ত' গত বছর একটি আটবছরের মেয়ের হাত থেকে সোনার চুড়ি খুলে নিয়ে সরে পড়বার মতলবে ছিল। ভাগ্যিস্ পাড়ার ছেলেরা দেখ্‌তে পেয়েছিল - তাই ত' লোকটাকে একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেল্লে। ছেলেরা চুড়ি ত' ছিনিয়ে নিলেই, তার ওপর জোট বেঁধে গাঁটকাটার ঘাড়ে-পিঠে হাতের সুখ করে নিলে।

সেই জন্যে এ বছর ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে গোটা মেলাটাকে চষে ফেল্‌ছে—কোথায়ও এতটুকু গোলমাল হতে দেবে না। পানীয় জলের ব্যবস্থা রেখেছে, প্রাথমিক চিকিৎসার আয়োজন আছে, আর আছে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা হারিয়ে গেলে খুঁজে এনে একটা যায়গায় জড়ো করে রাখার ব্যবস্থা, তারপর মা-বাপের কাছে পৌঁছে দেয়া।

অনেক সময় ধর্ম্মের ষাঁড় এসে গুঁতোগুঁতি সুরু করে দেয় মেলার মাঝখানে। তার ফলে হাঁড়ি-কুঁড়ি যায় ভেঙে, খাবারের দোকান যায় ওলট পালট হয়ে—আর বহু লোক পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে ঠ্যাং খোঁড়া করে বসে ! গাঁয়ের জোয়ান-জোয়ান ছেলেরা এই ষাঁড়ের লড়াই হতে দেবে না বলে—মোটা মোটা লাঠি নিয়ে টহল দিয়ে ফিরছে। যখুনি দুটো ষাঁড় গুঁতো-গুঁতি করবার উপক্রম করছে—

তক্ষুনি লাঠির ঘায়ে ওরা তুটোকে তুদিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কিম্বা একটিকে ধরে খোঁয়াড়ে আট্‌কে রাখ্‌ছে।

আগে এই মেলাতে জুয়াখেলারও প্রচলন ছিল। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়বাবুর চেষ্টায় সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

তার বদলে লাঠি খেলার চল হয়ে উঠেছে সুন্দরভাবে। শুধু যে হিন্দুরাই লাঠি খেলার কসরৎ দেখায় তা নয়। .দলে দলে মুসলমান ছেলেরাও আসে কোমরে কাপড় জড়িয়ে। মাথায় থাকে লাল গামছা বাঁধা। হা-রে-রে-রে শব্দে যখন খেলা সুরু হয় তখন সাত গাঁয়ের লোক মজা দেখ্‌বার জন্যে ভেঙে পড়ে।

এই লাঠি খেলাটা হয় মাসের শেষের দিন।

খেলা শেষে ফেনী বাতাসা কিনে জয়ধ্বনি দিতে দিতে সবাই ঘরে ফিরে যায়।

ফটিকদের বাড়ী সেইদিন রাত্তিরে শেষ পালি জাগানো'র উৎসব হয়। গাজনের সন্ন্যাসীদের নেমন্তন্ন থাকে ওদের বাড়ীতে—এই অনেক দিনের প্রথা। গাঁয়ের গিন্নিরা কোমরে আঁচল জড়িয়ে আপনা থেকেই এসে হেঁসেলে ঢোকে। তাদের এই ধারণা যে, গাজনের সন্ন্যাসীদের নিজে হাতে রান্না করে খাওয়ালে পুণ্যি হয় প্রচুর। এই দিনকার উৎসবে কাউকে নেমন্তন্ন করতে হয় না। এসো, 'পালি জাগান' দেখো, কলার পাতা নিজের হাতে বাগান থেকে কেটে নিয়ে পংক্তি ভোজনে বসে যাও। খাওয়া দাওয়ার পর আবার পালি জাগানোর আসরে গিয়ে রাত জাগো, আর না হয় বাড়ী চলে যাও। যেমন তোমার খুশী।

অন্ততঃ একটা রাত্তির মনে করে নিতে হবে—এটা তোমার

বাড়ী-ঘর। সুখ-সুবিধে সব তোমাকেই দেখে নিতে হবে। হেথা নাহি আবাহন—নাহি বিসর্জ্জন।” সবাই আপন—কেউ পর নয়।

ফটিকদের বাড়ীর লোকেরা বলে যে, পাটঠাকুরের দয়ায় তাদের কোনো দিন ডাল-চালের অভাব হয় নি। খিচুড়ী রান্না হচ্ছে হাঁড়িতে হাঁড়িতে! ক্ষেতের তরী তরকারী; সেই থেকে তৈরী হচ্ছে—বেগুন ভাজা, লাবড়া—ইত্যাদি! একটা তেঁতুলের টক—আর মিঠাই। মিঠাইটা সরবরাহ করে গাঁয়ের হালুইকররা—এই চিরকালের প্রথা। কোত্থেকে কি আস্‌বে কেউ আগে জানে না। কিন্তু ঠিক এসে সব জুটে যায়।

বাড়ীর গিন্নি-বান্নিরা বলে, যার ব্যাপার সেই দেখে শুনে নেবে এখন। অন্নপূর্ণা যার ঘরের বৌ—তার কাজ আট্‌কে থাক্‌বে কেন? আমরা ত' উপলক্ষ্য মাত্র।

সত্যি তাই, চিরকাল এই ব্যবস্থায় কাজ চলে আস্‌ছে।

ওদিকে পালা-জাগানোর আসরে বুড়ো বুড়ীর সঙ্‌ খুব জমে উঠেছে। গান হচ্ছে—

“বুড়ী তুই গাঁজার জোগাড় কর্
তোর জামাই এলো দিগম্বর।”

হঠাৎ বুড়ো-বুড়ীর রসিকতাকে ছাপিয়ে দূর থেকে একটা কোলাহল ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো।

প্রাচীনরা বল্লেন, ও কিছু নয়। চরের হাট থেকে সব লোক সওদা নিয়ে ফিরছে—এ তারই গণ্ডগোল।

বুড়ো-বুড়ীর রসিকতা আসরে আবার জমে উঠ্‌ল। সেই আসরের এক কোনে ছেলেরাও বসে ছিল। হঠাৎ রতন বল্লে, এই যে আজ

তোদের সঙ্গে আমার দেখা হল—আবার দেখা হবে ঠিক এক বছর পরে। ফটিক অবাক হয়ে শুধোলে, সে কিরে, তোরা গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথায়ও যাচ্ছিস্ নাকি ?

রতন মিটি-মিটি হাস্‌তে লাগ্‌লো। জবাব দিলে, দূর বোকা! এই কথাটা বুঝ্‌তে পারলি নে! আজ হচ্ছে চৈত্-সংক্রান্তি, বছরের শেষদিন, আর কাল সকালে হবে ১লা বৈশাখ! একেবারে নতুন বছর। ঠিক এক বছর পর তোদের সঙ্গে দেখা হবে না ?

ঘণ্টে, চট্‌পটি, মাকুন্দ, ষষ্ঠি সবাই এক সঙ্গে বলে উঠ্‌ল, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস! কাল আমাদের নববর্ষ! নববর্ষের কথা পালি জাগানোর পাল্লায় আমরা একেবারে ভুলেই গিয়াছিলাম।

ফটিক বল্লে, সত্যি কথা! ভুল্‌লে আমাদের আদপেই চল্‌বে না! প্রতি বছর আমরা নতুন বছরকে আবাহন করে নিয়ে আসি—এবার কি আমরা চুপচাপ তার দিকে পেছন ফিরে বসে থাক্‌বো ?

টোনা বল্লে, সময় ত' আমাদের একেবারে নেই। কি করতে হবে—মোটামুটি একটা ছক্ করে ফেল্‌না।

ফটিক বল্লে, সকাল বেলাতেই নাম-সঙ্কীর্ত্তন বের করতে হবে। ওরে, তোদের সবাইকার 'নববর্ষের' সেই গানটা মনে আছে ত' রে ?

মাকুন্দো বল্লে আমার খাতায় লেখা আছে।

চট্‌পটি রসিকতা করে জবাব দিলে, শুধু খাতায় লেখা থাক্‌লে চল্‌বে না ভাই! মনের মধ্যে নিয়ে আস্‌তে হবে; তারপর আবার তাতে সুর জোগাতে হবে।

ফটিক বল্লে, অত ভাব্‌নার কিছু নেই! গানটা আমার আগাগোড়া

মনে আছে। আমি এক লাইন করে বলে যাবো, আর তোরা সঙ্গে সঙ্গে গাইবি, তা হলেই হবে।

—কিন্তু খোল-করতাল দরকার হবে! এ ত' ভাই গাজন নয় যে, ঢাকের বাড়ি কাজ হাঁসিল করে দেবে। ফোঁড়ন দিলে ষষ্ঠি।

টোনা চোখ নাচিয়ে বল্লে, খোল করতালের জন্যে আটকাবে না। আমার জ্যাঠামশাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় কেৰ্ত্তন করেন। আমি আজ রাত্রেই চেয়ে রাখ্‌বো 'খন। কিন্তু আর আমাদের রাত জাগ্‌লে—শেষ রাত্তিরে ঘুম ভাঙ্‌বে না! এইবার যে যার মতো গিয়ে শুয়ে পড়।

যুক্তিটা খুবই ভালো। তাই ছেলের দল আসর ছেড়ে বাইরে চলে এলো।

রতন আবার চেঁচিয়ে বল্লে, তা হলে এক বছরের মতো সবাইকার কাছে বিদায়!

সে বাড়ীর পথে পা চালিয়ে দিলে।

দূর থেকে বুড়ো-বুড়ীর গান আর লোকের আনন্দ-ধ্বনি ভেসে আস্‌ছিল।

কিন্তু নববর্ষ উৎসবের সাফল্যের জন্যে আজকের রাত জাগা বন্ধ রাখতেই হবে—নইলে সব পণ্ড। অনেক বেলায় সবাইকার ঘুম ভাঙ্‌বে, আর তারই ফলে নাম-সঙ্কীর্ত্তন আর বের করাই হবে না।

ফটিকও তাই তাড়াতাড়ি করে শুয়ে পড়্‌ল।

ওর মা শুধোলেন হ্যাঁরে, কিছু খাবি নে? ফটিক জবাব দিলে, না, মা, বিকেল বেলা যা খিচুড়ী আর লাব্‌ড়া খেয়েছি—পেট

একেবারে জয় ঢাক হয়ে আছে। মা বল্লেন, তা হলে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে শুয়ে পড় গে---

মা ছেলের দিকে সস্নেহে একবার তাকালেন। যা যজ্ঞি-ব্যাপার নিয়ে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন—ছেলেরা ভালো করে খেলো কি না খেলো তাকিয়ে দেখ্‌বার ফুরসৎও তাঁর নেই!

অনেক রাত্তিরে 'পালি জাগান' শেষ হল। তখনও বহু লোকের খাওয়া বাকি ছিল। ফটিকের মা সব কিছু চুকিয়ে যখন বিছানার আশ্রয় নিলেন তখন তাঁর শরীর আর বইছে না কোনো মতেই! পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। কাল আবার ছেলেদের নববর্ষ-উৎসব। ফটিক ভোর বেলা গ্রাম-সঙ্কীর্ত্তনে বেরুবে। ছেলেটা সারা রাত উপোসী রইল। খুব সকালে চিঁড়ে-মুড়ি যা হোক কিছু খাইয়ে দিতে হবে। নইলে যে দুরন্ত ছেলে, কখন ফিরবে তার ঠিক কি! ঘুমের মধ্যেও মাকে চিন্তা করতে হয়। একটা ছেলেকে এই এতটুকু থেকে মানুষ করে গড়ে তোলা কি সহজ কথা?

সমস্ত গ্রামটাই শেষ রাত্তিরে ঝিমিয়ে পড়েছে। কয়েকদিন ধরে তাদের ওপর দিয়ে ধকল বড়ো কম যায় নি।

আজও অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে তারা এখন সবাই পাথরের মূর্ত্তির মতো ঘুমুচ্ছে। ঠেল্‌লেও কেউ সাড়া দেবে না। এত ক্লান্ত তারা।

সেই যে বুড়ো-বুড়ীর গানের সময় দূর থেকে একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছিল—সেটা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো। তারপর মনে হল সেই কোলাহলটা গ্রামের দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে।

সারা তুলসীতলা গ্রামটা যেন রাক্ষসদের যাদুদণ্ডের প্রভাবে পাষাণ-

পুরীর মতো প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে। প্রাণের স্পন্দনও বুঝি গেছে থেমে।

এমনি সময় হাজার হাজার মশাল নিয়ে কারা সব অচেনা লোকের দল গ্রামের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

ওরা সবাই উন্মাদের মতো হিন্দু পাড়ার দিকে ছুটে চলেছে কেন? ওরা পালি-জাগানোর গান শুন্‌বে বলে সবাই দল বেঁধে আস্‌ছে? আস্‌তে ওদের বুঝি দেরী হয়ে গেছে? গিয়ে হয়ত দেখ্‌বে পালা শেষ হয়ে গেছে!

কিন্তু ওদের রকম-সকম দেখে সে রকম ত' কিছুই মনে হচ্ছে না। পালি জাগানোর আসরে গেলে সবাই মারমুখো হয়ে পাগলের মতো ছুট্‌বে কেন? আর সবাই মিলে এত চীৎকারই বা করবে কেন? ওকি! ওরা হিন্দুপাড়ায় ঢুকেই মশাল দিয়ে প্রত্যেক ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে! ঘর থেকে জিনিস-পত্র টেনে বের করে লুট করছে। আগুনের তাপে যারা প্রাণের ভয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আস্‌ছে তাদের লাঠি মেরে আর ছোরা বসিয়ে জহ্লাদের মতো মেরে ফেল্‌ছে। যে গাঁয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের এত প্রীতির সম্পর্ক···একের বিপদে আর একজন এসে বুক পেতে দাঁড়ায়, একের সুখের দিনে আর একজন এসে আনন্দের ভাগ বসায়, সেখানে বাইরে থেকে এরা কারা এসে একদিনে সব কিছু তচ্‌নচ্‌ আর ওলট পালট করে দিচ্ছে! ওদের এত রাগই বা কেন? এ গাঁয়ের লোক ত' ওরা কেউ নয়; তবু এখানকার শান্তি ওদের দু' চক্ষের বালাই কেন? ওদের সঙ্গে গাঁয়ের কারো কি ঝগড়া বিবাদ আছে? ব্যাপার দেখে ত' তাও মনে হয় না। ওরা যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ছে,—যে কোনো বাড়ীতে

আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে, যাকে-খুশী-তাকে আঘাত করছে! পৃথিবীর লোকগুলো কি সব এক সঙ্গে ক্ষেপে গেল নাকি!

ফটিক স্বপ্ন দেখ্‌ছিল—তারা সবাই মিলে নববর্ষের মিছিল বের করেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যতবার সে মিছিলের সঙ্গে পা চালিয়ে চল্‌তে যাচ্ছে—তার হাত থেকে নিশান খসে পড়ে যাচ্ছে! কি রকম যে তখন মনের অবস্থা—ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না! প্রত্যেকবারই সে ভাবছে, এইবার এমন শক্ত মুঠিতে সে নিশান ধরবে যে কিছুতেই খুলে পড়বার যো থাক্‌বে না!

কিন্তু অবাক কাণ্ড!

তু' পা চল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাত থেকে খসে পড়ছে—শক্ত করে ধরা সেই নিশান।

পাশ থেকে রতন তাকে ঠ্যালা দিয়ে যেন বল্লে, তোর কি হয়েছে রে ফটিক? নিজের নিশানটা ভালো করে ধরতে পারিস নে? কাল রাত্তিরে বুঝি ঘুমোস নি? এই বলে সে আরো একটা ঠ্যালা দিলে ফটিককে—

—আচম্‌কা ওর ঘুম ভেঙে গেল। শিয়রে কাছে কিসের একটা চাপা গোঙানি শোনা যাচ্ছে। সে এখনো স্বপ্ন দেখছে,—না জেগে উঠেছে ভালো করে ঠাহর করতে পারছে না যেন।

একি। অনেকগুলো কালো কালো যণ্ডা লোক—তাদের শোবার ঘরের মধ্যে এসে ঢুক্‌লো কি করে? তাদের মুখে মুখোস লাগানো।

তবে কি সে এখনো আসরে বসে 'পালি জাগান' দেখছে? বুড়ো-বুড়ীর নাচের পর এই সব যণ্ডাদের নৃত্য সুরু হয়েছে? এই রকম বিতিকিচ্ছি লোক সে এর আগে গাঁয়ে কখনো দেখেনি। প্রত্যেকের

হাতে একটি করে লাঠি কিম্বা ছোরা। যারা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে জান্‌লায় জান্‌লায় পাহারা দিচ্ছে—তাদের হাতে আবার বন্দুকও রয়েছে।

শিয়রের কাছে আবার সেই গোঙানিটা শুনে চোখ ফেরাতেই তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন ছলাৎ করে মাথায় গিয়ে উঠ্‌ল? তার মাকে দুটো গুণ্ডা ধরে রয়েছে—একটা লোক চাদর দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেলেছে। আর গুণ্ডা দুটো নির্ম্মমভাবে তার মার গা থেকে গয়না খুলে নিচ্ছে। ফটিকের শিয়রের কাছে ছিল একটা রাম-দা, বেড়ার সঙ্গে ঝোলানো থাক্‌তো চিরকাল। ফটিক এক লাফে উঠে সেই রাম-দাটা টেনে নিয়ে একটা গুণ্ডার পায়ে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করলে।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কে যেন তার মাথায় লাঠি বসিয়ে দিলে। ফটিক সেইখানে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল!

সতেরো

ফটিক স্বপ্ন দেখ্‌ছে—

সে কেবলি জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নেবার যত চেষ্টা সে করছে—মনে হচ্ছে তার দম বন্ধ হয়ে এলো! সে ত' খুব ভালো সাঁতার কাট্‌তে জানে—তবু জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে কেন সে কথা কিছুতেই তার মগজে ঢুক্‌ছে না। ক্রমাগত সে হাত পা ছুঁড়ছে, দেহ তার অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে। তবু সে জল কাটিয়ে, ঠেলে ওপরে উঠ্‌তে পারছে না। এ রকমভাবে আর কতক্ষণ সে যুঝ্‌তে পারবে?

এই মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার মনে হল কর্ণের কথা। ঠাকুমার কাছে কর্ণের কাহিনী সে শুনেছে। মৃত্যুকালে পরশুরামের শেখানো যত অস্ত্রের কথা সে ভুলে গিয়েছিল। কিছুতেই তার মনে আসেনি একটা তীরের নাম। ফটিকেরও কি আজ সেই অবস্থা হল? কতদিন বাজি রেখে সে সেনেদের পুকুর এপার-ওপার হয়েছে···কিন্তু আজ তার এ অবস্থা কেন? মনে হচ্ছে পৃথিবীর যত জল—আজ চাপ বেঁধে তাকে অতল তলে তলিয়ে দিচ্ছে—!

হঠাৎ দেখ্‌লে একটা শুক্‌নো ডাল ভেসে যাচ্ছে। সে দু' হাত দিয়ে সেই ডালটাকে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরল।

মাথায় অসহ্য ব্যথা!

ফটিক মাথাটাকে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে নিতে বুঝতে পারলে—কে যেন তার মাথার উপর একটা জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছে! খানিকক্ষণ সে চোখ বুঁজে চুপচাপ পড়ে রইল। তাকে ভালো করে বুঝ্‌তে হবে যে, সে এখনো স্বপ্ন দেখ্‌ছে, না—আবার বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে!

মাথার ওপর কেউ তা হলে পাথর চাপিয়ে দেয় নি!

সেই ষণ্ডাগোছের লোকগুলো···

তার মায়ের গা থেকে গয়না কেড়ে নেয়া···

রাম-দা দিয়ে পায়ে আঘাত···

তারপর মাথায় পড়ল লাঠি···

সব একে একে ছায়া-ছবির মতো তার মগজের ভেতর দিয়ে ভেসে যেতে লাগ্‌লো।

তবু চোখ মেলে চেয়ে আসল ব্যাপারটা দেখ্‌বার মতো মনের বল সে নিজের ভেতর খুঁজে পেলে না !

গুণ্ডাগুলো কি এখনো আছে—না, তাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে ?

কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না ত' !

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা ভৌতিক ঘটনার মতো আকস্মিক ঘটে গেল !

তবু ভয়ে ভয়ে সে চোখ খুলে চাইলে ।

সকলের আগে যা দেখে সে আঁৎকে উঠ্‌ল—তা হচ্ছে ওর বাবার মৃতদেহ ।

মাথাটা দেহ থেকে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে—আর রক্তে সারা মেঝে ভেসে যাচ্ছে !

এই রকম বীভৎস দৃশ্য দেখবার অভিশাপ কটা ছেলের অদৃষ্টে ঘটে ? চীৎকার করে উঠ্‌তে গেল ফটিক ।

কিন্তু মনে হল—গলা থেকে কোনো শব্দই বেরুচ্ছে না !

যেন তার কণ্ঠে কেউ গরম সীসে ঢেলে দিয়েছে ।

ভারী মাথাটাকে প্রাণপণে তোল্‌বার চেষ্টা করলে সে । কপালের শিরাগুলো দপ্‌ দপ্‌ করছে ।

কিন্তু হতাশ হয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না ।

গুণ্ডাগুলো তার মায়ের মুখ বেঁধে গয়না কেড়ে নিচ্ছিল । সেই দৃশ্য তার চোখের ওপর ভাস্‌ছে । মাকে না দেখ্‌লে সে মনে এতটুকু স্বস্তি পাবে না ।

যখন তার জ্ঞান ছিল না—মাথার দারুণ ব্যথায় অজ্ঞান অবস্থায়

সে স্বপ্ন দেখ্ছিল অতল তলে সে তলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে করেই হোক—তার হুঁস যখন হয়েছে—সকলের আগে দেখ্তে হবে—তার মায়ের কি গতি হল।

দু' হাতে ভর দিয়ে একটা প্রবল ঝট্কা মেরে ফটিক মাথাটাকে ভালো করে তুলে ধরল। আবার তার বাবার সেই মাথাটা।

প্রবল ধাক্কা লাগে তার মনে।

সে ছেলে, কিন্তু বাপকে এই জানোয়ারদের হাত থেকে বাঁচাতে পারল না। নিজের হাত তার নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। তবে কি লাভ হল তার লাঠি খেলা শিখে? কি শিক্ষা হল তার মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছ থেকে মানুষ হবার কথা শুনে?

খাটের পায়ার ওপর দেহের ভার রেখে সে উঠে দাঁড়াল। ওই ত' তার মা দরজার কাছে পড়ে আছেন। ছুটে গেল সে মায়ের কাছে। মুখে আগের মতোই কাপড় বাঁধা আছে। গায়ে একটি গহনাও নেই। গুণ্ডার দল সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে গেছে।

তা নিক্!

কিন্তু তার মা প্রাণে বেঁচে আছে ত'?

ক্ষিপ্র হাতে ফটিক তার মায়ের মুখ থেকে কাপড়ের বাঁধনটা খুলে ফেলে দিল। মুখ দিয়ে ফ্যানা বেরুচ্ছে কেন?

তবে কি শয়তানরা তার মাকে মেরে ফেলে রেখে গেছে? ফটিক চরম আশঙ্কা নিয়ে তার মায়ের নাকের কাছে আঙুল ধরলে। নিঃশ্বাস পড়ছে—কি পড়ছে না—ঠাহর করা শক্ত।

ফটিকের মনে হল, তার নিজের মনের বল হারিয়ে ফেল্লে সে মাকেও হারাবে। তাই তাড়াতাড়ি দেহটাকে ঘরের এক কোণে ঠেলে

নিয়ে জলের কলসীটা হাত দিয়ে টান্‌তে টান্‌তে মায়ের কাছে এসে হাজির হল। তারপর ডান হাত দিয়ে ক্রমাগত তাঁর মুখে-চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌ল।

চোখ দুটো কিন্তু তার স্থির হয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে। যদি একটু নড়ে ওঠে,—কিম্বা চোখের একটু পলক পড়ে।

আরো জল,—আরো জল। মায়ের মুখ-চোখ-বুক ভেসে জল মেঝেতে গড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো, তবু ফটিক থাম্‌লো না।

যত জল ফটিক ঢাল্‌ছে—তত জল তার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ওর নিজের চোখের জলও কি মায়ের জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে না?

হঠাৎ ফটিকের মনে হল—মায়ের চোখের পাতাটা একটু নড়ে উঠ্‌ল।

সে বুক ফাটা চীৎকার করে উঠ্‌ল, মা—মা—মা—

মায়ের কানে সন্তানের সে ডাক গিয়ে বুঝি পৌঁছলো। ধীরে ধীরে মা চোখ মেলে তাকালেন।

কিন্তু কোথায় আছেন মা? কেন তিনি মাটিতে শুয়ে? ফটিকই বা কেন তাকে সজল চক্ষে, ব্যাকুল কণ্ঠে এমনভাবে ডাক্‌ছে? মা বুঝতে পারছেন না—তার সংসারে কি ওলট-পালট হয়ে গেছে! চেতনার রাজ্যে পা বাড়াবার মুখে মা আবার চোখ দুটি বন্ধ করলেন। মাথাটা আবার বেঁকে পড়ল ঘাড়ের দিকে। মেঝের জলে চুলগুলি একেবারে ভিজে উঠেছে। মায়ের সারা মুখে যেন এক দোয়াত কালী ঢেলে দিয়েছে।

মা—মাগো—বলে ফটিক আবার ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল। সেই

সঙ্গে শোনা গেল দূরে, গুণ্ডাদের পৈশাচিক চীৎকার—জানালা দিয়ে দেখা গেল—আগুনের হল্‌কা।

ফটিক বুঝ্‌তে পারলে, ডাকাতরা যাবার সময় তাদের বাইরের বৈঠকখানা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে। এখন হয়ত অন্য কোনো দূর প্রতিবেশীর বাড়ী আক্রমণ করেছে। ওরা যদি বেশীক্ষণ এখানে এইভাবে বসে থাকে, তবে শোবার ঘরে আগুন লাগ্‌তেও খুব বেশী বিলম্ব হবে না। তার মা হয়ত এখনো বেঁচে আছেন; কিন্তু আগুনের লেলিহান-শিখা এসে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লে তাঁর জ্ঞান ফিরে আস্‌বার আর কোনো উপায়ই থাক্‌বে না।

তাই শেষ চেষ্টার মতো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ফটিক কান্না-ভেজা কণ্ঠে ডাক্‌লে, মাগো, ওঠো—

এইবার মা পুরো চোখ খুলে ওর মুখের দিকে তাকালেন। ফটিকের মগজের মধ্যে যেন শ্রাবণ-আকাশের বিদ্যুৎ এসে চমক্ দিলে।

তা হলে তার মা সত্যি বেঁচে আছেন! দু' হাতে সে মাকে আবার জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগ্‌লো।

মার মনে বুঝি সব কথা ফিরে আস্‌ছে—অতর্কিতে গুণ্ডাদের সেই নৃশংস আক্রমণ···সেকি সত্যি না অশুভ-স্বপন? না না স্বপন হবে কেন? স্বপন হলে কি বুকের ওপর পড়ে তার দস্যি ছেলে ফটিক অমন করে আছড়ে কাঁদে?

মা ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন।

ফটিক তাকে ঠেলা দিয়ে বল্লে, মাগো, তুমি, অমন করে চুপ করে চেয়ে থেকো না! ঘরের ভেতর আগুনের হল্‌কা ঢুক্‌ছে—আমার

কাঁধে ভর দিয়ে তুমি উঠে দাঁড়াও। চলো, তোমায় নিয়ে পালিয়ে যাই—অনেক দূরে—

মা আকুল ভাবে চারদিকে তাকালেন!

কথার কোনো জবাব দিতে পারলেন না বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাব্লেন—তাঁর সেই সাজানো সংসার ফেলে চলে যেতে হবে? কোথায়? কেন?

হঠাৎ ফটিকের বাবার মুণ্ডটা চোখে পড়তেই আছাড় খেয়ে খাটের ওপর পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতের শাখাটা গেল ভেঙে!

কিন্তু ফটিককে অত সহজে নিরাশ হলে চল্বে না।

মায়ের জ্ঞান যখন ফিরে এসেছে তখন আর যাতে তাঁর চেতনা লুপ্ত না হয়—সেই উদ্দেশ্যে ডেকে ডেকে তাকে টেনে তুল্তে হবে। বাবাকে ত' সে হারিয়েইছে—মাকেও আগুনের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়ে সে কি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালিয়ে যাবে?

কাঁধের নীচে নিজের ডান হাত গলিয়ে দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় ফটিক মাকে আবার বসিয়ে দিলে।

না—জ্ঞান হারান নি মা। মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন।

সন্তানের স্নেহেই বোধ করি মায়ের বুকে আবার বল ফিরে এলো। মা পাগলের মতো ফটিককে এইবার নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

ধরা গলায় ফটিক বল্লে, মাগো, আর দেরী করবার সময় নেই। আমায় যদি বাঁচাতে চাও—শীগ্গির ওঠো,—আগুনে যে জানালা পুড়তে সুরু করেছে!

ছেলের মুখের এই কথায় কাজ হল।

অতি চরম বিপদেও মা সন্তানের জন্যে সব কিছু করতে পারেন। হয়ত সেই সন্তানকে নিরাপদে কোনো যায়গায় নিয়ে যাবার স্বাভাবিক-আকর্ষণেই মন্ত্রমুগ্ধার মতো মা উঠে বস্‌লেন।

মাকে বাঁচাবার এই শেষ সুযোগ ফটিক কোনো মতেই ব্যর্থ হতে দিতে পারে না। নিজের শরীরে যতখানি শক্তি আছে সব এক সঙ্গে জড় করে সে মাকে জড়িয়ে ধরল; তারপর পাছে মা অন্যদিকে তাকিয়ে হত্যালীলা আবার প্রত্যক্ষ করে তাই সরাসরি খোলা দরজা দিয়ে তাঁকে একেবারে বাইরে নিয়ে এলো।

কিন্তু ফটিকের দৃষ্টি রয়েছে একেবারে সজাগ।

তখনো কাল রাত্রি প্রভাত হয় নি।

ধ্বংস ও হত্যার অশুভ ডানা অমা-রজনী তখনো গুটিয়ে ফেলে নি। নিশা আর ঊষার সন্ধিক্ষণে ফটিক মায়ের হাত ধরে উঠোনে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ উঠোনের বাঁ দিকে চোখ পড়তে ফটিক শিউরে উঠ্‌ল। ওখানে পড়ে রয়েছে তার কাকাদের মৃতদেহ। কারোর হাত কাটা গেছে, কারো মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেছে, আবার কারো বা লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে রক্ত গঙ্গা বয়ে গেছে! কিন্তু কেউ বেঁচে নেই। হীম, অসার—শক্ত হয়ে গেছে মৃতদেহ গুলি। ওদের দেখ্‌তে পেয়ে গাছের ডালে বসা কতকগুলি কাক কা-কা শব্দে উড়ে পালিয়ে গেল!

মায়ের কিন্তু এ সবের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই। তার চোখ ছুটি বুঝি পাথরের হয়ে গেছে! ফটিককে ছু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মা কেবলি বল্‌ছেন, পালিয়ে আয় ফট্‌কে,—আমার সঙ্গে পালিয়ে আয়

—নইলে তোকেও ওরা মেরে ফেল্‌বে। এখানে আর এক মুহূর্ত্তও তুই থাকিস নি—

ফটিকও তাই চায়। তার ইচ্ছে নয় যে, এই সব বীভৎস দৃশ্য মায়ের চোখে পড়ুক। তা হলে মা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। একটা মানুষ যে সারা জীবন তার স্নেহ দিয়ে একটি সংসারকে আগ্‌লে রেখেছিল—একই রাত্রে কত আঘাত সে সইতে পারে? মানুষের মন কি পাথর দিয়ে গড়া? ভেঙে কি সে পড়বে না?

তবু মাকে নিয়ে এগুতে গিয়ে কুয়োর ধারে ফটিকের চোখ পড়ল। সেইখানে ঠাকুমার দেহটা পড়ে আছে। একটা শেয়াল আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করছিল; ওদের দেখ্‌তে পেয়ে ঝোপের আড়ালে পালিয়ে গেল। রোজ শেষ রাত্তিরে ঠাকুমা কুয়োর জল নিজে হাতে তুলে নিয়ে আহ্নিক করেন। আজও বুঝি সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে এসেছিলেন। গুণ্ডারা এই মৃত্যুপথের বুড়ীকেও রেহাই দেয়নি!

ফটিক মাকে আরো শক্ত করে ধরে সদরের দিকে পা চালিয়ে দিলে।

কিন্তু একি!

সদর দরজা ধরে তার পাঁচ বছরের বোন খুকু হাপুস নয়নে কাঁদছে! মাকে দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, মা গো, ওই কালো কালো লোকগুলো আমার সব গয়না কেড়ে নিয়ে গেছে। তুমি ওদের বকে দিলে না?

কিন্তু মায়ের সেই পাথরের চোখের দৃষ্টি! খুকুকে কাছে টেনে নেবার এতটুকু আগ্রহ মা দেখালেন না!

ফটিক তখন খুকুকে কোলে তুলে নিয়ে বল্লে, চল খুকু, আমাদের সঙ্গে চল—

খুকু এইবার দাদাকে দেখে অনেকটা ভরসা পেল। উৎসাহিত হয়ে শুধোলে, তুমি বুঝি ওই দুষ্টু লোকগুলোকে বক্‌তে যাচ্ছ দাদা ?

সংক্ষেপে ফটিক জবাব দিলে, হ্যাঁ।

খুকু জিজ্ঞেস করলে, তা হলে আমার চুড়ি, হার, কানের দুল সব ওরা ফিরিয়ে দেবে ত ?

নিজের কাঁধের ওপর ওর মাথাটাকে নেতিয়ে দিয়ে ফটিক আস্তে আস্তে জবাব দিলে, দেবে রে, দেবে।

অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে খুকি। এইবার চুপ করে গেল। তবু ওর মনের সমস্ত ব্যথা মাঝে মাঝে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

ফটিক মাকে নিয়ে পথ চল্‌ছে।

চল্‌তে চল্‌তে দু'পাশে যা চোখে পড়ল—তাতে বেশ বোঝা গেল যে কাল শেষ রাত্তিরে গোটা গাঁয়ের ওপর দিয়ে যেন প্রলয় হয়ে গেছে। অধিকাংশ বাড়ীগুলি পুড়ে ছাই হয়েছে। বাড়ীর মানুষ গুলির দেহ বিকৃতভাবে এখানে-ওখানে পড়ে আছে। বাসন-কোসন আসবাবপত্র বেশীর ভাগ হয়ত লুট করে নিয়ে গেছে। যা ওরা নিতে পারে নি তা' চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মানুষকে সকল দিক দিয়ে সর্ব্বহারা করবার এই ধ্বংসের যজ্ঞ কোত্থেকে সুরু হয়েছে আর কোথায় এর শেষ—ফটিকের মতো ছেলে কি করে বুঝ্‌বে ?

সে শুধু পাগলের মতো পথ চল্‌ছে !

সব কিছু ভাববার যায়গা তার অতটুকু মগজে খুঁজে পাওয়া যাবে

কি করো ? ফটিক তাই সব কিছু ভাবনাকে ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চল্লো।

কিন্তু ও কিসের গোলমাল ?

সেই গুণ্ডার দল কি এখনো গ্রাম ছেড়ে চলে যায় নি ? তাদের হত্যা আর অগ্নিদাহের সর্ব্বনেশে উৎসব কি এখনো শেষ হয় নি ?

ফটিক মাঝ পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

ওর মায়ের কানে কিন্তু কোলাহলের শব্দ কিছু পৌছয় নি।

মা বল্লেন, আবার থামছিস্ কেন ? চল, চল, পালাই চল—নইলে তোকেও আমার কোল থেকে কেড়ে নেবে—

ফটিক কানটা খাড়া করে বল্লে, কিসের গোলমাল শোনা যাচ্ছে না ? মা কিছু না শুনেই জবাব দিলে, ও কিছু নয়—রে—; পালাই চল—

হঠাৎ তাদের উল্টো দিক থেকে একটা লোক ছুটে আসছে দেখা গেল।

কী সর্ব্বনাশ ! বিপদের কিছু নাকি ?

মা ভাবছে, ছেলেকে বাঁচাতে হবে,—আর ছেলে ভাবছে নিজের প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা করতে হবে।

এমন সময়ে দেখা গেল যে, আগন্তুক আর কেউ নয়,—ছায়েদ। সে বল্লে, আমি তোদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম ফটিক। শয়তানরা এখনো গাঁ আগলে রয়েছে। চল শীগ্‌গির আমার সঙ্গে। মাসিমা, পা চালিয়ে আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাদের লুকিয়ে রাখ্‌বো—কাক, পক্ষীও জান্‌তে পারবে না।

আঠারো

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মা চলে এলো ফটিকের পেছন পেছন। সারারাত ঠাণ্ডার মধ্যে কেঁদেছে খুকুটা।

সে কখন ফটিকের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার চোখের জলের দাগ গালের উপর চিক্-চিক্ করছে।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। যে ছায়েদের সঙ্গে চিরটা কাল উঠেছে—বসেছে—এক সঙ্গে খেলা করেছে, খাবার নিয়ে কপট অভিমান জানিয়েছে- সে যেন এক রাত্তিরের ভেতর এত দূরে চলে গেছে—যে তার আর নাগাল পাওয়া যায় না!

ছায়েদ তার বাড়ীর পেছন দিককার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঢুক্ল—সাম্নের রাস্তাটা মাড়ালো না। আপন মনেই বিড় বিড় করে বল্লে, ওখানে ব্যাটাদের কেউ কেউ হয়ত হুঁকো টান্ছে; তুই আমার সঙ্গে এই দিক দিয়ে আয় ফটিক—

ফটিকের মুখে কোন বাক্যি নেই! তবু এই ছায়েদকে আশ্রয় করেই হয়ত সে তার মায়ের প্রাণ আর মান বাঁচাতে পারবে—নিজেও রক্ষা পাবে।

ধীরে ধীরে ছায়েদ ফণী-মনসার গাছ আর কামরাঙার বন পেরিয়ে ঢুক্লো ওদের গোয়াল ঘরগুলির পাশে। অনেকগুলি দুধোলো গাই ওদের। ছায়েদের বাবা ক্ষেত-খামারের সঙ্গে দুধের ব্যবসাও করে। সেই গাইগুলি সারে সারে থাকে এখানে।

ছায়েদ আপন মনেই বল্লে, তোদের এখানে খুবই অসুবিধে হবে ফটিক। কিন্তু এ ছাড়া তোদের বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই।

দুষমণরা সারা গাঁয়ে টহল দিয়ে ফিরছে। আমাদের ভাগ্যি ভালো যে, আস্‌বার সময় তাদের একটিরও সঙ্গে মুখোমুখি হয়নি।

ফটিক বুঝ্‌লে, এখন ছায়েদের একটি কথারও জবাব না দিলে সে হবে অকৃতজ্ঞ। তাই ধীরে ধীরে বল্লে, না—না, অসুবিধে আর কি! তুই আমাদের আশ্রয় দিয়েছিস্ তাইত আমার মা এখনো প্রাণে বেঁচে আছে!

ছায়েদ বল্লে, একটা ঘর আমি এরই মধ্যে পরিষ্কার করে রেখেছি। দুটো কম্বল বিছিয়ে দিয়েছি মোটা খড়ের ওপরে। তাতে অন্তত তোরা শুয়ে থাক্‌তে পারবি। খড়গুলো গাদা করে এমনভাবে ঘরের সাম্‌নে রেখেছি যে, বাইরের কেউ এলেও বুঝ্‌তে পারবে না—যে, এখানে জন-প্রাণী আছে! আমি চাই না তোদের এই লুকোনো জায়গার কথা কেউ জানুক!

ফটিক মাথা নেড়ে জবাব দিলে, লুকিয়ে থাক্‌বার পক্ষে এর চাইতে ভালো যায়গা—সারা গাঁয়ে আর খুঁজে পাওয়া যেতনা। আর তোদের বসতবাটি থেকে এই গোয়াল ঘরগুলি বেশ অনেকটা দূরে। তাতে আমাদের থাক্‌বার খুব সুবিধেই হবে।

ছায়েদ বল্লে, আমি যখন এখানে যাতায়াত করবো—তখন সোজা বাড়ীর ভেতর দিয়ে না এসে—মনসা আর কামরাঙা বনের ভেতর দিয়ে আস্‌বে,—তাহলে আর কেউ সন্দেহ করবে না!

ফটিক বল্লে, একটা কথা—

ছায়েদ জবাব দিলে, কি বল্‌বি—বল্‌না!

ফটিক যেন একটু ভয়ে ভয়েই শুধোলে, আচ্ছা, আমরা যে এখানে

লুকিয়ে রইলাম—সেকথা তুই ছাড়া তোদের বাড়ীর আর কে—কে জানে ?

ছায়েদ জবাব দিলে, জানে শুধু আমার দিদি আমিনা। তাকে ত' তুই চিনিস্ ফটিক। কতদিন সত্ত পানানো ফ্যানা তোলা দুধ তার হাত থেকে কেড়ে খেয়েছিস্—তোর কি মনে নেই ?

ফটিক জিজ্ঞেস করে, আমিনা-দি বুঝি শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরেছে !

—হ্যাঁরে। চড়কের মেলা দেখ্তে এসেছে। ছায়েদ কথাটাকে সহজ করবার জন্যে উত্তর করে।—তোদের বাড়ীতে মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে বল্ছিল এরই মধ্যে এই বিপত্তি।

ফটিক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কইলে, তা' আমিনা-দিকে বলে ভালই করেছিস্। মার কাছে এসে দুদণ্ড ত' বস্তে পারবে। দু' চারটে কথা বল্তে পারবে।

ছায়েদ ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, দিদিকে যে বলেছি—তার আরো একটা মানে আছে রে—। নইলে তোদের খাবার দিয়ে যাবে কে ? জানি, মাসিমা ত' ভাত খাবেন না ! তবু চিড়ে-মুড়ি দুধ কলা। প্রাণটা বাঁচাতে হবে ত' ! সব কিছু সময় মত আমিনা দিদি এসে দিয়ে যাবে। মায়ের বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

কাল রাত্তিরেও তাঁর উঠোনে হাজার মানুষের পাত পড়েছে। আজ সেই মানুষ সর্ব্বহারা···পথের ভিখিরী। তবুও কি এই প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ?

মা শুধু উদাসীনভাবে একবার ফটিকের মুখের দিকে তাকালেন। ওরই জন্যে ত' তাঁর যত বন্ধন।

ঘুমন্ত খুকুকে ফটিক খড়ের গাদার ওপর শুইয়ে দিয়েছে। মার তাতেও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঠেলে ওঠে।

খুকুর খাওয়া-শোওয়ার বড় বাছ-বিচার. নিজের থালা, গেলাস, বাটি চাই—নইলে এক গ্রাস ভাত মুখে দেবে না। বিছানায় নিজের

বালিশটি, নিজের কোল-বালিশটি, গায়ে দেবার চাদরখানি—সব যায়গা মতো না দেখ্‌লে ও কেঁদে-কেটে অনর্থ বাঁধিয়ে বসে।

এই 'আদেখ্‌লা পানার' জন্যে যে সে কতদিন মার খেয়েছে তার ঠিক নেই।

সেই খুকুকে শুইয়ে রাখা হয়েছে খড়ের গাদার ওপর। এ অবস্থায় মা তার বৈধব্যের কথাও একবারটি ভাব্‌তে পারছেন না। সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে ছেলে আর মেয়ে। শেষ পর্য্যন্ত এদের দুটির জীবন যদি রক্ষা করা যায়!

এক ফাঁকে আমিনা এসে দাঁড়িয়েছে মায়ের সাম্‌নে। হাতে তার বাটি ভর্ত্তি দুধ আর ধামায় মুড়ি। বল্লে, ফটিকদা আর খুকু খেয়ে নাও। আমি যাচ্ছি একবার তোমাদের বাড়ী।

—আমাদের বাড়ী? অবাক হয়ে ফটিক শুধোলে আমিনাকে। তুমি কি বলছ আমিনা-দি?

মাথা নীচু করে আমিনা বল্লে, না গিয়ে উপায় নেই। মাসিমাকে ত' স্নান করে থান কাপড় পরতে হবে। তোমাদের বাড়ী গিয়ে তোমার ঠাকুমার দু'একখানা থান কাপড় নিয়ে আসি। আমায় কেউ সন্দেহ করবে না। ভাব্‌বে, আরো দশজনের মতো আমিও জিনিস-পত্র লুট করতে গেছি।

এইবার মা আমিনাকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠ্‌লেন। মায়ের চোখে এর আগে জল ছিল না। ফটিক ভাব্‌লে, কাঁদলে যদি মায়ের বুকের পাষাণ ভার একটু কমে।

আমিনা এরই মধ্যে এত কিছু ভেবে রেখেছে—তাতে সে যে কত বুদ্ধিমতী মেয়ে সেটা বোঝা যায়। কম কথা বলে, কিন্তু চুপচাপ

নিজের কর্ত্তব্য করে চলে যায়। ফটিকের বাবা যে মারা গেছেন—সে খবরও পেয়েছে। হিন্দু মেয়েদের যে বিধবা হবার পর থান কাপড় পরতে হয় তা-ও সে জানে। তাদের বাড়ীতে থান কোথায় মিল্‌বে? তাই এক লহমায় ভেবে নিয়েছে যে, ফটিকদের বাড়ী গেলে ওর ঠাকুমার দু' একখানা সাদা কাপড় অবশ্যই পাওয়া যাবে। আমিনা গিয়ে ঠিক তার কাজ গুছিয়ে এনেছে। আর পারবেই বা না কেন? ছেলেবেলা থেকে এই ফটিকদের বাড়ী সে কত গিয়েছে। ফটিকের দিদির সঙ্গে সে সই পাতিয়েছিল। সে দিদিও আজ বেঁচে নেই। তারপর ছায়েদের সঙ্গে ফটিকের হল সখ্যতা।

যা কিছু করবার আমিনাই করলে। ফটিকের মার হাতের লোহা খুলে নিলে, সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে ফেল্লে তারপর ঠাকুরমার থান কাপড় এগিয়ে দিলে তাঁর হাতে।

কিন্তু মা কিছুই মুখে দিতে রাজি নয়। আমিনা বল্লে, তুমি এখানে হবিষ্যি করতে পারবে না—সে আমি বুঝি। কিন্তু গরুর দুধ খেতে ত' কোনো আপত্তি নেই। আমাদের গোয়ালের দুধই ত' বরাবর তোমাদের বাড়ীতে যায়। আর আপত্তি করলে শুনবো কেন? তুমি যদি প্রাণে বাঁচো—তবেই ত' তোমার ছেলে-মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে।

এরপর আর কোনো কথা বলা চলে না। আর তা ছাড়া যারা এমনভাবে আশ্রয় দিয়েছে তাদের এমন অনুরোধ কি দু' পায়ে ঠেলা যায়?

সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বেশ নির্ব্বিবাদেই কাট্‌লো।

কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকেই ছায়েদের বাড়ীর সাম্‌নে একটা গোলমাল শোনা যেতে লাগ্‌লো।

কতকগুলি গুণ্ডালোক কি করে জানতে পেরেছে যে,—ছায়েদেরা হিন্দু ছেলেমেয়ে লুকিয়ে রেখেছে। ওদের হাতে তাদের তুলে দিতে হবে।

ছায়েদ একেবারে অস্বীকার করে বল্লে, বাড়তি লোক তাদের বাড়ীতে কেউ নেই। তার এক মাসি বেড়াতে এসেছে ছেলে আর মেয়ে নিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের ইসারা পেয়ে আমিনা চলে গেল গোয়াল ঘরের দিকে। সে ফটিককে গিয়ে সব কথা খুলে বল্লে। তারপর তার হাতে ছায়েদের একটি লুঙ্গি দিয়ে বল্লে, তুমি এক্ষুনি এটা পরে ফেল ভাই। দরকার যদি হয় ত' ছায়েদের সঙ্গে গিয়ে ওদের সামনে একবারটি দাঁড়াবে। গুণ্ডাগুলো ত' তোমায় চেনে না। তোমার আর ভয়টা কি শুনি?

ফটিক জবাব দিলে, আমিনাদি, আমি নিজের জন্যে ভয় পাইনে। না হয় ছায়েদের সঙ্গে এরপর গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু আমার মা? তাঁর প্রাণ কি করে বাঁচবে?

আমিনা বল্লে, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি—মাসিমার জন্যে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি তাকে এমন যায়গায় লুকিয়ে রাখবো যে, সারারাত ধরে খুঁজলেও ওরা তাঁর হদিশ পাবে না।

আমিনা চলে যাচ্ছিল। আবার ফিরে এসে থমকে দাঁড়ালো। ফটিক শুধোলে, কিছু বলবে আমিনা দি?

আমিনা জবাব দিলে, হ্যাঁ। খুকুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমার একটা মেয়ে ছিল জানো ত! তার জামা গুলি এখনো আমার কাছে আছে। খুকুকে আমি সেই ভাবে সাজিয়ে রাখবো। ওর গয়না

গুলোও বোধকরি এখনো হারিয়ে যায়নি। দরকার হলে বল্‌তেই হবে যে আমিই খুকুর মা। তুমি কিছু ভেবো না।

নিঃশব্দে ঘুমন্ত খুকুকে তুলে নিয়ে আমিনা বাড়ীর ভেতরের দিকে চ'লে গেল।

মা নির্ব্বাক হয়ে বসে সব কিছুই শুন্‌লে। কিন্তু কিছুই বল্লে না।

মা আর ছেলে চুপচাপ বসে রইল সেই খড়ের গাদার ওপর। গাছের পাতার একটা খস্‌খস্‌ শব্দ হলে দু জনেই চম্‌কে ওঠে। মা ভাবে, কি করে বুকের ধনকে বাঁচাবে; আর ছেলে মনে-মনে জ্বলে ওঠে, কি করে মায়ের সম্মান বজায় রাখ্‌বে?

রাত গভীর হতে থাকে।

দূরের বনে শেয়াল প্রহর ঘোষণা করে।

কিন্তু ছায়েদের বাড়ীর সাম্‌নেকার কোলাহল বন্ধ হয় না!

ফটিকের মনে হল, সারা পৃথিবীতে এমন একটি ঠাঁই নেই—যেখানে ওরা মা-পুত এক সঙ্গে বেঁচে থাক্‌তে পারে।

যে গুণ্ডার দল ক্রমাগত তাদের জন্যে দাবী জানাচ্ছে—তারা জীবনে ওদের কখনো দেখেনি; ওদের সঙ্গে কোনো শত্রুতাও তাদের নেই—তবু মানুষের রক্ত দেখ্‌বার এ কি হীন আকাঙ্খা মানুষের বুকে বাসা বেঁধে আছে? মানুষ কি কোনো দিনই প্রতিবেশীকে ভালো বাস্‌তে পারবেনা!

রাতের প্রহর বেড়ে চলে।

একটানা ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে।

এই নিস্তব্ধ রাত্রে অন্ধকার গোয়াল ঘরে বসে—জীবন আর মৃত্যুর সন্ধি স্থলে দাঁড়িয়ে ফটিকের কেবলি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কথা মনে পড়ছে।

কত আশার বাণী তারা শুনেছিল এই বুড়ো মানুষটির কাছে। তাদের দেশকে আবার বড় করে গড়ে তুল্‌বে, সবাই হাতে-হাত মিলিয়ে; কত আকাঙ্খা—কত পরিকল্পনা!—সব এক রাতের মধ্যে ছাই হয়ে গেল!

মানুষ আসলে কখনো খারাপ হয়?

ওই মৃত্যুঞ্জয়বাবু আর এই ছায়েদ! তাদের মনের পরিচয় একবার যারা পেয়েছে তারা কি কখনো তাদের ভুলতে পার্‌বে?

আজ এই মুহূর্ত্তে মৃত্যুঞ্জয়বাবু কোথায়? তিনি বেঁচে আছেন কিনা তা ও ফটিক জানে না! ছায়েদকে জিজ্ঞেস্ করবার মতো সাহস তার নেই!

রাত যে এরই মধ্যে কত বেড়ে উঠেছে—ওরা কেউ বল্‌তে পারে না। মা শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে একবার বল্লে, তোর ত' রাত্তিরে পেটেও পড়ল না কিছু! আমিনা বোধকরি ভুলে গেছে।

ফটিক মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে জবাব দিলে, আমাদের বাঁচাতে গিয়ে ওদের মাথার ওপরও ত' খাঁড়া ঝুল্‌ছে! এ সময় কি আর খাবারের কথা মনে হয় কারো?

ফটিকের কথা শেষ হয় নি—এমন সময় আমিনা মুড়ি, মুড়কি আর দুধ নিয়ে এসে হাজির হল।

মা একটু লজ্জা পেল। এই নির্ব্বাক নতমুখী মেয়েটি কি ভাবে তাদের রক্ষা করবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে—ভাব্‌লে সত্যি বিস্মিত হতে হয়।

ফটিক কোনো কথা না বলে আমিনার হাত থেকে সান্‌কিটা তুলে নিয়ে খেতে বসে গেল।

মা খানিকটা চুপচাপ রইল। তারপর নিজের কানেও যেন না পৌঁছয় অমনি ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, ওরা গোলমাল থামিয়েছে রে আমিনা? এখন ত' আর কোনো সাড়া শব্দ পাচ্ছি নে!

আমিনা এইবার তার মাসিমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল! বল্লে, আর তোমাদের এ বাড়ীতে বুঝি ধরে রাখ্‌তে পারবো না। মানুষগুলি বড্ড অবুঝ হয়ে উঠেছে।

মা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। বল্লে, সেই ভালো! আমাদের আশ্রয় দিয়ে তোদের ও ত' বিপদের সীমা নেই। তোরা দুটি ভাই বোন যা করেছিস—কোনো জন্মে আমি তার শোধ দিতে পারবো না। ছায়েদ কোথায়?

চোখের জল মুছতে মুছতে আমিনা বল্লে, ছায়েদ ওদের বোঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শয়তানগুলো একেবারে নাছোড়বান্দা। দুনিয়ায় ওদের যেন আর কোনো কাজ নেই! মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে আছে।

আমিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মা জবাব দিলে, এতগুলি শয়তানের বিপক্ষে তোরা দুটি ভাই-বোন কতক্ষণ লড়বি মা? তার চাইতে রাত্তিরের অন্ধকারে আমরা পালিয়ে যাই—। তোরা তখন ওদের এনে দেখাতে পারবি যে, বাড়ীতে সত্যি কেউ ছিল না। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না মা!

আমিনা আর মাসিমার একবার প্রতিবাদ করতে পারল না। তারও হাত-পা বাঁধা।

এইসব কথা শুনে ফটিকের খাওয়া অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। সে বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

হোক খড়ের গাদা। তবু ত' একটা নিরাপদ আশ্রয় মিলেছিল।

আবার তাদের অন্ধকার পথে বেরুতে হবে। কিন্তু তাদের পক্ষে অন্ধকারই ত' পরম শুভাকাঙ্খী বন্ধু। দিনের আলো তাদের ধরিয়ে দেবে রক্তপিপাসু শয়তানগুলির হাতে!

কিন্তু অবসন্ন হয়ে বসে থাক্‌লে ত' চল্‌বেনা। এক্ষুনি ওদের রওনা হতে হবে। এমন সময় ছায়েদ হন্ত-দন্ত হলে এসে হাজির হল। বল্লে, ফটিক, আর সময় নেই—এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়েই মাসিমাকে নিয়ে যেতে হবে। চল, আমি তোদের সঙ্গে যাবো।

মা বল্লেন আমিনা, আমার খুকুকে তুই এনে দে! যত আমরা দেরী করবো—তোদের বিপদ ততই ঘনিয়ে আস্‌বে।

আমিনা ছুটে গিয়ে খুকুকে নিয়ে এলো। তার পরণে তখন আমিনার মরা মেয়ের জামা আর গায়ে তারই সব পুঁতি আর রূপোর গয়না।

মা একবার আমিনার মুখের দিকে তাকালেন; কিন্তু তার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরে কোনো আপত্তিই আর তার মুখ দিয়ে বেরুলো না।

আমিনা ফটিকের হাতে দশটাকার দশখানি নোট গুজে দিয়ে বল্লে, রেখে দাও ভাই, পথে দরকার হবে।

ফটিক অবাক হয়ে শুধোলে, একি আমিনাদি, তুমি আমায় একশ টাকা দিচ্ছ! কিন্তু তোমাদের ঘর-সংসার ত' আছে—না....না—এ আমি ··

ফটিককে থামিয়ে দিয়ে আমিনা ধরা গলায় জবাব দিল, ও টাকা তোমাদেরই। তোমার ঠাকুমার মালার ডোঙায় খুঁজে পেয়েছি। খোদা মিলিয়ে দিয়েছেন,—পথে অনেক দরকার। না বোলোনা।

ফটিকের চোখ দুটি ছল্ ছল্ করে এলো। পাছে আমিনাও কেঁদে

ফেলে এইজন্য ছায়েদ তাড়া দিয়ে বল্লে, চল্ ফটিক,—অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। পথে নৌকা মিল্‌বে কিনা কে জানে!

ছায়েদ খুকুকে কোলে তুলে নিলে তারপর মাসিমা আর ফটিককে নিয়ে বনের অন্ধকার পথে মিলিয়ে গেল!

আমিনা সেইখানে পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ীর সাম্‌নেকার কোলাহল তখন চরমে উঠেছে!

উনিশ

ছায়েদের বুক দুর্-দুর্ করছে।

পথে অন্য কোনো গুণ্ডাদল আবার পথ রোধ করে দাঁড়ায় এই ভয়ে সে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে পা চালিয়ে চলেছে।

খানিকটা চল্‌বার পর খেয়াল হল···তাইত। মাসিমা ত তার সঙ্গে পেরে উঠ্‌বেন না। চিরটা কাল ঘর-গেরস্তের কাজ নিয়ে তিনি থেকেছেন। লোককে খাওয়াতে এত ভালোবাসতেন! কখনো অন্তঃপুরের বাইরে আস্‌তে তাকে কেউ দেখেনি! গ্রামে এত মেলা, যাত্রা, কবিগান দোলের গস্ত···কখনো তিনি নিজের ভিটে ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন নি। ফটিকের মায়ের নাম শুন্‌লে গাঁয়ের অনেক বুড়োও মাথা নীচু করত।

সেই তাদের মাসিমা আজ গাঁয়ের পথ দিয়ে নিশুতি রাতে হেঁটে চলেছেন। তবু ভগবানের অশীর্ব্বাদ যে, অন্ধকার সেই গ্লানিকে ঢেকে দিয়েছে। কেউ চোখ মেলে সে দৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্ছে না!

ছায়েদ চলার গতি মন্থর করে ফেল্লে। ওদের বাঁচাতে হবে—এই

কথাটাই মনের মধ্যে সব সময় বিছার কামড়ের মতো জাগ্‌ছে—তাই সে দিশাহারা হয়ে পাগলের মতো ছুটেছিল।

কয়েকটি লোক গান গাইতে গাইতে ঝোপের ওপাশ দিয়ে যাচ্ছে।

ছায়েদ থম্‌কে দাঁড়ালো।

কিছুই বলা যায় না! বিপদ যে কখন—কোথা থেকে এসে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তা' অতি বেশী সচেতন থেকেও টের পাওয়া যায় না। ফটিক ফিস্‌ফিস্‌ করে ছায়েদের কানে-কানে বল্লে, ওরা গুণ্ডা নয়। শেষ রাত্তিরে যাচ্ছে ক্ষেতে কাজ করতে। তাই সবাই মিলে গান ধরেছে।

ছায়েদ বল্ল, তাই হবে। তারপর ওদের নিয়ে ভিন্ন পথে এগিয়ে চল্‌লো।

ফটিক চল্‌তে চল্‌তে মাথার ওপর তাকিয়ে দেখে কালপুরুষ অস্ত যাচ্ছে। তার মনে পড়ল কতদিন মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাঁর দাওয়ায় বসিয়ে ছেলেদের গ্রহ-নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে এই কালপুরুষের মূর্ত্তিটাকে সে আগে খুঁজে বের করত। সেই কালপুরুষ আজও তাদের গাঁয়ের মাথার ওপর উঠেছে; কিন্তু সে যে এমনভাবে তাদের বিদায় দেবে—সে কথাটি সে কোন দিনের তরেও ভাবতে পেরেছিল!

খুকু ছায়েদের কাঁধের ওর ঘুমিয়ে পড়েছে।

ফটিক বল্লে, ছায়েদ ভাই, তুই আর কতক্ষণ ওকে বইতে পারবি? ঘুমুলে বাচ্চারা খুব ভারী হয়; দে আমার কাঁধে চাপিয়ে দে।

এত দুঃখের পথ চলার মধ্যেও ছায়েদ হেসে উঠ্‌ল।

জবাব দিলে, দেখ ফট্‌কে ষাঁড়ের ডাল্‌না আর মুরগীর জুস্‌ খেয়ে

আমার দেহে খুব জোর আছে। খুকুকে নৌকার ঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে আমার কোনই অসুবিধে হবে না। অতি ছেলেবেলা থেকে বাবার সঙ্গে দুধের কলসী বয়ে নিয়েছি। মাঠ থেকে ধান আঁটি বেঁধে এনেছি এত যে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। তার তুলনায় খুকু ত' সোলার মতো হাল্‌কা রে!

ফটিক আর কোনো আপত্তির কথা তুলতে পারল না। সত্যিকথা বল্‌তে কি ফটিকের সাধ্যি ছিল না যে, খুকুকে কোলে নিয়ে সে এতটা পথ হাঁটে! কিন্তু পথে বেরিয়ে মা যে একেবারে চুপ করে গেলেন,— আর একটি কথাও তার মুখ থেকে বেরুল না! সে একেবার মায়ের মুখের দিকে তাকালে। সে মুখ এত নির্লিপ্ত আর উদাসীন যেন মনে হল, মা যে কোথায় ছিলেন – কোথায় যাচ্ছেন কিছুই তার মনের মধ্যে নেই। মা যে সারা জীবনের মতো গাঁয়ের মায়া ছেড়ে হারা উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়িয়েছেন একথা কি তার মনে একবারও জাগছে না!

অতি বড় দুঃখের দিনে মানুষের যখন কিছু যায় কিছু হাতে থাকে তখন সে বসে হিসেব করতে পারে যে, তার কি খরচ হল -- আর জমার ঘরেই বা কি রইল! কিন্তু যে ভবের হাটে বিকিকিনি করতে এসে দেখে যে, সব কিছুই সে হারিয়ে বসে আছে তখন হিসেব করবে সে কি দিয়ে!

মা হয়ত সেই সব হিসেব-নিকেশের পালা শেষ করে ফর্দ্দ হাতে নিয়ে হাট শেষে—ফিরে যাচ্ছেন—কোথায় তাও তিনি জান্‌তে চান না!

এই ভাবনা চিন্তার মাঝখান দিয়ে ওরা অনেকখানি পথ চলে এলো।

আবার পথে বাঁকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ।

ছায়েদ সবাইকে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড় করিয়ে বল্লে, ফটিক দাঁড়া ভাই। আমরা যে পথ ধরে এগুবো—গোলমালটা সেই পথের ওপরেই হচ্ছে। আমি গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি! তুই এইবার বরং খুকুকে কোলে নিয়ে বসে একটু জিরিয়ে নে।

দ্রুতপদে ছায়েদ চলে গেল—গোলমালটা যেদিকে হচ্ছে সেই দিকেই।

মা ঘাসের ওপরে বসলেন। কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হল যে, সারা জীবনেও যদি কেউ তাকে এখান থেকে উঠ্‌তে না বলে তাহলেও তার দিক থেকে আপত্তির কোনো কারণ থাক্‌বে না।

ছায়েদের কিন্তু ব্যস্ততার সীমা নেই।

সে ছুটে গিয়েছে—আবার ছুট্‌তে ছুট্‌তেই ফিরে এসেছে।

বল্লে, পথের ওপরই একটা বাড়ী ওরা লুট করেছে। এখান দিয়ে আমাদের যাওয়া চল্‌বে না। লুট শেষ হয়ে গেলেই বোধকরি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

ফটিক অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করলে, কি উপায় হবে ভাই ছায়েদ? খুকু আর মাকে নিয়ে আমি তাহলে যাই কোথায়?

ছায়েদ লাফিয়ে উঠে জবাব দিলে, ঠিক কথা! মনে পড়েছে! আমাদের এই ডানদিকের জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ আছে। দিনের বেলা অনেক সময় রাখাল ছেলেরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরবার জন্যে ওই পথ দিয়ে গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসে। সেই পথ ধরেই এবার আমাদের এগুতে হবে। আর ভাব্‌বার সময় নেই; ফটিক, ওঠ,—খুকুকে আমার কাছে দে—

মা যেন কলের যন্ত্র। ইচ্ছাও নেই, অনিচ্ছাও নেই। উঠে আবার ওদের তুজনের পিছু-পিছু জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চল্লেন।

রাশি রাশি জোনাকী সেই জমাট অন্ধকারের মধ্য পথ দেখাতে লাগ্‌ল। হঠাৎ একটা বেত কাঁটায় কাপড় জড়িয়ে যেতে মা পথের মাঝখানে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন! কিন্তু মুখ থেকে আহা-উহু— কোনো তুঃখের কথা বেরুলো না।

কি হল—কি হল? বলে ছায়েদ থম্‌কে দাঁড়ালো; আর ফটিক এগিয়ে গিয়ে মাকে টেনে তুল্লে। বল্লে, মা, তুমি আমার ঠিক পেছন-পেছন এসো—

দম-দেয়া কলের মতো মা ছেলের পেছন পেছন আবার পথ চলা সুরু করেন।

পথটা বড্ড এঁকে বেঁকে গেছে—আর তার তুধারে শুধু বেত কাঁটা, জলবিছুটি আর ভ্যান্না গাছ। চল্‌তে গেলে অনেক সময় গাছের ডালের সঙ্গে মাথার ঠোক্কর লাগে। কিন্তু উপায় নেই—এই পথেই তাদের এগুতে হবে।

অনেকটা এইভাবে এগুবার পর বনের পথে শুক্‌নো পাতার ওপর খস্‌খস্‌ আওয়াজ পাওয়া গেল।

ছায়েদ বল্লে, শয়তানদের অসাধ্য কিছুই নেই। তোরা একটু ঝোপে লুকিয়ে থাক্‌. আমি এগিয়ে দেখি—

ছায়েদ এগিয়ে চলে যায়।

একটু বাদেই তার সাড়া পাওয়া যায়।

—ফট্‌কে চলে আয় রে। কার গরু পথ হারিয়ে জঙ্গলের মধ্যে

ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরই পায়ের চাপে শুক্‌নো পাতায় খস্‌খস্‌ আওয়াজ দিয়েছিল। তবু সাবধানের মার নেই।

মায়ের বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আবার সেই স্থূচিভেদ্য আঁধারের ভেতর দিয়ে একের পেছনে অন্যের অন্ধের মত পথ চলা।

ছায়েদ বল্লে, জঙ্গল এইবার শেষ হয়ে এলো। আমরা একেবারে গাঙের ধারে গিয়ে হাজির হবো।

দেখা গেল—জঙ্গলের পথের অন্ধি-সন্ধি ছায়েদ সব জানে। একটু বাদেই ওরা একেবারে নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল।

অন্ধকার বনভূমির পর শেষ-রাত্তিরের নদীতীর অতি বড় হতাশের মনেও যেন নতুন আশ্বাস বয়ে নিয়ে আসে।

ফটিক আস্তে আস্তে শুধোলে, আচ্ছা ছায়েদ, আমাদের কি কেউ নৌকোয় নিতে রাজি হবে? তুই আকু-পাকু করলে কি হবে—? আমাদের অদৃষ্টে রয়েছে নিশ্চিত মরণ।

ছায়েদের মনেও যে খুব বেশী ভরসা আছে—তার মুখ দেখে তেমন কিছু বোধ হল না। এতক্ষণ একটা ঝোকের মাথায় ওদের নিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা হওয়া সত্যি শক্ত।

তবু সান্ত্বনা দেবার ভাষায় জবাব দিলে, দাঁড়া না, এর মধ্যে একটা চেনা-শোনা মানুষ কি খুঁজে পাওয়া যাবে না? তার নৌকোতেই তোদের তুলে দেবো।

নদীর এই যায়গাটার নাম মনসাতলা ঘাট।

নদীর ওপরই মনসাদেবীর মন্দির। প্রতি বছর মনসাপূজার সময় এখানে মেলা বসে। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে এখানে একটি

ছোটখাটো হাটের সৃষ্টি হয়েছে। দূর-দূর যায়গা থেকে সাপে-কাটা মানুষকে এখানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়।

মন্দিরের যিনি পুরোহিত তিনি এ অঞ্চলের একজন নাম করা ওঝা! বহু স্ত্রী-পুরুষকে তিনি মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। সাপকে জব্দ করবার আসল অষুধ তাঁর জানা আছে এই কথা চারিদিকের সাতটা গাঁয়ের লোক জানে।

এই মনসা ঘাটে প্রত্যহ বহু নৌকো এসে লাগে।

পারাপারের নৌকো, ব্যাপারীর নৌকো, জমিদারের বজ্‌রা, নৌকো বাচের ছিপ্, ছোট ছোট নৌকো—যার নাম কোশা—এম্‌নি বহুজাতীয় নৌকোর সমাবেশ হয় এখানে।

ফটিক ভয়ে ভয়ে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। নৌকো-গুলো পাশাপাশি যেন নদীর কোলে ঘুমিয়ে আছে। এখন যাত্রীর চ্যাঁচামেচি নেই, নেই ব্যাপারীদের ভীড় আর নৌকো বাচের সোল্লাস ধ্বনি! সব যেন রূপোর কাঠির পরশ পেয়ে নিঝুম হয়ে আছে।

ছায়েদ বল্লে, আয় ফটিক আমার পেছন-পেছন। এই ফাঁকে একটি নৌকোয় তোদের তুলে দেবোই।

আরো কিছুটা পা চালিয়ে গিয়ে ঘাটের কিনারায় এসে খুশী মনে ছায়েদ বল্লে, এইবার আর ভাবনা-চিন্তা নেই। আসল ওষুধ পাওয়া গেছে—

ফটিক শুধোলে, আসলে ওষুধটা কি শুনি?

ছায়েদ আঙুল দিয়ে একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকো দেখিয়ে দিয়ে জবাব দিলে, দেখ্‌ছিস্ নে? বসির মিঞার ডিঙি ঘাটে বাঁধা রয়েছে! এইবার ঠিক মুস্কিল-আসান হয়ে যাবে।

ফটিক চেয়ে দেখ্‌লে হ্যাঁ, বসির মিঞারই নৌকা বটে।

এ সেই বসির মিঞা যে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর উঠোনে ওদের লাঠি খেলা আর কুস্তি শেখাতো। সে হিন্দু না—মুসলমান—একথা একবারও মনে জাগে না। সবাই জানে সে বসির মিঞা, সবাইকার আপন জন, ছেলেদের ত' দোস্ত্‌—

ছায়েদ হাঁক্‌ দিলে, বসির মিঞা নায়ে আছো—

কোনো জবাব না দিয়ে হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে বসির মিঞা ছইয়ের তলা থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। ওদের দেখে চিন্‌তে পারলে। তারপর ফিস্‌ফিস্‌ করে উত্তর কর্‌লে, আস্তে কথা ক' ছায়েদ। ফট্‌কেরে নিয়ে এলি বুঝি? তারপর ফটিকের মায়ের দিকে চোখ পড়তে বল্লে, এসো মাঠান, নায়ে উঠে এসো—ছৈয়ের তলায় চলে যাও। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার ভরসা কি? আশে-পাশে মন্দ মানুষ মেলা ঘাপটি মেরে আছে।

ফটিকেরা সবাই মিলে নিঃশব্দে নৌকোয় উঠে ছইয়ের ভেতরে গিয়ে যখন বস্‌ল—তখন তাদের মনে হল—কেটে ফেল্লেও আর তাদের ওঠবার ক্ষমতা নেই।

ছায়দের চোখে এইবার জল দেখা দিয়েছে। বল্লে, তোমারে কিছু কওনের নাই বসির মিঞা—ওদের তুমি দেখো—

বসির চাপা গলায় জবাব দিলে, তুই আর কি কইবি রে ছায়েদ—সেদিনের দুধের পোলা। আমি এই দু'দিন চোখের ওপর যা' দেখ্‌লাম—তাতে পাগল হয়ে না যাই! কত হিন্দু পরিবারকে যে আমি এই নৌকায় করে ইষ্টিমারে উঠিয়ে দিয়েছি—সে কথা এখন গুণে বল্‌তে পারবো না। তবে যত মেয়েছেলেকে বাঁচাতে পেরেছি তার

চতুর্গুণ চোখের সাম্‌নে কচু-কাটা হয়েছে। কোনো কথা শালারা শোনেনি—

ছায়েদ ব্যস্ত হয়ে বল্লে, তা হলে তুমি আর দেরী কোরোনা বসির মিঞা—নাও ভাসিয়ে দাও। আমি নেমে যাই। মাসিমা পায়ের

ধূলো দাও, ফট্‌কে চিঠি দিস্। তোর নিজের হাতের লেখা চিঠি না পেলে কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না।

চোখের জল গোপন করে ছায়েদ এক রকম পালিয়েই যেন নৌকো থেকে নেমে গেল!

এইবার মায়ের মুখে কথা ফুটল। মা বল্লেন, ছায়েদ, তুই আর আমিনা আমার আর জন্মের ছেলে-মেয়ে ছিলি—! আর কিছু তার মুখ দিয়ে বেরুলো না, শুধু ঠোঁট দুটো থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগ্‌লো।

ওপর থেকে একটা হাঁক শোনা গেল—নৌকো ছাড়ে কেডা? বসির মিঞা চাৎকার করে জবাব দিলে—আমি গো—আমি—বসির মিঞা—কুটুম্ বাড়ী যাই—

বিশ

পাল তুলে দিয়ে হাল ধ'রে বসেছে বসির মিঞা। তার কোলের কাছটিতে বসে ফটিক যত রাজ্যের হত্যাকাণ্ডের কাহিনী শুনে ক্ষণে-ক্ষণে শিউরে উঠ্‌ছে!

ছইয়ের তলায় মা খুকুকে নিয়ে নির্জীবের মতো পড়ে রয়েছেন; দেখে মনে হয় না যে, দেহে প্রাণ আছে।

খুকু কিন্তু উস্‌খুস্ করছে। সেটা বসির মিঞার চোখ এড়ায় নি।

বল্লে, ফট্‌কে, নৌকার পাটাতলের তলায় চিঁড়ে আর গুড় আছে খুকুটাকে দে',—তুইও খেয়ে নে। তারপর আঁজ্‌লা ভরে নদী থেকে পানি খা—একদিনের মতো নিশ্চিন্দি। মাঠান্ ত' আমার জিনিষ মুখে দেবে না,—তা নইলে তোমায়ও চারটি মুখে দিতে বল্‌তাম। মা

শুধু বল্লে, না বসির, আমি বেশ আছি। তুমি কেবল আমার ছেলে-মেয়েকে বাঁচিয়ে দাও—।

বকের মতো পাখা মেলে বসিরের ডিঙ্গি নৌকো যেন উড়ে চলে।

বসির মিঞা হাল ধরে বসে আছে বটে, কিন্তু তার দৃষ্টি সব দিকে ঘুরে আসছে।

অনেক মরা ভেসে যাচ্ছে নদীর জলে। ফটিকে ঝুঁকে সেগুলি দেখতে যাচ্ছিল। বসির তাকে ধমক দিয়ে বল্লে, আবার ওদিকে ঝুঁকছিস্ কেন? বসে থাক্ আমার কাছে। এদিক-সেদিক করলে আমি কিন্তু আর কোনো গল্প করবো না!

ধমক খেয়ে ফটিক আবার চুপচাপ বসে পড়ে। কিন্তু এক মহূর্ত্তের মধ্যে নদীর জলে যে মরাটা সে দেখেছে—তার কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না! ছোট্ট ছেলে। ঢলঢলে মুখখানি! কোঁকড়া-কোঁকড়া কি সুন্দর কালো চুল! লাঠির ঘায়ে বোধ করি মাথাটা দু'খানা করে ভেঙে দিয়েছে। রক্তে নদীর জল একেরারে রাঙা হয়ে গেছে। ওদিকে চোখ পড়লেই গা শিউরে ওঠে! অমন সুন্দর ছেলের মাথায় যে লাঠি মেরেছে তার মনটা কি দিয়ে গড়া ফটিক আপন মনে ভাবতে চেষ্টা করে। এই ত' তার পাশেই বসে রয়েছে বসির মিঞা। সে-ও ত' মুসলমান। কিন্তু সে কথা ত' একবারও মনে হয় না।

শুধু মনে হয় একটা মানুষের কাছে বসে আছে ফটিক।

হঠাৎ দূরে একটা নৌকো দেখে বসির মিঞা চঞ্চল হয়ে উঠল। ফটিককে কানে-কানে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, ওরে একবার ছইয়ের ভেতরে সেঁধিয়ে মায়ের পাশটিতে শুয়ে পড় ত!

ফটিক ওর কথা বুঝতে না পেরে হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বসির তাকে ঠ্যালা দিয়ে বল্লে, আবার মিছিমিছি দেরী করে? আমি যেমন বল্লাম—ঠিক সেই রকম শুয়ে পড় গে যা'। আর ছইয়ের দু' ধারের চট্‌টা ফেলে দে, শীগ্‌গির।

বসির যেমন-যেমন বলেছিল ফটিক মুখ বুঁজে তাই করে।

ইতিমধ্যে সেই দূরে-দেখা নৌকোখানি বসির মিঞার ডিঙির কাছে এসে হাজির হয়েছে। অনেকগুলি ষণ্ডা-ষণ্ডা লোক এই নৌকোর ওপর বসে; ভাঁটার মত চোখ। লুটের কিছু কিছু গয়না আর দামী জিনিষ পাটাতনের ওপর পড়ে আছে। রাম-দা, সড়কী আর লাঠি গাদা করা রয়েছে এক কোনে।

ফটিক চটের ফাঁক দিয়ে দেখে কাঁপতে থাকে। বসির মিঞা একা মানুষ, ওদের বাঁচাবে কি করে?

যে লোকটি দলের চাঁই—সে ঝাকড়া চুলের গোছা একবার হাওয়াতে নাচিয়ে বল্লে, কি মিঞা, নাওয়ের মালিক তুমি নাকি?

বসির মিঞাকে এতটুকু বিচলিত দেখা গেল না। হাল ধরে বসেই নির্লিপ্তভাবে উত্তর করলে, হ্যাঁ মিঞা ভাইরা, মেয়েটার বড়ো ব্যামো। আবার ওর শ্বশুর বাড়ীতে একটা সাদি লেগেছে। কুটুম বাড়ীর কড়া তাগিদ্ সেখানে পোঁছে দিতেই হবে। তাই ব্যামো নিয়েই মেয়েটা রওনা দিয়েছে। লোকজন পেলাম না। নিজেই নাও বেয়ে চলেছি কুটুম বাড়ী।

চাঁই লোকটা আবার বল্লে, সাচ্ কথা বলেছ ত' মিঞা? কোনো গোলমাল নেই ত' ভেতরে?

বসির মাথা নেড়ে বল্লে, নিজের মেয়ে নিয়ে যাচ্ছি তার আর গোলমাল কি মিঞা? না হয় আমার সঙ্গে তোমরাও কুটুম বাড়ী চলো না—

লোকগুলি এক সঙ্গে দাঁত বের করে হো-হো শব্দে হেসে উঠল। তারপর হাতের ইশারায় নৌকোর ওপরে রাখা লুটের মালগুলি দেখিয়ে দিয়ে জবাব দিলে, না মিঞা, তোমার কুটুম বাড়ী যাবার সময় আমাদের নেই। তবে পথে যদি খোরাক পাও—তবে হাঁক-ডাক করে আমাদের খবর দিও—

—তা দেবো বৈ কি! আমিও ত' সেই পথেরই পথিক! বসির মিঞা তাদের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে।

ষণ্ডা লোকগুলো হো-হো করে হাস্‌তে হাস্‌তে অন্য এক দিকে নতুন শিকারের সন্ধানে চলে যায়।

মা শুয়ে শুয়ে সব কিছুই শুনতে পাচ্ছে। কথা বলার কিম্বা ভয় পাবার পর্ব্ব যেন তার জীবন থেকে একেবারে শেষ হয়ে গেছে! প্রাণ ত' মহাকালের পায়ে অঞ্জলি দেয়াই আছে। তবু মৃতু-সায়রের পারে দাঁড়িয়েও ছুটি ক্ষুদ-কুড়োর জন্যে নিজের জীবনের এতখানি মমতা।

নৌকোটা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে ফটিক ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে চুপচাপ বসিরের পাশে এসে বস্‌লো। বসির মিঞার মুখ দিয়েও সহসা কোনো কথা বেরুলো না। সে শুধু ফটিকে পরম আগ্রহে নিজের বুকে টেনে নিলে। এই বুড়ো মুসলমানটি যেন তাকে নিজের কলিজার ভেতর লুকিয়ে রাখতে চায়!

ক্রমে রৌদ্রের তাপ কড়া হতে লাগ্‌লো।

ফটিক আর খুকু চিড়ে-গুড় খেয়েছে বটে—তবু নদীর হাওয়ায় পেটের ক্ষিদে যেন চার পা তুলে ঘোড়ার মতো লাফাতে সুরু করে দিলে।

খুকু এতক্ষণ চুপচাপ মায়ের পাশটিতে শুয়ে ছিল। তার এই ছোট্ট জীবনে সময় মতো মাছ-ভাত খাওয়া একেবারে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রথমে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লে। ওদের বাড়ী সব সময় রম্‌-রম্‌—গম্‌-গম্‌ করতো। কিন্তু এই রকম মারামারি—আগুন, চোরের মতো পালিয়ে বেড়ানো—ওর কাছে একেবারে নতুন। তাই হাসিখুসী মেয়েটা ছু' দিনের মধ্যে যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে! না পারে কিছু বুঝতে, না পারে কিছু কইতে!

তবু ওইটুকু ছুধের শিশু ক্ষিদে কি করে সইবে?

ক্ষীণকণ্ঠে মাকে বল্লে, ক্ষিদে পেয়েছে মা, মাছ-ভাত খাবো—

বসির মিঞা কপালে এক চাপড় মেরে বল্লে, আহা বাছারে! জন্ম ইস্তক ওরা মাছ-ভাত খেয়ে মানুষ···আজ একেবারে আচম্‌কা অকুল পাথারে পড়ে গেছে। আল্লার যে কি মর্জ্জি তা সেই জানে!

মা কখনো ছেলে-পুলের ক্ষিদে সইতে পারেন না। কিন্তু আজ তিনি তাঁর মনকে পাষাণে বেঁধে ফেলেছেন। খুকুর মুখ থেকে ক্ষিদের কথা শুনেও চুপ করে মরার মতো পড়ে রইলেন। পাছে তার মুখের দিকে চাইলে চোখে জল আসে—তাই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ফটিক শুধু ফিস্‌ ফিস্‌ করে ওকে শুধোলে, খুকু, আর একটু চিড়ে খাবি? ভারী সুন্দর লাগে গুড় দিয়ে খেতে—

খুকু মাথা নেড়ে জবাব দিলে, না—না, চিড়ে আমি খাবো না। আমি খাবো মাছ ভাত—

এর পর খুকুর কথার জবাব দেবার আর কেউ নেই।

নৌকোর ভেতর কয়েকটি প্রাণী একেবারে চুপ!

হঠাৎ দেখা গেল বসির মিঞা গাঙ ছেড়ে একটা ঝোপের ভেতর ডিঙি নৌকো ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

মা ধড়মড় করে উঠে বস্‌লেন। খুকুর কান্নায় যে মা নড়ে বসেন নি—একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করে মা বুঝি হঠাৎ শিউরে উঠলেন!

কার মনে কি আছে কে বল্‌তে পারে?

কথায় বলে, ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়!

বসির মিঞার মনে যে মন্দ কিছু নেই—তাই বা হলফ্‌ করে কে বল্‌তে পারে?

মা শুধোলে, এ আমরা কোথায় যাচ্ছি বসির? আমাদের ষ্টীমার ঘাটে নিয়ে যাবে না?

বসির মিটি-মিটি হাস্‌তে লাগলো। কোনো কথার জবাব দিলে না।

এতে মায়ের মনের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। বল্লে, বসির, তোমার মতলবখানা কি, আমায় খুলে বলো ত?

বসিব জবাব দিলে, এই ঝোপের ভেতর ডিঙিটা লুকোচ্ছি কেন জানো মাঠান? কাছেই একটা ছোট-খাটো হাট বসে। তুমি এই ফাঁকে একটা ডুব দিয়ে নাও। আমি চাল, ডাল, হাঁড়ি, নুন, লক্‌ড়ি কিনে নিয়ে আসি। এক কড়া চাপিয়ে দেবে নদীর ধারে। কাক পক্ষীতেও দেখতে পাবে না। তারপর আমরা সবাই মিলে প্রসাদ পাবো।

এক মুহূর্ত্ত আগে এই বসিরকেই মা সন্দেহ করে বসেছিলেন। দুঃখের অগ্নি-পরীক্ষার মাঝখান দিয়ে চল্‌তে গেলে মানুষের মন সবাইকে এত বেশী সন্দেহ করে বসে যে,—অতি বড় হিতাকাঙ্ক্ষীকেও শত্রু বলে ভাবতে তার আটকায় না!

সত্যি, বসিরকে সন্দেহ করে মা মনে মনে পাপ সঞ্চয় করলেন।

নিজের মনকে নিজে শাসন করে মা এই সব রান্না-বান্নার ব্যাপারে আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বসির নৌকো বেঁধে তীরে লাফিয়ে পড়েছে। শুধু একবার মুখ ফিরিয়ে ফটিককে বল্লে, ওরে, নৌকো ছেড়ে কোত্থায়ও যাস্‌নে যেন ফট্‌কে। আমি যাবো আর আস্‌বো।

ফটিক একবার ভেবেছিল বসির মিঞার সঙ্গে সে-ও যাবে। কিন্তু হাট আর আগেকার দিনের হাট নেই, আর তা' ছাড়া মা আর খুকু অসহায়ের মতো নৌকোয় পড়ে থাক্‌বে এই কথা মনে হতে সে চুপচাপ বসে রইল—আর কোনো প্রতিবাদই করল না।

যায়গাটাকে নিরিবিলিই বল্‌তে হবে।

বেশ খানিকটা পরিষ্কার তক্‌তকে যায়গা। যেন প্রকৃতি ঠাকুরুণ নিজে ঝাঁট দিয়ে, ন্যাতা বুলিয়া সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছেন। হাত পা ধুয়ে রান্না চাপিয়ে দিলেই হল।

চারদিকের ঘন ঝোপ এমনভাবে যায়গাটাকে আড়াল করে রেখেছে যে মনে হয়—যে রামপ্রসাদের মতো কোনো সাধক বুঝি আপন মনে মায়ের গান গাইতে গাইতে নিপুণভাবে বেড়া বেঁধে রেখে গেছে।

স্থানটি সত্যি মনকে টানে।

যে মার পাশ ফিরে শুতে আপত্তি ছিল—তিনিও কোনো কথা না বলে জলে গা ডুবিয়ে স্নান করতে লেগে গেলেন।

তার বাড়ীর ইট-কাঠে এখনো বোধ করি আগুন জ্বল্‌ছে। সেখানে এক ঘটি জল ঢেলে দেবার কেউ নেই। নিজের সেই সাজানো-গোছানো সংসারের কথা মনে করে মার বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভগবান যদি কোথাও থেকে থাকেন তবে ওই দীর্ঘশ্বাস তার পা-দুটিকে কি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও উত্তপ্ত করে তুল্‌বে না!

স্নান করতে করতে মায়ের কত চোখের জল যে গাঙের জলে মিশে গেল সেকথা তার পেটের ছেলেও জানতে পারল না!

বসির মিঞার কিন্তু যে কথা সেই কাজ।

মোটেই দেরী সে করেনি। কিন্তু তারই মধ্যে খিচুড়ি রান্না করার সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে এসেছে।

উনুনে আগুন দিয়ে মা নিজের পোড়াকপালের কথাই ভাব্‌ছিল। হয়ত এই দু'দিনের ভিতর ভাববারই অবকাশ পায়নি।

যে ঘরের বৌ সে—সিঁথির সিন্দুর মুছে গেলেও তাকে নিজের অন্তঃপুরে কিভাবে বৈধব্যের নিয়ম পালন করতে হত! কিন্তু আজ সে স্বামীর কথা একবার দিনান্তে ভাব্‌কেও সময় পাচ্ছে না। সবই ত' ঐ ছেলে-মেয়ের মুখ চেয়ে। আজ তাকে সব কিছু চল্‌তি নিয়ম ভেঙ্গে ফেলে ফটিক আর খুকুকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নদীর ধারে উনুন ধরাতে হয়েছে। নিজের পোড়া পেটের কথা কি মা ভুলতে পারছে? এ বিধাতার কি বিধান—যার সর্ব্বস্ব গেছে—তাকেও ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা সইতে হয়! মাথায় যখন সত্যি বাজ ভেঙ্গে পড়ে ভগবান তখন মানুষকে সব ভুলিয়ে দেন না কেন?

ফটিক আর খুকু আজ তবু কিছু মুখে দিতে পারল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই দুটো দিন ওরা যেন ভাল করে বুঝতেই পারেনি—কি রকম চোরা বালির ওপর ভাই-বোন তার মার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে! ওদের চোখের কোলে—কপালে আর ঠোঁটে কোন অদেখা হাত যেন একটা মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শ রেখে গেছে! মরণ ওদের ছিনিয়ে নিতে গিয়ে যেন নেহাৎ তাচ্ছিল্য করেই ফিরিয়ে দিয়ে গেছে!

অবারিত উদার আকাশ, নদীর খোলা হাওয়া আর সেই সঙ্গে বসির মিঞার স্নেহের স্পর্শ ওদের আবার জীবনের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে গেল কিনা—কে জানে!

মার মনের অবস্থা এমন নয় যে, সে নিজে কিছু মুখে তোলে।

কিন্তু বসির মিঞার চোখকে ফাঁকি দেবার যো নেই।

সে নৌকার আগা-গলৈতে বসে মিনতে করে বল্লে, মাঠান, আমি তোমার ধর্ম্ম-পুত্তুর, আমি বল্‌ছি তুমি দুটো না খেলে আমিও আজ উপোস করে থাক্‌বো। আমায় তুমি কিছুতেই ভোলাতে পারবে না।

তখন মা চোখের জলে মুখে অন্নের গ্রাস তোলে।

হাঁড়িটা আলাদা করা ছিল। সেইটি টেনে নিলে বসির মিঞা। বল্লে, আজ মায়ের প্রসাদ পেলাম বটে, কিন্তু তোমায় এমন অবস্থায় পেলাম যে, অতি বড় শত্রুরও সে অবস্থা যেন কেউ কখনো কামনা না করে।

মায়ের বুক ঠেলে কান্না আসে।

এতদিন সে চোখের জল লুকিয়ে ছিল কোথায়?

আবার বসির মিঞার ডিঙ্গি নৌকো মোচার খোলার মত গাঙের বুকে ভেসে চলে। কেউ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে—কেউ দেখে না।

সূয্যিমামা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে এক দিকে যেমন চলেছে হোলি খেলা—তেমনি গগনের কোনের মেঘের মধ্যে চলেছে রঙের মাতামাতি!

কিন্তু অলস চিন্তায় সেদিকে তাকিয়ে স্বপ্নের জাল বোনার অবকাশ আজ এই ডিঙির আরোহীদের কারো নেই!

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসে ঘনিয়ে। গাঙ-চিলেরা যে যার বাসার খোঁজ করে। মা সেই দিকে তাকিয়ে ফটিক আর খুকুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাবে আজ ওদের মাথা গোজবার ঠাঁই টুকু নেই! পশুপাখী, কীট পতঙ্গ সবাকারই আছে বাসা। সন্ধ্যে হলে তারা নীড়ের মায়ায় ফিরে আসে; কিন্তু তার ছেলে-মেয়ে দুটি সোতের সেওলার মতো কোথায় ভেসে চল্লো, সদ্য ওঠা শুকতারার দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন করেও তার কোনো জবাব মিল্‌লো না।

নদীর দুধারে ধীরে ধীরে যেন দীপান্বিতার আলো ফুটে উঠ্‌ল। কিন্তু সেই অজস্র আলোর একটিও তাদের আহ্বান জানিয়ে বল্‌ল না, —ওরে, তোরা এই ঘাটে এসে নৌকো ভিড়িয়ে নে; এখানে তোদের মিল্‌বে রাত্রের আশ্রয়, ক্ষুধা নিবারণের অন্ন আর নিরাপত্তার আশ্বাস।

এত মানুষের এত স্নেহের নীড়···কিন্তু ওরা কোন পাপে এমন করে অন্ধকারের পথে চিরকাল ধরে চলবে হারিয়ে যাওয়ার স্রোতে?

মানুষকে ওরা ভালো বেসেছিল; তাই কি এই পুরস্কার?

একুশ

বসির মিঞার নৌকো আঁধার ভেদ করে নদীর পথে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। ভয়ে বসির মিঞা আলো জ্বালেনি। পাছে গুণ্ডারদল সন্ধান পেয়ে ছেঁকে ধরে।

বসির খুব ভাল রকমই জানে—নানা জাতীয় নৌকো নদীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে···শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে-শুঁকে—একবার কোন রকমে সন্ধান পেলে হয়! হিংসা আর লোভ ওদের হাত ধরাধরি করে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা নিজেরাই ঠাহর করতে পারছে না। উন্মত্ততা কমে গেলে নিজেদের দিকে যখন তাকাবার অবকাশ পাবে—তখন ওরা বেশ বুঝতে পারবে যে, নদীর এমন এক কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে যার পাড় ভেঙে এক্ষুণি অতল তলায় তলিয়ে যাবে!

সেই জন্যে বসিরের সাবধানতার অন্ত নেই।

বেশী জোরে দাঁড় টানে না—পাছে তার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হয়।

পালটা নামিয়ে রেখেছে—সাদা পাখ্‌না···অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে। শুধু হাল ধরে আর কতটুকু এগুনো যাবে?

ফটিক বল্লে, আমি দাঁড় টান্‌বো বসির ভাই?

বসির ব্যস্ত হয়ে বল্লে, না রে না! শব্দ করতে চাইনে। দেখছিস্ নে—পাছে কেউ দেখে ফেলে সেই জন্যে নায়ে 'চেরাগ' পর্য্যন্ত জ্বালিনি! আর ঘণ্টা দুয়েক দাঁত কাম্‌ড়ে পড়ে থাক্। ষ্টীমার-ঘাট এসে গেলে তোদের একরকম করে তুলে দেবোই।

ফটিক আর কোন প্রতিবাদ করে না। ছইয়ের ভেতরে বসে ওই নিশ্চুপ মানুষটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

একটা কথা সে কিছুতেই ভুল্‌তে পারে না যে,—যারা তাদের ঘর ছাড়া করেছে তারাও মুসলমান, আর যে তাদের বাঁচাবার জন্যে জান-প্রাণ খাটছে সেও মুসলমান।

একদল মনে করেছে ওদের পরম শত্রু, আর একজন মনে ভেবেছে নিকট আত্মীয়! মানুষের মনের মধ্যেই স্বর্গ-নরক পাশাপাশি বাস করে।

হঠাৎ নদীর জল কাঁপিয়ে একটা শিঙা বেজে উঠ্‌ল; তারপরই দাঁড়ের ঝুপ-ঝুপ শব্দ করে বসিরের ছোট্ট ডিঙিটাকে ঘিরে ফেল্লে—আর কয়েকটি নৌকো। সঙ্গে সঙ্গে দুটো জোয়ান লোক বসিরের নায়ের ওপর লাফিয়ে উঠ্‌লো। একজন বল্লে, মিঞা, সন্ধ্যে থেকে তোমার ডিঙিটাকে লক্ষ্য করে আস্‌ছি।

আর একজন ঝাক্‌ড়া চুলকে নাড়িয়ে বল্লে, মুসলমান হয়ে তুমি এ বেইমানী কেন করছ? হিঁদুদের দিচ্ছ ইষ্টীমার ঘাটে পৌঁছে?

বসির মিঞা জবাব দিলে, মিছেমিছি কেন ঝামেলা বাধাচ্ছ ভাই? আমি যাচ্ছি কুটুম্‌-বাড়ী—জরুরী কাজ আছে। আমার নায়ে ত' আর টাকা-পয়সা, সোনা দানা নেই যে লুট করবে।

ঝাক্‌ড়া চুলওয়ালা লোকটা ঠাট্টা করে বল্লে, আছে কিনা সেটা খোঁজ নিলেই বোঝা যাবে 'খন। পালাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই! দেখছ ত' তোমার ডিঙিকে চারদিক থেকে নৌকো এসে মৌমাছির মতো ছেঁকে ধরেছে।

আর একজন নৌকোয় উঠে বল্ল, আগে একটু তামাক খেয়ে নিলে হত না? বসিরের মনে হল গলার স্বরটা যেন চেনা-চেনা।

বল্লে, তফন মিঞা না? তুমি শেষ কালে এলে আমার নায়ে ডাকাতি করতে?

তফন ঘাড় ফিরিয়ে বসিরকে চিনতে পারলে।

ইতিমধ্যে একটা লোক মশাল জ্বালিয়ে ফেলেছে। তখন আর কোন কিছুই গোপন করা গেল না।

তফন রসিকতা করে বল্লে, আরে মিঞা, ডাকাতি আমি করবো কেন ? ডাকাতি করছ তুমি। সোনা-দানা টাকা কড়ি দিয়ে হিঁদুদের পাঠিয়ে দিচ্ছ বাইরে। ও সব সম্পত্তি ত' আমাদের পাওনা। বেইমানী করে তোমার কি লাভটা হচ্ছে ভাই দোস্ত ? তুমি বরঞ্চ আমাদের হাতে হাত মেলাও—যা জোটে তার ভাগ নাও।

বসির তফনকে কাছে ডেকে বসালে। বল্লে, দোস্ত্, তামাক খাও। তফন খুশী হলো। গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতে লাগ্‌লো নায়ের পাছা গলুইয়ে বসে। বসিরের দেখে শুনে মনে হল তফনই দলের দলপতি। কেন না সে বসে বসে হুকুম করছে—আর সেই হুকুম তামিল করবার জন্যে রয়েছে বহুলোক।

বসির বুঝ্‌লে, তামাকের নেশাটা বেশ ধরেছে। আর হবেই বা না কেন। সারাদিন পাগলের মতো ছুটোছুটি করলে দেহ এলিয়ে যায়। তখন আস্তে আস্তে কথাটা পাড়লে। বল্লে, দোস্ত, এক দুঃখী হিঁদু পরিবারকে আমি পৌঁছে দিচ্ছি। আমার দুদ্দিনে ওরা উপোসের হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছে। তুমি আমার দোস্ত্। তাই তোমার দুটি হাত ধরে বল্‌ছি ওদের প্রাণে মেরোনা। টাকাকড়ি যদি কিছু থাকে নিয়ে নাও তুমি, আমি আপত্তি করবো না।

হুঁকোয় একটা জোর টান দিয়ে তফন মিঞা জবাব দিলে, আচ্ছা ভাই দোস্ত্। এক সঙ্গে ছেলে বেলায় একই ওস্তাদের কাছে লাঠি ঘুরিয়েছি—তোমার কথা আমি রাখবো। তারপর হুঙ্কার দিয়ে বল্লে,

ওরে, তোরা থাম্। এ আমার পুরোনো দোস্ত। ওর নৌকোয় কোন ঝামেলা আমি করবো না। তারপর নৌকার ভেতরের মানুষগুলিকে উদ্দেশ করে কইলে, ওগো ভালো মানুষের মেয়ে,— টাকাকড়ি যা আছে বাইরে ফেলে দাও—আমরা মানে মানে সরে পড়ছি।

ফটিক হাত বাড়িয়ে একশ' টাকার নোটের বাণ্ডিলটা এগিয়ে দিলে

তখন ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে হুকুম দিলে, ওরে তোরা সব নৌকো সরিয়ে নে। তারপর হনুমানের মতো একটা লাফ দিয়ে আর একটা নৌকোয় গিয়ে উঠ্‌ল। দেখতে দেখতে সবগুলি নৌকো নদীর পথে দূরে কোথায় মিলিয়ে গেল।

এক পা দু'পা করে ফটিক তখন বাইরে এসে বসিরের কোলের কাছে বস্‌ল।

বসির কিছু বল্‌লে না, শুধু তার মাথায় নীরবে একটা হাত রাখলে।

এই ভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল।

নদীর ঢেউগুলি এসে ডিঙিটাকে আঘাত করছে- তার ছলাৎছল একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাথার ওপর আকাশে লক্ষ তারা পিদিম জ্বালিয়ে বসে আছে। আশে-পাশে সামনে পেছনে কিচ্ছু চোখে দেখা যাচ্ছে না। বসির মিঞা সেই অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে রেখে কঠিন হাতে হাল ধরে বসে আছে।

ফটিকই প্রথম কথা কইলে।

বল্লে, ওরা মানুষ খারাপ না। কি বলো বসির ভাই? তুমি বল্লে অম্‌নি আমাদের কিচ্ছু না করে চলে গেল। গায়ে হাতটি অবধি তুল্‌লে না! লোক যদি ভালো হয় তবে তাদের বুঝিয়ে বল্লে কথা শোনে। তাই না বসির ভাই?

হাল ধরা অবস্থায় অন্ধকারের ভেতর থেকে বসির শুধু বল্লে, হুঁ।

খুকু যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে—সে কথা ফটিকের মনেই নেই। সে ভাব্‌লে ছইয়ের নীচে তার মাও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু মা তখন ছেলে-মেয়ের কল্যাণে কেবলি দুর্গা নাম জপ করে চলেছে—সে কথা একমাত্র অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেউ জানে না!

আরো কিছুক্ষণ এইভাবে কাটলো।

ফটিকের মনে হল এই নৌকোর মানুষগুলির বুঝি কথা বলবার কোনো ক্ষমতা নেই! হয়ত তারা রূপকথার রাক্ষস পুরীর মতো সব পাষাণ হয়ে গেছে!

হঠাৎ বসির মিঞার ডাকে সবাই চমকে উঠ্‌ল।

বসির মিঞা বল্লে, আর ভয় নেইরে ফটকে। ওই যে ফ্ল্যাটের আলো দেখা যাচ্ছে। ওইখানে এসেই অনেক রাত্তিরে ইষ্টীমার ভেড়ে। এখন আমি নৌকো ইষ্টীশনে লাগাবো না, তা হলে দশজনে দশ কথা জিজ্ঞেস করতে সুরু করবে। একটা ঝোপের মধ্যে নাও সেঁধিয়ে রেখে দোবো। তারপর যখন ইষ্টীমার ছাড়বার সময় হয়ে আস্‌বে—আমি নিজে গিয়ে তোদের তিনজনকে তাব ওপর তুলে দিয়ে আস্‌বো। দেখি কোন শালা আমারে আটকায়।

ফটিকও খুব খুসী হয়ে উঠল।

জীবনে এর আগে গাঁয়ের বাইরে আসেনি, ষ্টীমার দেখেনি ; রেলগাড়ীর ছবি শুধু ভূগোলের পাতাতেই দেখেছে। কত বড় দুর্ভাগ্যের পথ বেয়ে যে সে এগিয়ে চলেছে--মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কথা যেন ফটিক ভুলে গেল। তার ছোট মগজে কেবলি গুঞ্জন করে ফিরতে লাগ্‌লো যে বসির মিঞা গভীর রাত্রে তাদের ষ্টীমারে চাপিয়ে দেবে—অজানা পথে তারা পাড়ি জমাবে, তারপর কোন ঘাটে নেমে যে রেলগাড়ীতে উঠতে হবে সে কথা গল্পের রাজপুত্রের কাহিনীর মতোই রোমাঞ্চকর।

বসির মিঞার যে কথা সেই কাজ।

স্টেশন থেকে খানিকটা তফাতে একটা ঘন ঝোপের ভেতর সে সবার চোখ এড়িয়ে ছোট্ট ডিঙি নাও খানি সেঁধিয়ে দিলে।

মা অন্ধকারে বসেই শ্রীদুর্গার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লে। খানিকক্ষণের জন্য একেবারে নিশ্চিন্ত। তারপর গভীর রাত্রে ভাগ্যকে সাথী করে এই বিশাল জগতে যে নৌকো ভাসিয়ে দিতে হবে কোথায় তার শেষ—কোথায় তার সীমা কিচ্ছু জান্‌তে তার মন চাইছে না। শুধু প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছে—কত ক্ষণে এই পাপের রাজ্য ছেড়ে দূরে—আরো দূরে চলে যাওয়া যায়!

ফটিকের চোখেও আজ রাত্রে ঘুম নেই।

সে শুধু ফ্লাটের আলোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে পথ মৃত্যুর পথ নয়—সে পথ হচ্ছে জীবনের পথ। সেই পথ ধরে সে যদি ঠিক চলতে পারে তবে তার মার জীবন রক্ষা হবে, ছোট বোনটিকে বাঁচাতে পারবে—আর ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বিশ্বের দরবারে।

কত রাত্তিরে ষ্টীমার আস্‌বে কে জানে!

লোকজন ক্রমে ক্রমে নদীর ধারে ভীড় করছে।

নৌকোর ভেতর বসে ফটিক তাই দেখ্‌তে লাগ্‌ল:

অথর্ব্ব বুড়ী, জোয়ান মানুষ, কোলের ছেলে, আধ বয়েসী গিন্নি-বান্নি, প্রচুর মোটঘাট নিয়ে ভূঁড়িওয়ালা লোক, সর্ব্বহারা রিক্ত পথের ভিখিরী সবাই এসে জুটেছে এই নদীতীরে।

তাদের হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে নদীর এপারে যত দুঃখ-দৈন্য-বেদনা—আর নদীর ওপারে—আশা, আনন্দ, আশ্রয়!

অনেকে অধৈর্য্য হয়ে নদীর ধারেই সতরঞ্চি বিছিয়ে, মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। তারা ভরা আকাশের নীচে একটি প্রাণীও বোধ করি

জেগে নেই···সব যখন নিঝুম হয়ে এলো—হঠাৎ কিসের যেন সোরগোল শোনা গেল!

ব্যাপারটা সকলে ভালো করে বোঝ্‌বার আগেই একদল গুণ্ডা শয়তান এসে হাজির হল।

মেরে-ধরে লুটপাট করে তারা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এমন নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি করলে যে, অনেকে সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাণ বাঁচাবার জন্যে।

ডিঙি নৌকোর ওপর স্থির হয়ে বসে ফটিক, বসির মিঞা আর মা এই দানবীয় তাণ্ডব দেখ্‌তে লাগ্‌লো। তিনজনের কারো চোখে ঘুম নেই। ভাগ্যিস খুকুটা সন্ধ্যে থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল! নইলে সে হয়ত এই কাণ্ড দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ত।

নদাতীরের আহত লোকদের হাহাকার তখনো মিলিয়ে যায়নি এমন সময় তাদের আর্ত্তনাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দূর থেকে ষ্টীমারের ভেঁপু বেজে উঠ্‌ল।

গুণ্ডার দল ষ্টীমারের বাঁশী শুনে শেষ দফা লুটপাট করে—সরে পড়ল।

ইতিমধ্যে যাদের পা কাটা পড়েছিল, মাথা ফেটেছিল, হাত ভেঙে গিয়েছিল তারাও বাঁচবার শেষ চেষ্টা করে নদীর ধারে এসে দলে দলে জড় হাতে লাগ্‌লো। তাদের সবাইকার চাপে নদীর একটা পাড় ধ্বসে পড়ল। তাতেই যে কতলোকের প্রাণ গেল সেটা হিসাব করে বলা শক্ত!

ইতিমধ্যে ষ্টীমার এসে ষ্টেশনে নোঙর করেছে।

এই ষ্টেশনে নাম্‌লো খুব সামান্যই লোক—কিন্তু ওপরে ওঠবার

জন্যে যে হুড়োহুড়ি আর মারামারি সুরু হয়ে গেল—তাতে সবাইকার মনে এই ভয় জাগ্‌ল যে, গোটা ষ্টীমারটাই না শেষ পর্য্যন্ত নদীর অতল জলে তলিয়ে যায় !

বসির মিঞা এতক্ষণ ধরে যাত্রীদের এই কাণ্ড দেখছিল। সে এইবার বল্লে দেখ্ ফটিক ভাই, জমি দিয়ে গেলে আজ কিছুতেই ইষ্টিমারে তোরা উঠ্‌তে পারবিনে। আমি আমার ডিঙি নিয়ে ইষ্টিমারের পেছন দিকে চলে যাচ্ছি—সেইখান থেকে তোদের কাছি ধরে উঠ্‌তে হবে। নইলে এই জন-মানুষ-শুন্যি চরে তোদের আমি কিছুতেই ধরে রাখ্‌তে চাইনে। কখন যে কী বিপদ হবে কেউ বল্‌তে পারে না !

বসির তার কথা মত ডিঙিটীকে নিয়ে আড়ালে আড়ালে ইষ্টিমারের পেছন দিকে নিয়ে হাজির করালে। বসির বল্লে, মা-ঠাকরুণ, তুমি আগে কাছি ধরে কষ্ট করে উঠে পড়ো। তারপর খুকুকে আমি উঁচু করে ধরবো—তুমি কোলে তুলে নেবে। ফটিকের জন্যে আমি কিচ্ছু ভাবিনে।

ফটিক আর বসিরের সাহায্যে মাকে অনেক কষ্টে ওপরে ঠেলে তুলে দেয়া হল। ঘুমন্ত খুকুকে এইবার বসির উঁচু করে ধরলে। মা দুদিন কিছু খায় নি। তার হাত কাঁপতে লাগ্‌লো। ছোটরা ঘুমিয়ে পড়লে ভারী হয় বেশী। মার হাত থেকে খুকু হঠাৎ ফস্কে পড়ে যাচ্ছিল—এমন সময় ষ্টীমারের একটি জোয়ান যুবক চট্ করে ছুটে এসে খুকুকে ধরে ফেল্লে। নইলে সে নিশ্চয়ই নদীর জলে পড়ে যেত ! ওদিকে ষ্টীমার ভেঁপু বাজিয়ে দিয়েছে। বসির তাড়াতাড়ি

ফটিককে কাঁধে করে তুলে দিলে। ফেনার নাচন তুলে ষ্টীমার তীর ছেড়ে দূরে চলে যেতে লাগ্‌লো—

বসিরের ডিঙিটী মোচার খোলার মতো আছাড়ি-পিছাড়ি করতে লাগ্‌লো। কিন্তু তার মুখে তৃপ্তির হাসি; তুই চোখে জল টলটল করছে!

বাইশ

যে জোয়ান যুবকটি খুকুকে নদীতে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল—সেই মাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটি কম্বলের ওপর বসালে। বল্লে, আমি আপনার মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আপনি না খেয়ে রয়েছেন। এই কম্বলটার ওপর শুয়ে পড়ুন, আমি কিছু ফল আর মিষ্টি নিয়ে আস্‌ছি।

মা ব্যস্ত হয়ে উত্তর দিলে, না বাছা, আমার জন্যে তোমার কষ্ট করতে হবে না। তুমি যে আমার খুকুর প্রাণ রক্ষা করেছ···এই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

জোয়ান ছেলেটি কিন্তু মায়ের কথায় কান না দিয়ে বল্লে, আপনি মা হয়ে ছেলের কাছে কেন মিছিমিছি কুণ্ঠিত হচ্ছেন? মনে করুন না কেন,—আমি আপনার বড় ছেলে!

এর পর আর কথা কাটাকাটি চলে না।

জোয়ান যুবক তাড়াতাড়ি চলে গেল—ফল মিষ্টি নিয়ে আস্‌তে।

তিনজনে বসে কম্বলে ধুঁক্‌ছে।

এম্‌নিতেই ত' তারা প্রায় মরে আছে। তারপর নদীর

হাওয়া আর দুশ্চিন্তায় পেট যেন দাউ-দাউ করে জ্বল্‌ছে। একের পর এক যে বিপদের ঝাপটা মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে—তার ফলে বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে যাবার মতো। তারা সত্যি বেঁচে আছে কিনা—ক্ষিদে পেয়েছে কিনা—তার বোধ শক্তিও ধীরে ধীরে যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে!

খুকুটা জলে পড়তে গিয়ে আচম্‌কা জেগে উঠেছিল—কম্বলের ওপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

এইবার ফটিক আশে-পাশে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লে। ছেলে-বুড়ো-কাচ্চা-বাচ্চা যেন গোটা ষ্টীমারের ওপর থৈ-থৈ করছে। আগেকার গ্রামের জীবন হলে—ওরা হয়ত রসিকতা করে বল্‌ত—একেবারে মাছ পাতুরী! কিন্তু রসিকতা কি সত্যি তাদের জীবনে আর আছে? সব যেন শুকিয়ে বাষ্প হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেছে!

ওদের জোয়ান দাদা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কোত্থেকে ফল, মিষ্টি কিনে নিয়ে এলো; আর সেই সঙ্গে জোগাড় করে আন্‌লো—এক ভাঁড় খাঁটি দুধ। মা কিছুতেই মুখে দেবেন না,—আর তার বড় ছেলে জোয়ান দাদা কিছুতেই ছাড়বে না। এই নিয়ে একেবারে যেন টাগ্‌-অফ্‌-ওয়ার বেঁধে গেল!

জোয়ান দাদার জুলুমের কাছে সবাইকে হার মান্‌তে হল। প্রথমে সে খুকুকে ঘুম থেকে তুলে মিষ্টি আর দুধ খাইয়ে দিলে। মাকেও দুধ, মিষ্টি, ফল খেতে হল। তারপর আবার মায়ের অনুরোধে জোয়ান দাদা আর ফটিককে বাদ বাকি খাবারগুলি শেষ করতে হল।

ষ্টীমার এখন মাঝ নদীতে। রাত্রি গভীর হয়ে উঠেছে—দূর থেকে খালাসীদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে—এখানে তাল মেলে না! নদীর

জলের ফ্যানা—অন্ধকারের ভেতর মাঝে মাঝে চিক্ চিক্ করে উঠ্ছে। কোন অসীম শূন্যে একটা গাঙ্ চিল হয়ত তার সাথীকে হারিয়ে করুণ কণ্ঠে চীৎকার করছে—বাসায় ফিরতে তার মন চাইছে না। তাই বুঝি নিশীথ রাতের অন্ধকারে কেঁদে কেঁদে ফিরছে।

ষ্টীমারের চলাচলের সময় লোহার ভারী শেকলটা থেকে থেকে ঝন্ ঝন্ করে উঠছে। সেই শব্দ শুনে ফটিকের কেবলি মনে হচ্ছে—অনেক অসহায় মানুষের পায়ে বেড়ি দিয়ে বুঝি তাদের অন্ধ কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

মা চোখ বুঁজে এক কোণে পড়ে আছে। ঘুমিয়েছে কিনা দেখে বোঝবার যো নেই। খুকু সেই দুধ মিষ্টি খেয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকালে ভয় হয়! সে সত্যি বেঁচে আছে কিনা এই সন্দেহ মনে জাগে।

ঘুম নেই জোয়ান দাদা আর ফটিকের চোখে।

ওরা দু'জনে শুধু এপাশ-ওপাশ করছে।

জোয়ান দাদা এক সময় ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, ফট্কে, এই ফাঁকে খানিকটা ঘুমিয়ে নে। নইলে শেষ রাত্তির থেকে আবার হল্লা সুরু হবে। ষ্টীমারে মাছ চালান দেবে একটা ষ্টেশনে।

আবদারের সুরে ফটিক জবাব দিলে, ঘুম যে কিছুতেই আস্ছে না দাদা, মনে হচ্ছে—চোখের ভেতর কে যেন লঙ্কার গুড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে।

জোয়ান দাদা আর কিছু বলেনি, চুপচাপ মরার মতো পড়ে আছে। ষ্টীমারের ওপর আস্তে আস্তে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল—তখন আর একদল নিশাচর লোকের কাজ সুরু হয়ে গেল।

অতি চুপে-চুপে কতকগুলি ছায়া-মূর্ত্তি ঠিক প্রেতের মতোই ডেকের ওপর আনাগোনা স্থরু করে দিলে।

এরা যাত্রীদের মোট-ঘাট থেকে চট্‌পট্‌ নানা জিনিষ সরিয়ে আবার পর মুহূর্ত্তেই ঘুমের ভান করে এক ধারে নির্জীবের মতো পড়ে থাকে। তখন মনে হয় এদের ওপর বোমা ছুঁড়লেও কেউ টুঁ শব্দ করবে না।

জোয়ানদা চুপ্‌চাপ সব কিছু দেখ্‌ছিল—চোখ ছুটি আধ বোজা রেখে।

একটি প্রেত কালো-আলোয়ানে মুখটা ঢেকে খুকুর কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর হাতের খেলো বেলোয়াড়ী চুড়িগুলি ক্ষীণ চাঁদের আলোয় চিক্‌ চিক্‌ করছিল। নিশীথ রাতের প্রেত ভেবে নিয়েছে এ সোনার চুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন নীচু হয়ে তাতে হাত দিতে গেছে অমনি জোয়ান দাদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রেতের ঘাড় ধরে ছুটো শক্ত রদ্দা বসিয়ে দিলে।

তিন চারটে ডিগ্‌বাজী খেয়ে সেই নিশীথ রাতের প্রেত যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল তার আর হদিশ পাওয়া গেল না।

আবার কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ! একটা ছুঁচ পড়লেও বোধ করি সে আওয়াজ শুন্‌তে পাওয়া যাবে এমনি কঠিন-শীতল নীরবতা।

শুধু ষ্টীমারের বুকের ক্ষীণ ধুক্‌ধুকির শব্দ কান পাত্‌লে শোনা যায়।

হঠাৎ ষ্টীমারের অন্য একটি কোন থেকে একটি মেয়ের বুক ফাটা চীৎকারে সমস্ত ঘুমন্ত লোক একেবারে সচকিত হয়ে উঠ্‌লো।

—কেউ মেরে ফেল্লে নাকি মেয়েটাকে?

—কি হয়েছে? কি হয়েছে?

শত কণ্ঠে উঠ্‌ল ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে মেয়েটি যা বল্লে, তাতে বোঝা গেল খবর সত্যি সাঙ্ঘাতিক।

স্বামী-স্ত্রী আর সঙ্গে একটি ছোট্ট ছেলে।

জমি-জমা বিক্রী করে এখান থেকে চলে যাচ্ছিল সঙ্গে বেশ কিছু টাকা ছিল। এক মুসলমানের দোকানে চিড়ে কেনবার সময় অনেকেই সঙ্গের নোটের গোছা দেখে ফেলেছিল। গভীর রাত্রে ষ্টীমারের খালাসীরা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে বিড়ি টানার ছুঁতো করে ওকে ডেকে নিয়ে যায়। একটি চীৎকার শুনতে পেয়েছিল মেয়েটি। ছুটে সে দিকে যায়। কিন্তু খালাসীর দল মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে। নোটের তাড়া কেড়ে নেবার সময় লোকটা আপত্তি জানিয়েছিল। তখন সবাই মিলে জাপটে ধরে তাকে বয়লারের গনগনে আগুনে ঠেলে দেয়। ঠেলে দেবার সময়কার চীৎকারেই মেয়েটি সচকিত হয়ে ছুটে যায়। কিন্তু অসহায় মেয়ে কিছুই করতে পারেনি। শুধু চকিতে দেখেছিল তার স্বামী একবার জীবনের আশায় হাত দুটি ওপরে তুলে গনগনে-চুল্লিতে একেবারে ছাই হয়ে গেল! কোনো চিহ্নই আর তার রইল না।

যাত্রীরা বেশীর ভাগই ওদেশ থেকে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচে, তাই এতবড় অত্যাচারের কথা শুনেও কেউ বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারল না। অন্য কোনো সময় হলে সারা ষ্টীমারের লোক খালাসীদের মেরে গুঁড়িয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিত। কিন্তু আজ সবাই অন্যায় দেখেও চোখ বুঁজে থাক্‌তে চায়, পাছে অজান্তে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ে!

ষ্টীমার শুদ্ধু লোক একেবারে নিঝুম হয়ে পড়েছে। শুধু ইঞ্জিনের ধুক্‌পুকুনিটা ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছে। কেউ ভয়ে টু শব্দটি পর্য্যন্ত করছে না—পাছে তার কপালেও এই জাতীয় কোনো বিপদ ঘটে!

মা চোখ বুঁজে শুয়ে শুয়ে ভাবছে,—অকুল পাথারে সবাই শুধু হাবুডুবু খাচ্ছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আস্‌ছে—নিঃশ্বাস নেবার অবকাশটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না! দম আট্‌কে যাচ্ছে ধীরে ধীরে;—এইবার শীতল জলের একটা স্রোত কপালের ওপর দিয়ে যেন বয়ে চলেছে। মাথার সমস্ত যন্ত্রণার বুঝি এখন অবসান হবে। মা হাত বাড়াল নিজের ডাইনে বাঁয়ে! কোলের ছেলে মেয়ে দুটি বুঝি ঢেউয়ে ভেসে গেছে! কাঁপা কাঁপা আঙুলগুলো খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লো ওদের দুটিকে। কিন্তু কোন্ স্রোতের টানে কোথায় ভেসে গেছে তারা—কে হদিশ দেবে?

একটা দারুণ কোলাহলে মায়ের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল। যাত্রীদের মধ্যে কোলাহল আর উত্তেজনা দেখা দিয়েছে কেন?

কয়েকটি উৎসাহী তরুণ খবর নিয়ে এসে বল্লে, সারেঙ আর খালাসীদের মধ্যে লোভ আর হিংসার প্রবৃত্তি আসুরিকভাবে জেগে উঠেছে! তারা মাঝ দরিয়ায় সবার অজান্তে ষ্টীমার নোঙর করেছে। বল্‌ছে, যার কাছে যা' আছে সব দিয়ে দাও। নইলে দা' দিয়ে কুপিয়ে মারবো, লাঠি দিয়ে মাথা ফাটাবো, আর না হয়—গন্‌গনে বয়লারে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

মা আঁৎকে উঠে বল্লে, তাহলে উপায়? আমার ছেলে-মেয়েকে আমি কি করে বাঁচাবো?

জোয়ান দাদা জবাব দিলে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না মা! সবাই ত'

রয়েছি···একটা বিহিত অবশ্যই করবো আমরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতগুলি লোক কচুকাটা হবো না ত' !

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কচুকাটাই স্বরু হয়ে গেল।

খালাসীর দল কোমরে গামছা বেঁধে লোহার ডাণ্ডা, দা, কুড়ুল প্যাকিং বাক্সের খণ্ড-খণ্ড কাঠ যা' হাতের কাছে পেলে নিয়ে আরোহী-দের মাথায় এলোপাথাড়ি মারতে স্বরু করে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লো জিনিষ-পত্র লুট।

জোয়ান দা' জনাকয়েক গাট্টা-গোট্টা ছেলেকে জুটিয়ে নিয়ে প্রথমে চায়ের দোকানের বেঞ্চগুলি ভেঙে হাতিয়ারের ব্যবস্থা করলে। তারপর মার-মার শব্দে খালাসীদের সঙ্গে তুমুল লড়াই স্বরু করে দিলে।

যারা মারে—আর যারা মার খায়—এই দুই দলের মাথা ফেটে, হাত ভেঙে, গায়ে চোট লেগে এমন রক্তারক্তি কাণ্ড স্বরু হল যে, সেদিকে দু'চোখ মেলে তাকানো যায় না !

এত কাণ্ড করেও কি শেষ পর্য্যন্ত ছেলে-মেয়ে দুটিকে বাঁচানো যাবে না ? মার সারা গায়ে যেন হাজার হাজার বিছে কাম্‌ড়াতে স্বরু করলো।

ততক্ষণে গোটা ষ্টীমার জুড়ে একেবারে রক্ত-গঙ্গা বয়ে চলেছে। আরোহীরা ত' আগে থেকে এই দাঙ্গার জন্যে তৈরী ছিল না ! আর তা ছাড়া নিজের নিজের ছেলে-পিলে, বৌ-ঝি, মোট-ঘাট্ সাম্‌লাতেই তারা ব্যস্ত !

হঠাৎ মায়ের মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল।

এই রক্ত-গঙ্গার স্রোত থেকে তার ছেলে-মেয়ে দুটিকে কোনো মতে কি বাঁচানো যায় না!

একটা ক্ষীণ আশা জেগেছে মায়ের মনে।

দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ষ্টীমারের ওপরকার কতকগুলি আলোর বাল্‌ব ভেঙে গেছে। তারি ফলে একটা দিক একেবারে অন্ধকার।

মা ঠিক করলে, এই অন্ধকার ওদের পরম বন্ধু। তার সুযোগ যে করে হোক নিতেই হবে।

ঘুমন্ত খুকুটাকে কোনো রকমে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ফটিকের হাত ধরে মা ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, আমার সঙ্গে আয়—

ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে ফটিক জবাব দিলে, কোথায় মা?

মা বল্লে, চল, আমরা অন্ধকারে গুড়ি মেরে—ষ্টীমারের পায়খানার ভেতর লুকিয়ে থাকি গে। এছাড়া তোদের প্রাণ বাঁচাবার কোন উপায় নেই।

মা ভাবছে, ছেলে মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে হবে;—আর ছেলে মনে মনে বুদ্ধি আঁটছে—মাকে কি করে রক্ষা করা যায়!

তিনজনে নিঃশব্দে একটি পায়খানায় গিয়ে ঢুকলো। কাঠের পার্টিশন। একটা জায়গায় ছ্যাদা আছে।

মার শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে—তবু সেই ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল বাইরে কি ঘটে দেখ্‌বার জন্যে।

গুণ্ডা খালাসী-সারেঙদের সঙ্গে কি করে এঁটে উঠ্‌বে—এই ছা-পোষা ভদ্রলোকের দল?

শেষ পর্য্যন্ত তাই তাদের কচুকাটাই হতে হল!

এক-একটা নৃশংস অত্যাচার মা চোখে দেখে আর তার বুকের মধ্যে কাঁপুনি লাগে !

নিজের গ্রামের দুর্গাপূজার সময়কার পাঁটা বলির কথা তার মনে হতে লাগ্‌লো। সারা গ্রাম বলির রক্তে লাল হয়ে ওঠে। আজ এই অভিশপ্ত রাত্রে কত নিরীহ প্রাণীর রক্তে যে ষ্টীমারের ডেক্ ভেসে গেল কে তার হিসেব রাখ্‌বে !

ষণ্ডা-ষণ্ডা খালাসীরা আগে মৃতদেহগুলি ধরাধরি করে ঝপাং ঝপাং নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগ্‌লো। রক্তে তাদের দেহও লাল হয়ে উঠেছে। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল,—দয়া মায়া প্রীতি বলে কোনো সুকুমার বৃত্তি ওদের হৃদয়ে নেই ! ওরা কোনো মায়ের কোলে মানুষ হয়নি, কোনো স্নেহের নীড় তাদের নেই, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এমন কেউ এই পিশাচদের নেই যারা মানুষকে আপনার বলে ভালোবাস্‌তে পারে !

দুর্দ্দান্ত খালাসীর দল তারপর বাল্‌তি বাল্‌তি জল ঢেলে গোটা ষ্টীমারটাকে ধুয়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো। এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের কোনো চিহ্ন তারা ডেকের ওপর রাখ্‌তে চায় না। রক্তের দুর্গন্ধে মায়ের বমির উপক্রম হতে লাগলো।

মাথাটা ঘুরতে লাগ্‌লো। মনে হল পায়ের নীচে কোনো নির্ভর নেই !

টলে গিয়ে মা সেই স্বল্প সরিসর যায়গার মধ্যেই মুচ্ছিতা হয়ে পড়ল !

তেইশ

ফটিক কিন্তু চুপ্‌চাপ বসে নেই।

মা জ্ঞান হারিয়েছে।

সাময়িকভাবে সে জ্ঞান ফিরে না আসুক তাকে শুভ-লক্ষণ বলেই ধরে নেয়া যাবে। খুকুটাও ক্লান্তিতে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এক একবার মনে হচ্ছে যে ওর দেহে প্রাণ নেই।

নাকের কাছে আঙুল ধরলে ক্ষীণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অস্তিত্ব বোঝা যায়।

ফটিক একবার ভাবলে যে, পায়খানা থেকে বেরিয়ে কলে কোঁচাটা ভিজিয়ে এনে সেই জল মায়ের মুখে ঝাপ্‌টা দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌বে। কিন্তু কাজটাতে বিপদ আছে পদে-পদে।

ষণ্ডা খালাসীর দল রক্তের স্বাদ পেয়ে একেবারে মূর্ত্তিমান যমদূত হয়ে বসে আছে। দাঙ্গা আর রক্তারক্তির কোনো সাক্ষী-প্রমাণই ওরা জিয়িয়ে রাখতে চাইবে না! যদি কোনো রকমে ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারে যে, ওদের তিনটি প্রাণ ধুক্‌পুক্ করে এখনো বেঁচে আছে তবে ডাণ্ডার চোটে একেবার ঠাণ্ডা হয়ে যেতে খুব বেশী দেরী হবে না!

কাজেই মায়ের চেতনার জন্যে খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। হয়ত জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ যাবে। তার চাইতে আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে সময় নেয়া ভালো।

ফটিক সেই কাঠের ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

খালাসীদের ভেতর এইবার উন্মাদনাটা অনেক কমে এসেছে।

ক্লান্তিতে সবাইকার দেহগুলি পড়েছে ঝিমিয়ে। আর তারা বাল্‌তি বাল্‌তি জল টান্‌তে পারে না!

নিজের নিজের ডেরায় চলে গেল সবাই আরাম করে ঘুমুবে বলে।

ফটিক আপন মনেই হিসেব করে ঠিক করলে, আরো কিছুটা সময় নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

বেশ খানিকটা কেটে গেল!

চারিদিকে চুপচাপ নিঝ্‌ঝুম!

ষ্টীমারটা একটা জঙ্গলের ধারে নোঙর করে খালাসীরা সেই যে ঘুমুতে গেছে আর তাদের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না!

আজ সারাটা দিন গুণ্ডার দল বোধ করি ঘুমুবেই।

এ হয়েছে ভালোই! যাত্রী নেই যে ষ্টেশণে পৌঁছে দিতে হবে! প্যাসেঞ্জারের ঝামেলাই যদি না থাক্‌লো তবে চায়ের ষ্টলে, মুড়ি মুড়কির দোকানে—বাট্‌লারের আনাচে-কানাচে ভীড় জমাবে কারা?

অত বড় ষ্টীমারটা যেন প্রেতের হানাবাড়ী বলে মনে হতে লাগ্‌লো। রাত্তিরের কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেদের কলাগাছের পাঁটা বলির মতো যে এমন ছিনিছিনি খেলা চলতে পারে—একথা চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস করা শক্ত! আবোল-তাবোল কত কথাই ভাবছে ফটিক।

তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু! জট খুল্‌তে গেলে আরো বেশী করে পাকিয়ে যায়!

কাজ নেই এত বেশী ভেবে!

এক এক সময় ওর মনে হয় ভাগ্য ওদের যেখানে খুশী টেনে নেবার নিয়ে যাক্‌। নিজের জীবন সম্বন্ধে নিজের যেন কোনোই

ভাবনা চিন্তা নেই। নাটকের শেষ দৃশ্যে কি আছে কে জানে! যাত্রাগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, শেষ দৃশ্যে নারায়ণ বা ব্রহ্মা কমণ্ডলু থেকে শান্তি জল ছিটিয়ে আবার সবাইকে বাঁচিয়ে তোলেন।

কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে তেমন কোনো চাঞ্চল্যকর দৃশ্য কি সত্যি লুকিয়ে আছে? হঠাৎ উজ্জ্বল আলোকে দেখা যাবে সব চেনা মানুষ এক সঙ্গে এসে জড় হয়েছে?

*　　*　　*

এমন সময় ধীরে ধীরে মায়ের জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ না খুলেই মা বল্লে, ওরে রাজুর মা, কত বেলা হয়েছে? এখনো উঠোনে গোবর ছড়া দিবিনে?

ফটিক দেখ্‌লে মহা বিপদ!

মায়ের কথা যদি খালাসীদের কানে পেঁছয়—তবে সঙ্গে সঙ্গে সবাইকার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লে, মাগো, কথা বোলো না। আমরা খালাসীদের ভয়ে লুকিয়ে আছি চুপি চুপি!

ছায়াছবির মতো মায়ের মগজের ভেতর দিয়ে অনেকগুলি দৃশ্য তাড়াতাড়ি আনাগোনা করে গেল!

তাইত! ষ্টীমারের এক কোনে প্রাণের ভয়ে ওরা কুঁক্‌ড়ে আছে—ঝাটা-মেরে-তাড়িয়ে দেয়া আস্তাকুঁড়ের কুকুরের মতো।

তবু ত এক মুহূর্ত্ত বসে থাক্‌লে চল্‌বে না!

খুকুর এক রাশ কোঁক্‌ড়া চুল মায়ের আঙুলে জড়িয়ে যায়!

ওরাই ত পথের কণ্টক। ওদের জন্যেই আজ মায়ের মরেও সুখ নেই।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মা বড় বড় চোখে ইতি-উতি চায়।

ফিসফিস্ করে শুধোলে, রাক্ষসগুলো কি সরেছে রে ফট্‌কে ?

ফটিক মায়ের কানে-কানে জবাব দিলে, তাইত মনে হচ্ছে মা! সারারাত গুণ্ডামি করে এইবেলা ভোঁস্-ভোঁস্ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে!

তাহলে আর দেরী নয়—খুকুকে নিয়ে পালাই চল।

মার কণ্ঠে দারুণ উৎকণ্ঠা।

ফটিক বল্লে, আমিও সেই কথা ভাবছিলুম মা!

—আর ভাবাভাবির কি আছে? চল্, উঠে পড়ি—মা এই কথা বল্‌তে বল্‌তে কাঠের পার্টিশনটা ধরে মনের জোরে একেবারে উঠে দাঁড়ায়। ফটিকও আর কোনোমতে দেরী করতে চায়না। সে-ও নিঃশব্দে খুকুকে কোলে তুলে নেয়।

আঁধার রাতের নিশাচরের মতোই দু'জনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে।

জঙ্গলের পাশে ষ্টীমারটা ভেড়ানো আছে। আগেকার দিন হলে এই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ওদের বুকের রক্ত হিম হয়ে আস্‌ত। কিন্তু আজ লোকালয়ের মানুষদের পরিচয় ওরা পেয়েছে। তাই ওদের মনে জাগ্‌ছে একটি প্রবাদ—

"আপনার চাইতে পর ভালো—
পরের চাইতে বন ভালো।"

মানুষের মাঝখানে কুটির বেঁধেই ত' পরম আনন্দে প্রতিবেশী নিয়ে ওরা বাস করছিল। সেই প্রতিবেশীর মনের পরিচয় আজ তারা পেয়েছে। তাই ভাবছে,—লোকালয়ে যে আত্মীয়তা তারা পায়নি

হয়ত বনে তা’ খুঁজে পাবে। জঙ্গলের গাছ-লতা-পাতা-ফুল-ফল কি তাদের আপনার বলে কাছে ডেকে নেবে না? হিংস্র কুটিল চোখের শয়তানি ষড়যন্ত্র থেকে অরণ্যের বিটপী কি তার হাজার হাজার শাখা-প্রশাখা মেলে ওদের নিরাপদ আশ্রয় তৈরী করে দেবে না?

ভাবে আর ওরা পথ চলে!

যখন ওদের সত্যি হুঁস হল—পেছন ফিরে দু'জনে তাকিয়ে দেখ্‌লে ষ্টীমার ছেড়ে সত্যি তারা বনের মধ্যে এসে পড়েছে। ইতিমধ্যে বেশ রোদ উঠে গেছে বটে, কিন্তু বনের ভেতর দিয়ে পথ চলার ফলে আঁচ্‌টা অসহ্য হয়ে গায়ে বেঁধে না। এটা মস্ত বড় সুবিধে। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যত খুশী রাস্তা হাঁটো।

আরো কিছুটা চল্‌বার পর বেশ খানিকটা ফাঁকা।

খুকু এতক্ষণ ধরে দাদা আর মায়ের কোলে ভাগাভাগি করে আস্‌ছিল। বন-পথের ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘুম ওর ভাঙেনি।

এইবার বেশ একটু বেলা হতে ওর গরম বোধ হল। সঙ্গে সঙ্গে আমেজটাও গেল কেটে।

পিট্‌-পিট্‌ করে চোখ মেলে তাকালে খুকু।

তাইত! কোথায় এসে পড়ল তারা!

বসির মিঞার নৌকো থেকে যে ষ্টীমারে উঠেছিল—সে কথাটা ওর মনে আছে। তারপর সমস্ত ঘটনা যেন—আব্‌ছা-আব্‌ছা ভাসা-ভাসা! যেন ছেঁড়া-ছেঁড়া—টুক্‌রো-টুক্‌রো—এলোমেলো স্বপ্ন! এ উদ্দেশ্যহীন চলার কি আর শেষ নেই?

যদিও মায়ের কোলে আছে—তবু থেকে থেকে নিজেদের বাড়ীর জন্যে ওর ছোট্ট মন কেঁদে-কেঁদে উঠ্‌তে লাগলো।

মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে খুকু খানিকটা চুপচাপ পড়ে থেকে ভাবতে লাগলো, কেন তারা বাড়ী ঘর দোর ফেলে এমন ভাবে চোরের মতো পথে-বিপথে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে! কোনো জবাব মনের মধ্যে খুঁজে পেলে না!

হঠাৎ খুকুর মনে হল, তাইত! আমি বড় হয়েছি—তবু কেন মিছি-মিছি মায়ের কোলে উঠে পথ চল্‌ছি।

সত্যি ত! লজ্জারই ত' কথা!

খুকু তাই ঝুপ্‌ করে মায়ের কোল থেকে নেমে পড়ে বল্লে, বারে! আমি কেন কোলে চড়ে যাবো? দাদা ত' যায় না!

মা পথের মাঝখানে থম্‌কে দাঁড়ালো। তারপর ম্লান হাসি হেসে বল্লে, ওমা! তুই কখন জেগে উঠেছিস্‌! তাই বল! তা হলে চল আরো খানিকটা পথ আমাদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে।

ফটিক বল্লে, এই যায়গাটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা মনে হচ্ছে মা। বোধ করি আশে-পাশে কুঁড়ে বেঁধে কেউ থাকে। নইলে জঙ্গলের ভেতরে এত বেশী পরিষ্কার থাক্‌তে পারে না। পথগুলি দেখেছ? লোকের আনাগোনায় বেশ চওড়া হয়ে উঠেছে।

ফটিকের অনুমান যে মিথ্যে নয়—তা আরো কিছু দূর যাবার পর ঠিক বোঝা গেল।

বড় বড় কয়েকটি গাছের তলায় তুটি ছোট্ট পাতার কুটির। কুটিরের চারপাশ বেশ সুন্দর করে নিকোনো। যেন সিঁতুর টুকু পড়লে আল্‌গোচে তুলে নেয়া যায়!

মা বল্লেন, এই বনের মধ্যেও তা হলে মানুষ থাকে?

ফটিক একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলে, আশে-পাশে

কোনো প্রতিবেশী নেই বলে বোধ করি ওরা নিরাপদেই আছে। আবার আমাদের দেখে ভয় পেয়ে না যায়!

হঠাৎ একটি কুটিরের ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এলো এক বুড়ো আর তার সঙ্গে আধ বয়েসী একটি মহিলা।

বুড়ো বল্লে, তোমাদের দেখে ভয় পাবো কেন খোকাবাবু? পথ হারিয়ে এই জঙ্গলে এসে পড়েছ বুঝি?

আধ বয়েসী মহিলাটি এগিয়ে এসে মায়ের হাত ধরলে। বল্লে, এসে পড়েছ যখন—তখন আমাদের এই কুঁড়ে ঘরে যায়গা নিশ্চয়ই হবে। আমরা বাপ-বেটিতে এসে এখানে কুঁড়ে বেঁধেছি। বাবাকে বুড়ো মানুষ পেয়ে জ্ঞাতিরা সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছে। এই বনে এসে আমাদের ত' দিব্যি চলে যাচ্ছে। কাঠুরেদের কাছ থেকে চাল পাই, শাক-পাতা যা হয় ফুটিয়ে নি। দুটি পেট এক রকম চলে যায়। কিন্তু মনের শান্তি আমরা হারাই নি!

মায়ের দু' চোখ ভরা জল।

মা বল্লেন, তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, মনে তোমার শান্তি আছে! আমার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। না খেয়ে দু'চার দিন বেশ থাকতে পারি। শুধু আমার এই ছেলে-মেয়ের জন্যে তোমার একটু কষ্ট করতে হবে বাছা!

বুড়ো তখন ফোকলা দাঁতে রসিকতা করে জবাব দিলে, কোনো ভয় নেই মা! আমাদের যদি ক্ষুদ-কুড়ো জোটে তবে তোমার ব্যাটা-বেটি নিয়েই বা জুটবে না কেন! তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আপন মনে বল্লে, "জীব দিয়েছেন যিনি—আহার দেবেন তিনি!"

মায়ের বুক থেকে যেন একটা ভারী পাথর নেমে গেল। সত্যি তা হলে ভগবান আছেন! ছেলে মেয়ে তাহলে তার বেঁচে গেল। ভগবানই ত মাঝে মাঝে মানুষ সেজে মানুষের সঙ্গে ছলনা করতে আসেন!

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর বুড়ো হুঁকো টানতে টানতে

শুধোলে, হ্যাঁ মা, তুমি ছেলে মেয়ে নিয়ে অতি দুঃখে পথে বেরিয়েছ তা' বুঝ্‌তে পারছি। কিন্তু কোথায় তুমি যাবে—সে কথা ত একবারও বল্লে না! আমি তোমার বাপের বয়েসী—ওই মেয়েটা তোমার বোন। লজ্জা কি মা! কোথায় যাবে বলো—

মা খানিকটা চুপ করে রইল।

তারপর নখ খুটতে খুটতে জবাব দিলে, ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমি কল্‌কাতার দিকে যাবো বাবা। দেখি যদি কোনো আশ্রয় মেলে। তোমার এখানে কুঁড়ে বেঁধে থাক্‌বার আমার ভারী লোভ হচ্ছে। লোকালয়ের মানুষের মনের খবরও আমি কিছু কিছু রাখি। সেখানে ফেরবার আমার আর মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দানবের অত্যাচারে ঘর ছেড়ে আমি পথে পা বাড়িয়েছি। ওদের দুটিকে যে করে হোক্ আমায় মানুষ করে তুল্‌তে হবে। তার পরে আমার ছুটি'! আমি পথে বেরিয়ে বাপের আশ্রয় পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার থাক্‌বার যো' নেই।

বুড়ো ধরা গলায় জবাব দিলে, তোমার মনের দুঃখু আমি জান্‌লাম, তোমার প্রাণের বাসনাও আমি বুঝলাম। আমি আর তোমাদের ধরে রাখতে চাইবো না। এই ডান দিক দিয়ে যে রাস্তাটি বেরিয়ে গেছে—দু' মাইল হাঁটবার পর তোমরা পাবে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন। সেইখানে যে গাড়ী মিল্‌বে—তাই তোমাদের কলকাতায় নিয়ে যাবে--

কল্‌কাতার কথা মার মুখে শুনে ফটিক এই দুঃখের মধ্যেও উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ল। বল্ল, সেই ভালো মা! কল্‌কাতায় কত লোক কত চাকরী করে—, আমিও না হয় কোথায়ও একটি চাকরী

জুটিয়ে নেবো! তোমাকে আর খুকুকে ত' আমিই খাওয়াবো-পরাবো।

বুড়ো ফটিকের কথা শুনে ফোক্‌লা দাঁতে হাস্‌তে থাকে, বলে, এমন চাকুরে ছেলে থাক্‌তে তোমার ভাব্‌না কি মা!

মায়ের চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে।

সেইদিনই বিকেলবেলা মা ছেলে-মেয়ের হাত ধরে বনের আশ্রয়দাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা ষ্টেশনের পথে পা চালিয়ে দেয়।

চব্বিশ

পথটা নির্জ্জন।

লোকজন এক রকম চলে না বল্লেই হয়। মাঝে মাঝে দু'একটি রাখাল বালককে গরুর পাল নিয়ে অলস-মন্থর গতিতে যেতে দেখা যায়।

ফটিক শুধোলে, আচ্ছা মা, কল্‌কাতা যাওয়ার গাড়ী ক'টায় ছাড়ে তা'ত কিছু শুধোলে না?

মা জবাব দিলেন, সন্ধ্যের পর গাড়ী। ইষ্টিশনে গেলেই সব কথা জান্‌তে পারা যাবে।

খুকু তার মাথা নেড়ে পাকা গিন্নির মতো কইলে, আমায় কিন্তু আবার কোলে উঠ্‌তে বোলো না। এখন বড় হয়েছি আর কি কারো কোলে চড়া ভালো দেখায়?

মা মৃদু হেসে জবাব দিলেন, বেশ, তুমি হেঁটেই চলো, সেই

ভালো। কিন্তু খুকু যে বড় হয়েছে—সে কথা মাইল খানেক পথ চল্‌বার পরই বেমালুম ভুলে গেল! এমনভাবে মেঠো রাস্তা দিয়ে চল্‌বার অভ্যেস তার কোনো কালেই নেই। তাই খানিকটা ইতস্ততঃ করে বল্লে, আচ্ছা মা, কোনো একটা গাছের তলায় বসে একটু জিরিয়ে নিলে হত না!

মা মেয়ের মনের কথা বুঝ্‌তে পারলেন। তাই বল্লেন, একেবারে ইষ্টিশনে গিয়েই জিরিয়ে নেবো সবাই, তুই বরঞ্চ আমার কোলে ওঠ।

ফটিক বল্লে, না-না, খুকু আমার কোলেই চড়ুক। তুমি বরং ধীরে ধীরে হেঁটে এসো। রাত্তিরে ত' ট্রেণে তুমি কিছুই খাবে না! আমাদের জন্যে বুড়ো দাদু ন্যাক্‌ড়ায় মুড়ি বেঁধে দিয়েছে।

মা বিস্মিত হলেন—আবার খুশীও হলেন ছেলের কথায়। শুধোলেন, কখন আবার তোদের বুড়ো দাদু তোদের জন্যে মুড়ি দিলে? আমি ত' দেখ্‌তে পাইনি।

—আসবার সময় একটা পুঁট্‌লি লুকিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিলে যে! ফটিক জবাব দিলে বিজ্ঞের মতো।—পথ চল্‌লে এমন ক্ষিদে পায়—তাই আমি আর না করিনি।

মায়ের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

এই ফটিককে একদিন ঘরের গাইয়ের দুধের সন্দেশ সাধলেও সে অনেক সময় খেতে চাইত না। আজ কত যত্ন করে কটা মুড়ি নিয়ে যাচ্ছে!

ষ্টেশনের পথ যেন আর ফুরুতে চায় না!

এই কটা দিনে শরীরের ওপর দিয়ে ধকলও কম যায়নি। সেই সঙ্গে মনের কথা আর না তোলাই ভালো।

বুড়ো বলে দিয়েছিল বটে যে, ষ্টেশন দু'মাইলের পথ, কিন্তু কেবলি হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল—এ পথের বুঝি আর শেষ নেই!

অবশেষে দূর থেকে দেখা গেল সেই ইষ্টিশন। মাঠের মাঝখান দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো জমি ভেঙে তাদের পথ চল্‌তে হচ্ছিল। ওই ত' ষ্টেশন—এত কাছে দেখা যাচ্ছে—তবু তার নাগাল পাওয়া যায় না কেন? ফটিক আর খুকুর কাছে এটা যেন মস্ত একটা হেঁয়ালি!

মার চোখ কিন্তু চারদিকে ঘুরছে।

কোন দিক থেকে কী বিপদ আস্‌বে কে জানে!

অবাক হয়ে মা তাকিয়ে দেখলেন যে, পিঁপড়ের সারির মতো লোক মাথায় পুঁট্‌লি করে ইষ্টিশনের পথে যাচ্ছে। আস্‌ছে তারা নানা গাঁ থেকে। এত লোককে ষ্টেশনের পথে যেতে দেখে মায়ের মন ভারী দমে গেল। কল্‌কাতার গাড়ীতে ত' আর অফুরন্ত জায়গা নয়, এত লোক কি করে ধরবে সেই গাড়ীতে!

ষ্টেশনে পা দিতেই কোত্থেকে এক বুড়ো ছুটে এসে খুকুকে জড়িয়ে ধরে কান্না সুরু করে দিলেন।

মা ত' ব্যাপার দেখে অবাক!

বুড়ো বল্লেন, আমার ওই একই নাত্‌নী ছিল। তোমাদের খুকুর মতোই দেখ্‌তে। কালো কোঁক্‌ড়া চুল তার কাঁধের ওপর দুল্‌তো। মা নেই, বাপ নেই···আমিই তাকে মানুষ করছিলাম! দাদু আর নাত্‌নীর সংসার···কোনো ঝামেলা নেই—দিব্যি চলে যেতো। সারা জীবন ব্যবসা করে টাকাকড়ি মন্দ জমাই নি। ভেবেছিলাম আমার নাত্‌নীকে মানুষ করে, বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে একেবারে কাশী

চলে যাবো, কিন্তু শয়তানরা আমার সেই ফুলের মতো নাত্‌নীটিকে মেরে ফেলেছে।

বুড়ো সে কথা যেন বল্‌তে পারেন না। তবু বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে···শুক্‌নো ফাটা ঠোঁট দুটো থর্ থর্ করে কাঁপ্‌তে থাকে।

বুড়ো হয়ত টলেই পড়ে যাচ্ছিলেন; ফটিক তাকে ধরে ফেল্লে। শুধোলে, তুমি এখন কোথায় চলেছ দাদু?

বুড়োর চোখ দুটো আবার জলে ভরে এলো।

বল্লেন, তুই আমায় দাদু বলে ডাক্‌লি? ও-নাম ধরে আজ আর কেউ ডাকে না! কেউ এসে আমার পিঠের ওপর আর ঝাঁপিয়ে পড়ে না! একটু থেমে বুড়ো জবাব দিলেন, কোথায় আর যাবো! ভাব্‌ছি বিশ্বনাথের চরণের তলায় গিয়ে বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দেবো। সংসার আমার বিষ হয়ে গেছে। আমি ত' কারো কোনো ক্ষতি করিনি! তবু আমার কপালে এত দুঃখু লেখা ছিল! কে জানে পূর্ব্বজন্মে কী পাপ করেছিলাম।

বুড়োর দেহটা যেন সত্যি ভেঙে পড়ল।

প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর বসে পড়ে তিনি হাঁফাতে লাগ্‌লেন।

আর একটু দম নিয়ে বুড়ো উঠে বস্‌লেন। তারপর চোখের জল মুছে খুকুকে কোলে টেনে নিয়ে ফটিককে শুধোলেন, তা' তোমরা কোথায় যাবে বাছা? সঙ্গে কোনো ব্যাটা ছেলে নেই, জিনিষ পত্র নেই···কে তোমাদের নিয়ে যাবে শুনি?

ফটিকের কাছে বসে একে একে সমস্ত কাহিনী শুনে বুড়ো দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, আবার বুঝি বিশ্বনাথ আমায় সংসারের

পাকে জড়িয়ে দিলেন! নইলে তোমাদের সঙ্গেই বা আমার হঠাৎ দেখা হবে কেন? যাই হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা, তোমার ছেলেমেয়েকে মানুষ করবার ভার আমি নিলাম। ওরা আমার নাতি-নাত্‌নী, শেষ বয়সের সম্বল। সারা জীবন ধরে ক্ষুদ-কুড়ো যা জমিয়েছি—ওদের কাজেই লাগুক। ওদের সেবা করলেই বাল-গোপালের সেবা করা হবে।

মা কি কথা বল্‌বেন ভেবে পান না।

হাতে একটি পয়সা নেই যে, ছেলেমেয়েকে কল্‌কাতায় নিয়ে যান! ভগবানই বুঝি এমন করে ছদ্মবেশে এসে দেখা দিলেন।

বুড়ো ততক্ষণে তার নতুন পাওয়া নাতি-নাত্‌নীর সব ভার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। ষ্টেশনের খাবারওয়ালাকে ডেকে সন্দেশ আর দুধ কিনে দিলেন। মাকে বল্লেন, ওয়েটিংরুমে গিয়ে স্নান করে নিতে। ষ্টেশনের লাগোয়া ষ্টেশনারী দোকান থেকে তার নাতি-নাতনীর জন্যে দু'একটা জামা, ফ্রক্, হাফ্-প্যাণ্টও কিনে নিতে ভুল্‌লেন না।

নাতি-নাত্‌নীকে দু'পাশে নিয়ে বুড়ো মানুষ তাঁর নতুন পাওয়া মেয়ের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কইছেন।

মানুষের জীবনটাই যেন নদীর মতো। এক পাড় ভাঙে ত' আর এক পাড় গড়ে ওঠে। একদিন আগেও এরা কেউ কাউকে চিন্‌তেন না। কিন্তু এই কোলাহল মুখরিত প্ল্যাটফর্ম্মের সন্ধ্যায় মনে হচ্ছে যে, আবার এরা ভাঙনের কূলে দাঁড়িয়ে নীড় রচনার স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। মানুষ অতি বড় দুঃখের ভেতর দিয়ে কত সহজে মানুষকে আপনার করে নিতে পারে!

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এলো। দলবদ্ধ মানুষেরা গাড়ীর অপেক্ষায়

বসে থেকে থেকে প্ল্যাটফর্ম্মের চতুর্দ্দিকে যায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়ল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল একেবারে খোলা আকাশ তলে এলো-পাথাড়ি শুয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।

বুড়ো দাদু আর মায়ের কথাবার্ত্তাও ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এলো। এরা নিজের নিজের দুঃখের পাঁচালী পরস্পরকে শুনিয়ে যেন সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সময় আর কাট্‌তে চায় না। প্ল্যাটফর্ম্মের ওধারের একটি ডোবায় একটানা ব্যাঙ ডেকে চলেছে। আর ঝোপে-ঝাড়ে বন-বাদাড়ে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ঐক্যতান-বাদনেরও কামাই নেই। এমন সময় প্রেতের মতো একটি টিকিট চেকার বুড়ো দাদুর পেছনে এসে দাঁড়ালো।

ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, কল্‌কাতার গাড়ী আস্‌ছে আর আধঘণ্টা পরেই, ভীড় দেখ্‌ছেন ত? সাত দিন হয়ত এই প্ল্যাটফর্ম্মে পড়ে থাক্‌তে হবে। যদি উঠ্‌তে চান তবে নিরিবিলি আমার সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলুন। বুড়ো দাদু ব্যবসায়ী লোক। চিরকাল লোক চরিয়ে এসেছেন।

মুখ খুল্‌তেই তিনি মনের কথা বুঝ্‌তে পারেন।

ঘাড় নেড়ে তিনিও চাপা গলায় জবাব দিলেন, রাজি আছি··· কিন্তু আমাদের এই চারটি প্রাণীকে তুলে দিতে হবে।

আরো খানিকক্ষণ ধরে দু'জনের কি সব গোপন কথা হল। মা বুঝ্‌তে পারলেন যে, ইতিমধ্যে কয়েকটি নোট বুড়ো দাদুর ট্যাঁক থেকে টিকিট চেকারের প্যাণ্টের পকেটে চলে গেছে।

বুড়ো এইবার নিশ্চিন্ত মনে নিজের ছোট হুঁকো সাজিয়ে—গুড়ুক গুড়ুক তামাক টান্‌তে লাগ্‌লেন।

অবশেষে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করতে করতে যন্ত্র-দানব এক সময়ে ঠিক এসে হাজির হল। তখন লোকজনের চীৎকার, ছেলেমেয়ের কান্না, হারানো মানুষের ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতে কান পাতে কার সাধ্যি!

টিকিট কালেক্টরটি প্যাণ্টের পকেটে টাকা গুঁজেছিল বটে তবে সে তার কথা রেখেছে।

একটা চাবি দেয়া মধ্যমশ্রেণীর কামরা খুলে কোনো রকমে ঠেসে-ঠুসে চার জনকে সে জীবন্মৃত অবস্থায় তুলে দিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। তার তখনকার মুখের ভাব দেখে মনে হল বুঝি এইমাত্র সে ওয়াটার্লু যুদ্ধ জয় করেছে!

গাড়ীর ভেতরে তখন বুড়ো দাদু আর মা খুকু ও ফটিককে নিয়ে খাবি খাচ্ছেন বল্লেও বেশী বাড়িয়ে বলা হয় না। তার ওপর আশে পাশে ডাইনে-বাঁয়ে ক্রমাগত বাক্স, প্যাঁট্‌রা, বিছানা, ঝুড়ি, হাঁড়ি-কুঁড়ি এসে পড়ছে—ঠিক ভাদ্র মাসে গাছ থেকে তাল পড়ার মতো।

এই অসম্ভব ঠাসাঠাসির মধ্যেও আবার টিকিট দেখাবার পালা আছে। অনেককেই গাড়ী থেকে আবার নেমে যেতে হল সার্চ্চ করার পালা চুকিয়ে দিতে। তাদের আগেকার চেনা টিকিট চেকারটি আর একটি দশ টাকার নোটের বিনিময়ে সে বিপদ থেকেও অনেক কলা কৌশলে তাদের উদ্ধার করে দিলে।

গভীর রাত।

রণক্ষেত্রে ক্লান্ত সৈনিকের মতো সবাই ঝিমিয়ে পড়েছে। কথা কইবার উৎসাহ পর্য্যন্ত তাদের স্তিমিত হয়ে এসেছে। সবাইকার মনে দুঃখের ইতিহাস এতবেশী জমে উঠেছে যে, শোনাতে গেলে শ্রোতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবাই এক সঙ্গে হয়ত বুকের বোঝা

হাল্‌কা করতে চাইবে। তার চাইতে সবাই মিলে চুপ করে থাকা অনেক ভালো। ভবিষ্যতে কোনো বৃহত্তর জীবন-যুদ্ধের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করারও ত প্রয়োজন আছে।

তাই ঝড়ের আগেকার নিস্তব্ধতার মতোই সারা কাম্‌রার লোক বাক্যহীন!

বেঞ্চগুলির মাঝখানকার স্বল্প পরিসর যায়গায় নোংরা ন্যাকড়া পেতে দিয়ে এখানে ওখানে ছোট ছেলে মেয়েদের শুইয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মুখ চোখের দিকে তাকানো যায় না।

ঝড়ে ওড়া পাতার মতোই ওরা নিরস—শুক্‌নো! আবার নতুন কোনো গাছের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওরা কি ফুল ফোটাতে, ফল ধরাতে পারবে?

মায়ের মগজে আজ রাজ্যের চিন্তা।

বুড়ো দাদুর কাছে ছেলেমেয়েরা আশ্রয় পেয়েছে—এটা ওদের পক্ষে মহাভাগ্যের কথা! ফটিক তার এক পাশে মরার মতো চোখ বুঁজে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। মনে হয় এ রাজ্যের সমস্ত ভাবনা চিন্তা থেকে সে ছুটি নিয়ে বসে আছে। ওদিকে বুড়ো দাদুর কোলে খুকু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বুড়ো কিন্তু এত ভীড়ের মধ্যেও তার ছোট্ট হুঁকোয় গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টেনে চলেছেন। যেন কিছুই হয়নি··· তিনি তাঁর নিজের বাড়ীর দাওয়াতেই বসে আছেন—এমনি একটি নির্লিপ্তভাব এখন তার চোখে মুখে।

মন্থর গতিতে গাড়ী চলেছে।

কোনদিকে চলেছে, কোন ষ্টেশন ওরা ছাড়িয়ে এলো, কতক্ষণে ওরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবে—এ সম্পর্কে যেন কারো কোনো গরজ নেই।

পাছে বেশী হিসেবের মধ্যে গেলে আর একটা জোরালো বিপদ অজানা অঞ্চল থেকে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাই যাত্রীদলের এই বৈরাগ্য! যতক্ষণ সব কিছু ভুলে থাকা যায় ততক্ষণই ভালো। হঠাৎ কোথেকে
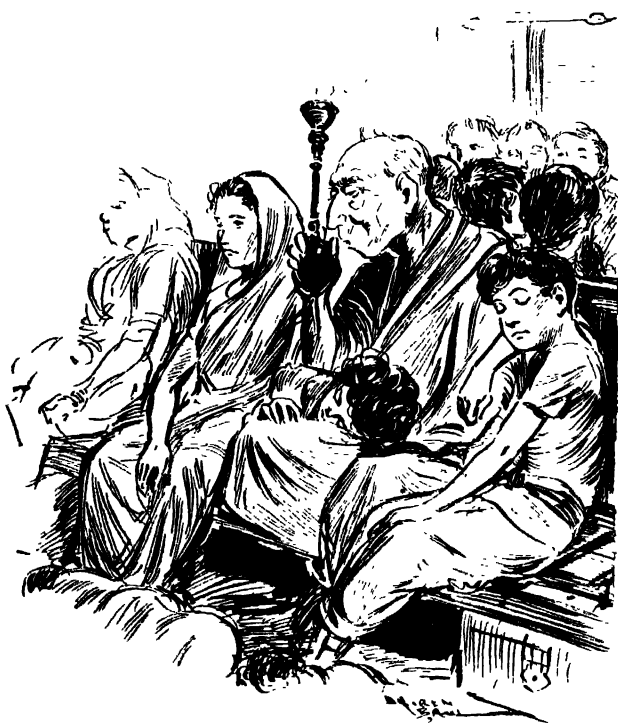
হাজার কণ্ঠের একটা চীৎকার ভেসে এলো। রাশি রাশি মশাল জ্বলছে চলন্ত ট্রেণের দুই পাশে। খ্যাচাং করে একটা ব্রিজের মাঝখানে গাড়ী সিটি বাজিয়ে থেমে পড়ল। তারপর যে কাণ্ড সুরু হল তা

যুদ্ধক্ষেত্রের চাইতেও ভয়ানক। সমরাঙ্গনে উভয় পক্ষই পরস্পরকে আক্রমণ করবার জন্যে উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু এখানে তার অবসর কোথায়? রাশি রাশি লোক লাঠি সোটা রাম দা বর্শা ইত্যাদি নিয়ে বানের জলের মতো সবগুলো কামরায় ঢুকে পড়ল। তারপর যাত্রীদের কোনো রকম কিছু বুঝে ওঠবার আগেই সুরু হয় কচুকাটা।

গুণ্ডারা আবার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে জ্যান্ত যাত্রী-গুলিকে ধরে ধরে জানালা গলিয়ে নীচেকার নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগ্‌লো। ব্রিজের লোহার ডাণ্ডায় লেগে অনেকের মাথা ফেটে দু'খান হয়ে গেল; আবার কেউ কেউ পড়ে গেল অগাধ জলে। কামরাগুলির মেঝেতে রক্ত গঙ্গা বইতে সুরু করল।

ইতি মধ্যে দুটো গুণ্ডা গোছের লোক কি করে বুঝ্‌তে পেরেছে যে, বুড়ো দাদুর কাছে অনেক টাকা পয়সা আছে। কঠিন হাতে তাঁকে ধরে ফেলে একজন হুঙ্কার দিয়ে বল্লে, ভালো চাস্ ত টাকার থলি বের কর্ বুড়ো, নইলে—

বুড়োও একেবারে নাছোড়বান্দা, ভালো মন্দ কোনো কথাই মুখে দিয়ে বের করতে চান না! টাকার থলি ত' দূরের কথা! গুণ্ডার দলও একেবারে মরিয়া! তাদের হাতে এতটুকু সময় নেই। একটা গুণ্ডার হাতের ডাণ্ডা বুড়োর মাথায় সজোরে এসে পড়ল। ফিন্‌কি দিয়া উঠ্‌ল তাজা রক্ত!

মা আর্ত্তনাদ করে আঁচলে চোখ ঢাক্‌লেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর দুটি রাম দা ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌ল ফটিক আর খুকুর ঘাড়ের কাছে। কিন্তু তার চাইতেও ক্ষিপ্রবেগে এক জোয়ান

মুসলমান ভদ্রলোক উভয়ের মাঝখানে পড়ে গম্ভীর গলায় হাঁকলেন—খবরদার !

গুণ্ডা দুটো ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল।

মুসলমান ভদ্রলোক চোখ পাকিয়ে বল্লেন, আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে তোমরা ছোট ছেলেমেয়ের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না !

ওদিকে ততক্ষণে মার থামিয়ে লুট সুরু হয়ে গেছে। গুণ্ডারা যে যেমন পারছে জিনিস পত্তর, বাক্স সুট্‌কেস, গয়না-পত্তর, টাকা কড়ি, ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলে।

ভদ্রলোক ফটিক আর খুকুকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, কোনো ভয় নেই তোমাদের, আমি ও কল্‌কাতা যাচ্ছি। তোমাদের পৌঁছে দেবো।

এই হট্টগোলে মা কামরার মেঝেতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন, ভদ্রলোকের আশ্বাসবাণী বোধ করি তাঁর কানে পৌঁছুলো না।

পঁচিশ

যখন জ্ঞান ফিরে এলো মা তাকিয়ে দেখ্‌লেন—গাড়ী অন্য একটা ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হয়েছে। ফটিক আর খুকু মেঝে থেকে পা তুলে জড়সড় হয়ে সেই মুসলমান ভদ্রলোকের পাশে বসে আছে আর তার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কি কথা কইছে।

নীচের দিকে চোখ পড়তে মা শিউরে উঠ্‌লেন !

রক্তে গাড়ীর মেঝেটা একেবারে ভেসে যাচ্ছে।

খানিক বাদেই কয়েকটি লোক বাল্‌তি নিয়ে কামরায় এসে উঠ্‌ল

তারপর বাথরুম থেকে বাল্‌তি বাল্‌তি জল নিয়ে মেঝেতে ঢেলে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো।

গোটা কামরায় একটি অস্বস্তিকর বিশ্রী গন্ধ। কাঠের পার্টিশন-গুলিতে তখনো রক্তের ছিটে লেগে রয়েছে। কিন্তু অতি নিপুণভাবে পরিষ্কার করবার সময় তাদের কোথায়? ঝাটা আর বাল্‌তি নিয়ে লোকগুলি নিঃশব্দে নেমে গেল! তাদের চোখ-মুখ দেখে মনে হল এই রক্তারক্তির কোনো প্রমাণ তারা গাড়ীর ভেতর রাখ্‌তে চায় না! কিন্তু মানুষের রক্তের ঢল যেখানে লেগেছে তার দাগ নিশ্চিহ্ন করা বড় সোজা ব্যাপার নয়।

মার মুখে আর কোনো কথা সরছে না!

মাথাটা কেবলি ঝিম্‌-ঝিম্‌ করছে। বুক আর কণ্ঠনালি ঠেলে কিসের একটা ডেলা যেন কেবলি বেরিয়ে আস্‌তে চাইছে। কিছু একটা বলতে গেলে শুধু ঠোঁট কেঁপে ওঠে আর চোখ দুটো যায় জলে ভরে!

এক এক সময় মায়ের মনে হতে থাকে—বুঝি তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে।

জগতে কি আর হাওয়া নেই!

ভালো করে চিন্তা করবার ক্ষমতাও বুঝি তাঁর লোপ পেতে বসেছে!

এমন সময় সেই মুসলমান ভদ্রলোক এই অসহনীয় নীরবতাকে ভেঙে দিয়ে কথা কইলেন। বল্লেন, সবাইকে আপনি এদের আচরণ দিয়ে বিচার করবেন না মা। মুসলমান সমাজে বহু ভালো আর সাধু লোকও আছে।

মৃদু কণ্ঠে মা উত্তর করলেন, তাঁর প্রমাণ ত' আপনি। আজ আপনি এই কামরায় উপস্থিত না থাক্‌লে আমার ছেলে-মেয়ে এতক্ষণ বেঁচে থাক্‌ত না।

লজ্জা পেয়ে ভদ্রলোকটি বল্লেন, না-না, আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি আবার একটা আলোচনার বিষয় নাকি ?

একটু চুপ করে থেকে মা বল্লেন, এই আমাদের গাঁয়ের কথাই ধরুন না কেন, কত আপনারজন ছিল তারা। কোত্থেকে বাইরের একটা কাল-বোশেখী ঝড় উঠ্‌ল একদিনে সব তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল। অথচ মজা দেখুন, সেই চরম বিপদের দিনে যারা আমাদের লুকিয়ে রাখ্‌ল তাদের গোয়াল ঘরে—তারাও মুসলমান। অশিক্ষিত ভাই আর তার বোন। কিন্তু তারাই হল আসল মানুষ।

মনে হল কথাটা শুনে মুসলমান ভদ্রলোক ভারী তৃপ্তি পেলেন। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপচাপ থেকে জবাব দিলেন, আমার কি মনে হয় জানেন ? এই চল্‌তি দুনিয়ায় দুই কিসিমের লোক আছে। একদল ভালো, আর একদল মন্দ। হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন এখানে একেবারে অবান্তর।

মা মৃদুকণ্ঠে বল্লেন, সত্যি তাই।

ইতিমধ্যে খুকু একটু উস্‌খুস্‌ করে মায়ের হাত ধরে টান্‌তে লাগ্‌ল।

সেটা ভদ্রলোকের চোখ এড়ায় নি !

বল্লেন, বুঝ্‌তে পেরেছি খুকু, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমার সঙ্গে খাবার আছে, কিন্তু তা ত' তুমি খাবে না। সাম্‌নের ষ্টেশনে ভালো সন্দেশ পাওয়া যায় তাই তোমাদের ভাই-বোনকে কিনে দেবো' খন।

মা যে ভদ্রলোককে পয়সা খরচ করে সন্দেশ কিনে দিতে বারণ করবেন—এ উপায়ও তার নেই। কেননা তিনি একেবার যাকে বলে কপর্দ্দকহীন।

এই কটা দিনের মধ্যেই মানুষের ঋণ যে কত বেড়ে গেল সেই কথা ভেবে তিনি আপন মনেই শিউরে উঠ্লেন।

কিন্তু এই ত' কাহিনীর শেষ নয়। দুঃখ-পথে এই ত সবে যাত্রা সুরু!

গাড়ী যে ভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে—কথা কিন্তু তেমন সহজ ভাবে এগোয় না।

কতকগুলি নিরীহ মানুষের তপ্ত রক্তের স্রোত সহজ মানুষের সহজ কথাকে কেবলি বাধা দিতে থাকে।

মা গুণে গুণে ওজন করে কথা বলেন আর ভাবেন, কখন কি বলে বস্বেন, তারই ফলে ছেলে-মেয়ের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠ্বে!

মুসলমান ভদ্রলোক অন্যদিক থেকে চিন্তা করেন, এমন কথা তার মুখ থেকে না বেরোয়—যা মায়ের মনে ব্যথা দিতে পারে?

কাজেই সুখ-দুঃখের কথা যেখানে স্বচ্ছ গতি খুঁজে পায় না ভাষা সেখানে আপনা থেকেই মন্থর হয়ে আসে।

গাড়ীর একটানা শব্দের মধ্যে আবার তারা নিঝুম হয়ে বসে থাকেন।

এর মধ্যে গাড়ী কখন পরের ষ্টেশনে এসে থেমেছে মা ঠিক ঠাহর করতে পারেন নি! তাঁর চমক ভাঙলো ভদ্রলোকের চ্যাঁচামেচিতে, চীৎকার করে তিনি ডাক্ছেন, এই মিঠাইওয়ালা, এদিকে—ট্রেনের বিভিন্ন কামরায় যারা তখনো প্রাণে বেঁচে নির্জ্জীবের মতো পড়েছিল এইবার তাদের হাঁক-ডাক আর চীৎকার শোনা গেল।

একদল লোক ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে মিঠাই ওয়ালাদের ছেঁকে ধরলো। তাদের কথা বল্‌বার পর্য্যন্ত ফুরসৎ দিল না। অন্য দিকে অপর আর একদল পানি পাঁড়ের কাছ থেকে জলের বাল্‌তি আর গেলাস ছিনিয়ে নিয়ে ক্রমাগত জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। ভয়ে আর তেষ্টায় তাদের কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল। এইবার বুঝি বুঝ্‌তে পারল যে, তারা সত্যি প্রাণে বেঁচে আছে।

মুসলমান ভদ্রলোক অনুমান করলেন যে, এদের ক্ষুধা নিবৃত্তির আশায় বসে থাক্‌লে ফটিক আর খুকুর ভাগ্যে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই জুটবে না! তাই তিনি মাকে বল্লেন, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি যা খাবার জোগাড় করতে পারি নিয়ে আস্‌ছি।

দ্রুতবেগে তিনি কামরা থেকে নেমে গেলেন।

ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক—এ অঞ্চলে মুসলমানের দাবী আগে এ কথা মিঠাই ওয়ালারাও ভুল্‌তে পারে না। তাই অন্যের দাবী মেটাবার আগে ফেরিওয়ালা ভদ্রলোকের হাতে কিছু সন্দেশ আর রসগোল্লা গুঁজে দিলে। দাম পরে চেয়ে নিলেই হবে।

মুসলমান ভদ্রলোক মনে মনে ভাব্‌লেন,—এটা যেন শাপে বর হল। কেন না এই ক্ষুধার্ত্ত জনতার চাহিদা মিটিয়ে মিঠাইওয়ালা যখন তাঁর দিকে তাকাবার ফুরসৎ পেতো—তখন থালার আর কিছুই অবশিষ্ট থাক্‌ত না! ফলে খুকু আর ফটিককে ক্ষিদে সহ্য করেই চুপ্‌চাপ বসে থাক্‌তে হত।

ভদ্রলোক কামরায় ফিরে এসে ছেলেমেয়ের হাতে খাবার তুলে দিলেন।

মা তাকিয়ে দেখ্‌লেন, আর তার কেবলি বুক ঠেলে কান্না আস্‌তে

লাগ্‌লো! তিনি ছেলেমেয়ের মা, কিন্তু আজ তাদের হাতে ক্ষুধার সময় অন্ন তুলে দেবার ক্ষমতাও তার নেই।

শুধু ট্রেনের কামরার বাইরেই যে অন্ধকার তা নয়—যতদূর চোখ যায় তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে এতটুকু আলোর রেখা পর্য্যন্ত তিনি কোথায়ও খুঁজে পেলেন না।

মা তখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে ছেলে-মেয়ের খাওয়া দেখ্‌ছেন! ওরা গোগ্রাসে খাবার গিল্‌ছে।

মার এক একবার মনে হচ্ছে এই ছেলে-মেয়ে যেন তিনি পেটে ধরেন নি! অন্য কোনো লোকের হ্যাংলা দুটি ছেলেমেয়ের খাওয়া তিনি দেখ্‌ছেন—নিতান্ত নির্লিপ্তের মতো! নইলে তার সন্তান কি এমনি রাক্ষসের মতো গিল্‌তে পারে?

ছায়া ছবির মতো কত কথা মায়ের মগজের ভেতর দিয়ে আনা-গোনা সুরু করে:

ঠাকুমা বল্‌ছেন ফটিককে,—ওরে ফটকে, খেলা ত' আর পালিয়ে যাচ্ছে না! না হয় একটু পরেই যাবি। আমার মাথা খাস্‌···এই ছানার পায়েসটুকু মুখে দিয়ে যা'। আমাদের ধব্‌লির দুধের পায়েস··· খেতে কিছু নিন্দের হয়নি। আর তোরা যদি না-ই খাবি তবে সারা দুপুর কাঠের জ্বাল দিয়ে মরলাম কি সব আমার চিতের ওপর ছড়িয়ে দিতে?

আরও একটা ছবি মায়ের মনের পটে ভেসে উঠ্‌ল।

নবান্নের দিন।

শীতকাল। ফ্যানা-ফ্যানা ভাত রাঁধা হয়েছে। তার ভেতর বেগুন সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, সিম সেদ্ধ, ডালের বড়ি সেদ্ধ, মিট কুম্‌ড়ো, মিঠে আলু...অনেক কিছু একসঙ্গে। আর তারই সঙ্গে রয়েছে খাঁটি গাওয়া ঘি। প্রত্যেকের পাতের কাছে দুটি করে কাঁচা লঙ্কা। শীতের দিনে এই খাদ্যটি গ্রাম দেশে ভারী মুখরোচক। যেদিন এই রকম ফ্যানা ভাত রান্না হবে—ছেলেমেয়ে কেউ আর থালায় খাবে না। সবাই বায়না ধরবে কলাপাতার জন্যে! কলাপাতায় ভাত মাখ্‌লে গাওয়া ঘীর জন্যে পাতাটা অবধি পিছ্‌লে ওঠে···ভারী ভালো লাগে এই ভাবে ফ্যানাভাত দলা দলা করে খেতে।

খুকু তখন আরো ছোটো—

সেদিনের পাতে দলা পাকিয়েছে—

এটা কাকের জন্যে

এটা বগের জন্যে

এটা ভুলুর জন্যে

এটা মিনির জন্যে

এমন সময় খিড়কির দরজায় কার কান্না শোনা গেল—আমায় একটু ভাত দাও মা—ছুদিন কিছু খাইনি—

ওই ছুধের মেয়ে খুকু—তখন কতটুকুই বা তার বয়েস—বল্লে. মা, কাগা-বগা না—ওকে দাও !

বাড়ী শুদ্ধ্‌ লোক খুকুর কথা শুনে দাওয়ার ওপর হেসে গড়িয়ে পড়ল !

আর আজ—

আবার মা আড় চোখে খুকুর খাওয়া দেখ্‌তে লাগ্‌লো—

আজ যদি ঠিক এমনি সময় খুকুর কাছে গিয়ে কেউ খাবার চায় তবে সে বোধ করি ক্ষিদের জ্বালায় তাকে কাম্‌ড়ে দিতে পারে !

মা নিজে সে চিন্তা সইতেও পারলেন না। চোখ বুঁজলেন ! পেটের ক্ষিদে এমনি করেই মানুকে অমানুষ করে তোলে।

হঠাৎ কি একটা শব্দে আচ্‌মকা মায়ের চিন্তার সূতো ছিঁড়ে গেল।

অনেকগুলি সন্দেশ পরপর মুখে দিয়ে খুকু বিষম খেয়েছে ! ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে ক্রমাগত চীৎকার করতে লাগলেন—

এই পানিপাঁড়ে—ইধার আও—জল্‌দি !

ঢক্ ঢক্ করে এক গ্লাস জল খেয়ে তবে খুকু নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারে !

মুসলমান ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জানি, ট্রেনে আপনি কিছু খাবেন না। তবু জিজ্ঞেস করছি, কিছু মিষ্টি কি নেবেন ? আপনি রাজি হলেই আমি একটা মিঠাইওয়ালাকে আপনার কাছে ডেকে দিই।

মা চোখ বুঁজে ঘাড় কাৎ করে নির্জ্জীবের মতো পড়েছিলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমার জন্যে আপনাকে বিশেষ ব্যস্ত হতে হবে না। জানেন ত' হিন্দু ঘরের বিধবাদের প্রাণ অত সহজে যায় না। আপনি যে আমার ছেলে-মেয়ে দুটিকে মিষ্টি কিনে দিয়েছেন তাতেই যথেষ্ট উপকার হয়েছে, ভগবান আপনার ভাল করবেন।

ভদ্রলোক আর বেশী পীড়াপিড়ি করতে সাহস পেলেন না। ফটিক আর খুকুকে গল্পে-গল্পে সব কিছু ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন।

এই কামরাটা এতক্ষণ একেবারে ফাঁকা ছিল।

মিঠাই আর ঠাণ্ডা জল খেয়ে শান্ত হয়ে অনেক লোক এসে আবার এই গাড়ীতে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

তাদের সুখ-দুঃখের আলোচনায় কামরার বাতাস আবার ভারী হয়ে উঠ্‌ল।

মুখ বন্ধ হাঁড়ির ভেতর ভাত যেমন গুম্‌রে গুম্‌রে সিদ্ধ হতে থাকে —তেমনি সকলকার মনে ভয় আর আশঙ্কা ওলট পালট খেতে লাগ্‌লো।

এর পরের ষ্টেশনই পাকিস্তানের শেষ সীমানা।

সেখানে ব্যাপক খানা-তল্লাসীর ব্যবস্থা আছে।

হাঁড়িকাঠে ফেল্‌বার আগে উৎসর্গ করা ছাগ-নন্দনের যে অবস্থা যাত্রীদের মনোভাব অবিকল সেই রকম।

কপালে না জানি কি দুর্গতিই লেখা আছে।

মেয়েদের মধ্যে একটা চাপা কানাকানি শোনা যাচ্ছে।

কেউ কোনো জিনিষ লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কি না সেই খোঁজ করার অজুহাতে অনেক সময় নারীর সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

যে সব মেয়ে লেলিহান অগ্নিশিখার ভেতর ঘর হারিয়েছে, বিত্ত আর সম্পদ খুইয়েছে, আত্মীয়-স্বজনকে বলি দিয়ে এসেছে, পথের হাজার দুঃখ-দৈন্যকে অতিক্রম করেছে শুধু এই কামনায় যে, একদিন ছায়া-শীতল বটবৃক্ষের নীচে আশ্রয় পাবে—তারাও এই খানাতল্লাসীর কথায় পাংশুমুখে কুঁক্‌ড়ে ম্রীয়মান হয়ে মনে মনে একেবারে মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করছে।

এদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না! রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে অনেক সময় পশুর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। মা-বোনের সম্মান যারা রাখ্‌তে জানে না—তাদের কাছ থেকে কী-ই বা আশা করা যেতে পারে?

চরম-লাঞ্ছনা অনেকে নির্বিবাদে সয়ে যায়! আবার কেউ মনের গ্লানিতে আত্মহত্যা করে বসে।

সেই চরম লাঞ্ছনার অগ্নি পরীক্ষা এগিয়ে আস্‌ছে।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো ষ্টেশণে।

ইতিমধ্যে বহু মেয়েই তাদের হাতের গয়না আর লুকোনো টাকা পুরুষদের হাতে সঁপে দিয়ে দুর্গানাম জপ করছে।

ঘ্যাস্ করে এসে গাড়ী থাম্‌লো সেই ষ্টেশণে।

আন্‌সার বাহিনীর দল—নানান্ গাড়ীতে উঠে পড়ল।

কাউকে ছাড়ান নেই—সবাইকে খানাতল্লাসীর ঘরে হাজির হতে হবে। মেয়েরা এ-ওর মুখের দিকে তাকায়।

জীবন থেকে সম্ভ্রমই যদি চলে গেল তবে আর রইল কি! যুগে যুগে এম্‌নি করেই সীতাদের সহস্র লোক চক্ষুর সাম্‌নে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়।

বসুমতী সয়ে যাচ্ছেন নির্ব্বিবাদে!

তিনি যে সর্ব্বংসহা!

* * *

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে গেরস্তর বৌঝিরা—এ কামরায়—ও কামরায়! তাদের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না!

ফটিক এক কোনে বসে দাঁত কিড়-মিড় করতে থাকে!

সে যদি বড়ো হত—আর তার গায়ে যদি স্যাণ্ডো কিম্বা ভীম ভবানীর মতো শক্তি থাক্‌তো তবে দেখে নিতো শয়তানদের। মা-বোনদের এই লাঞ্ছনা সে নীরবে কিছুতেই সহ্য করত না! এ এমন দেশ—পুরুষরা হেটমুণ্ডে বসে থাকে আর মেয়েরা কেবলি চোখের জল ফেলে!

দ্রৌপদীর চোখের জলে কুরুক্ষেত্রে দাবানলের সৃষ্টি করেছিল। এ আবার কোন অলিখিত ইতিহাসের বীজ বপন করছে—একমাত্র অন্তর্য্যামি তা বল্‌তে পারে!

* * *

গাড়ী মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে।

এইবার ভারত রাষ্ট্রে গাড়ী প্রবেশ করবে।

যত দুঃখ, যত বেদনা, যত গ্লানি কি ধুয়ে মুছে যাবে? যাত্রীদল উন্মুখ হয়ে ওঠে।

কাশীর গঙ্গার সেতু অতিক্রমের সময় যাত্রীদলের চোখে-মুখে যে আশ্বাস আর বিশ্বাসের চন্দন-প্রলেপ ফুটে ওঠে—তাই দেখা দিয়েছে সবাইকার চোখের তারায় আর অধরের কম্পনে।

এবার কি সবাই মুক্তি-স্নান করে শুভ্র-শুচি হতে পারবে? দীর্ঘ অমানিশার অবসানে প্রসন্ন-প্রভাত কি ওদের সকলের শিরে শুভাশিস বর্ষণ করবে?

নয়ন মেলে সবাই দেখ্‌তে চায় নবীন সূর্য্যোদয়।

গাড়ী ভারত রাষ্ট্রের প্রথম ষ্টেশণ স্পর্শ করতে সে কী কোলাহল—সে কী উত্তেজনা!

ছুটে এলো কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দল, হিন্দুমহাসভার পাণ্ডারা, মাড়োয়ারী রিলিফ্‌ সোসাইটি···আরো কত জানা-অজানা সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদল······

আত্মীয়-স্বজনও ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে—

চোখের জলে আর মুখের হাসিতে রচিত হল অপরূপ ইন্দ্রধনু!

হঠাৎ সকলে সচকিত হয়ে ওঠে।

একটি কামরা থেকে নাম্‌ছেন একটি মুসলমান ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে একটি হিন্দু বিধবা আর দুটি ছেলে মেয়ে।

চাঞ্চল্যকর সংবাদের প্রত্যাশায় ছুটে আসে খবরের কাগজের রিপোর্টারের দল, ছুটে আসে সদাজাগ্রত ক্যামেরা বাহিনী—স্বেচ্ছাসেবক, জনগণ, মুটে, মজুর, কৌতূহলী দর্শক—সবাই······

—তাইত! হিন্দুর মেয়েছেলে কেন মুসলমানের সঙ্গে?

— কোত্থেকে আস্‌ছ খোকা-খুকু?

—বল মা, কোনো ভয় নেই—

—আমাদের ক্যাম্পে চলো, কোনো অসুবিধা নেই—

এমনি হাজার রকম প্রশ্নে মা সচকিত হয়ে ওঠেন!

অনেকে আশে-পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মনগড়া কাহিনী রচনা করেন।

কেউ বলে, ব্যাটা-ছেলেদের সব কেটে ফেলেছে। এখন পয়সা কড়ির লোভে ওদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

—ওদেরও শেষ পর্য্যন্ত জাহান্নামের পথে পাঠাবে।

—ছিনিয়ে আন্‌না ওদের ছুশমনটার হাত থেকে—

একদল অতি উৎসাহী কোমরে কাপড় জড়িয়ে এগিয়ে আসে—

—ও লোকটাকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না। ধর ওকে পাক্‌ড়ে—

মুসলমান ভদ্রলোকের ছ'পাশে লোক জড় হতে থাকে।

মা প্রথমটা সত্যি হক্‌চকিয়ে যান।

মুসলমান ভদ্রলোকও বুঝ্‌তে পারেন—একটা অজানা বিপদ তাঁর চারপাশে ঘনিয়ে এসেছে। তিনি মৃদুকণ্ঠে মাকে বলেন, এইবার ত' আপনি আপন-জনের সন্ধান পেয়েছেন—আমার তা হলে ছুটি—

—ছুটি অত সহজে মিল্‌ছে না মিঞা—বলে একটি জোয়ান গোছ লোক মুসলমান ভদ্রলোকের জামার কলার চেপে ধরলে—

মা চীৎকার করে উঠ্‌লেন।

ওখানে যা দেখে এলেন এখানে কি তারই প্রতিক্রিয়া চল্‌বে নাকি? তাঁর মনের কোনে সে কামনা ঠাঁই পায় নি—একেবারে।

তাই মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা দূরে সরিয়ে দিয়ে এক প্ল্যাটফর্ম্ম লোকের সামনে চীৎকার করে তিনি বল্লেন, ওকে ছেড়ে দিন। ওর দয়াতেই আমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেঁচে আস্‌তে পেরেছি।

সমস্ত জনতা এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে গেল!

ছাব্বিশ

শেষ পর্য্যন্ত মা, ফটিক আর খুকুর ঠাঁই হল—রাণাঘাটে কুপার্স ক্যাম্পে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই বিরাট অঞ্চলটায় একটা বিমান ঘাঁটি ও সৈন্য ব্যারাক ছিল। লম্বা লম্বা টিনের সেড্‌গুলি অজগর সাপের মতো মুখ ব্যাদান করে পড়ে আছে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু এসে সরকারী ব্যবস্থায় তারই গহ্বরে আশ্রয় নিচ্ছে।

লোক এসেছে পূর্ব্ববঙ্গের নানা জেলা থেকে।

বিভিন্ন তাদের ভাষা···বিচিত্র তাদের সমাবেশ।

তাতেও কামাই নেই···পিঁপড়ের সারের মতো মানুষ প্রতি ট্রেনে আস্‌ছেই। টিনের সেডের ভেতর বসে গেছে তারা ছোটো ছোট পুঁটলি, ছেঁড়া মাদুর আর চটের থলে নিয়ে। নিজ নিজ ক্ষুদ্র পরিসরের ভেতর ঘর গুছিয়ে নেবার তাদের কি বিপুল আগ্রহ।

একদিন এদেরই আকাশ ছিল নীল, দৃষ্টি ছিল সুদূর-প্রসারী, পালা-পার্ব্বণে প্রত্যেকের বসত বাটি উৎসব মুখর হয়ে উঠত। অতিথি বিদায়ের কালে তারা দয়া আর দাক্ষিণ্যে উদার হয়ে উঠ্‌ত। গোলা-ভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভর্ত্তী মাছ আর ক্ষেতভরা শাক সব্জীর ভেতর মা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়া যেত···

···কিন্তু আজ তাদেরই চোখের সাম্‌নে আকাশ হয়েছে ধূসর··· তাদের মনে নেই ভবিষ্যতের আশা···দেহে নেই শক্তি···অনেকেই পথের কষ্টে আর রোগের তাড়নায় একাধিক ছেলেমেয়েকে হারিয়ে এসেছে। যারা কোনো রকমে বেঁচে আছে তাদের মুখের দিকেও ওরা ভরসা করে তাকাতে সাহস পায় না···নিজেরা ভুগ্‌ছে পেটের ক্ষিদেয় আর নানাবিধ রোগের জ্বালায়! রাত কাটে ত' দিন যেন কাট্‌তে চায় না···এমনি মর্ম্মান্তিক তাদের অবস্থা!

একটু যে মানুষ চোখ বুঁজে ঘুমুবে তারই কি যো আছে? দুঃখের পাঁচালি চলেছে ডাইনে বাঁয়ে···এপাশে ওপাশে···

এই অসীম দুঃখের অসহ্য-বিষ কোন্ নীলকণ্ঠ ধারণ করবে?

এরা প্রত্যেক বেলায় রেশন পায় আর পায় লক্‌ড়ি।

সারা মাঠ জুড়ে উনুন বসে যায় তাই ফুটিয়ে নেবার জন্যে।

কোন রকমে দুবেলা দুমুঠো ফুটিয়ে নিয়ে প্রাণ ধারণ করতে হবে।

শেষ রাত্তির থেকে সবাইকার মাথায় টনক নড়ে ওঠে।

প্রাতকৃত্য বলে একটা কথা আছে।

তার কোনো ব্যবস্থাই এ অঞ্চলে নেই!

ফলে যা' হবার তাই হচ্ছে।

স্বাস্থ্য রক্ষার কোনো বালাই নেই এখানে।

যে যেখানে পারে কাজ সেরে আস্‌ছে।

দুর্গন্ধে দু'মিনিট দাঁড়ায় কার সাধ্যি!

কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! ওদের ঘ্রাণ শক্তিও যেন কমে গেছে। বিষ্ঠা আর চন্দন সমজ্ঞান।

পরমহংস হবার আর বাকি নেই কারো!

এজন্যে কেউ কারো নামে নালিশ জানায় না; ভুরু কোঁচকায় না···এমন কি এতটুকু সরে বসে না অবধি কেউ!

আর একটু বেলা হতেই টিউবওয়েল গুলির পাশে ভীড় জম্‌তে স্থুরু করে। পদ্মা. মেঘনা. শীতলক্ষার শীতল জলে যারা অবগাহন করত···এই ছিটে-ফোঁটা জল নিয়ে তারা মাথা ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে!

লোক যদি হয় পঞ্চাশ হাজার ত' টিউব ওয়েল মোট পঞ্চাশটি।

শুভঙ্করীর আর্য্যা দিয়ে অঙ্ক কসেও হিসেব মেলানো শক্ত হয়ে ওঠে।

কত বিচিত্র অবস্থায় কত স্ত্রী-পুরুষ এসে এখানে জুটেছে ভাব্‌তে গেলে হিম্‌সিম্ খেতে হয়।

বহু মেয়েছেলে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে···স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে··· কত ব্যাটা ছেলে এসে জুটেছে · মা, বোন, স্ত্রীকে খুঁজ্‌তে।

সোনার সংসার ছিল ওদের···আজ ভেঙে টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে সতীর দেহের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে!

এমন সঞ্জীবনী মন্ত্র কারো জানা নেই···যাতে তাদের ভাঙা-সংসার আবার আগের মতো জোড়া লাগে!

তারা সারাদিন হাজার হাজার জনারণ্যের মধ্যে ক্ষ্যাপার মতো পরশ পাথর খুঁজে বেড়ায়! গভীর রজনীতে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে তারা! হয় ত' শেষরাত্রে ভোরের দিকটায় আশার স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে···

আবার তাদের চলে আকুল অন্বেষণ!

পেটে খাদ্য নেই, পরণে বস্ত্র নেই···সন্ধ্যায় তাদের মনের তুলসী

তলায় প্রদীপ জ্বলে ওঠে না···মঙ্গল-শঙ্খ বাজে না তাদের আঁধার কুটিরে। ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে অস্থি চর্ম্ম সার হয়ে তারা মরণের পথে এগিয়ে চলে।

বহু অনাথ ছেলে-মেয়ে ঘুরে বেড়ায় কুপার্স ক্যাম্পের বুকে।

তাদের দেখ্‌বার কেউ নেই। অচেনা যার সঙ্গে দেখা হবে—করুণ কণ্ঠে অনুরোধ জানাবে—দুটি ভাত দেবে? আচ্ছা, ভাত না দাও মুড়ি গুড় দাও—দু'দিন কেউ আমাদের রেশন দিচ্ছে না!

এমনি কাতরোক্তি সারা ক্যাম্প জুড়ে।

আর একটা দিকে মাড়োয়ারী রিলিফ্‌ সোসাইটি রান্না করা ভাত ডাল তরকারী বসিয়ে খাওয়াচ্ছে হাজার হাজার উদ্বাস্তুদের।

প্রয়োজনের তুলনায় সেই আয়োজনই বা কতটুকু?

তাঁদেরও দোষ দেয়া চলে না।

পান্তা আন্‌তে লবণ ফুরোয়···প্রতিদিনকার একই সেই করুণ কাহিনী!

হাত পেতে খাদ্য চাইতে হবে—এমন অবস্থা মা কোনোদিন কল্পনাও করেননি।

ফটিক হেঁটে হেঁটে হয়রাণ · কিছুতেই রেশনের কুপন জোগাড় করতে পারে না। পেটের ক্ষিদেয় খুকু হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

শেষকালে মাড়োয়ারী রিলিফ্‌ সোসাইটির একটি স্বেচ্ছাসেবক দেখ্‌তে পেয়ে ওদের ভাইবোনকে ভীড় ঠেলে কোনো রকমে খাইয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু পরের স্নেহকাতর আঁখির দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে কটা বেলা এইভাবে কাটানো চলে?

তারপর আরো বিপদ্…মায়ের আতপ চাল জোটে না ! এজন্য তাঁকে প্রায় প্রত্যহই অনাহারে থাক্‌তে হয়।

ফটিক ভেবে দেখলে, এখানে থাক্‌লে ওদের মাকে তারা কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না !

দুর্গন্ধে আর বিতৃষ্ণায় মায়ের পেটের ভিতরটায় কেবলি পাক দিতে থাকে। না, এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভালো। তারপর কপালে যা আছে তাই হোক।……তবু অন্ততঃ ভগবানের রাজত্বে স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার অধিকার পাক ওরা !

গভীর রাতে টর্চ্চের আলো কুপার ক্যাম্পের অধিবাসী আর অধিবাসিনীদের ওপর দিয়ে নীরবে ঘুরে যায়। নানা রকম বড় বড় গাড়ীর আমদানী হয় বেশী রাত্তিরে। চাপা ফিস্-ফিসে সব কথা বার্ত্তা। মা কিছু শুন্‌তে পান, কিছু পান না ! অনেক হতভাগিনী সেই সব মোটরে চড়ে রাত্তিরের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যে কোথায় উধাও হয় কেউ তার হদিশ দিতে পারে না !

এই সব কথা ভেবে মায়ের বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে !

খুকুকে বুকে চেপে ধরে মা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে থাকেন !

মা ছেলেকে কি যেন বল্‌তে চান—

ছেলেও এখানে থাকবার অনিচ্ছা জানাতে চায় মাকে - !

কিন্তু কেউ কারো মুখের দিকে ভালো করে চাইতে পারে না !

খাদ্যহীন কুকুরের মতো জিব বের করে সবার অজান্তে ধুক্‌তে থাকে তিনটি প্রাণী ! তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এখানে আর কিছুতেই থাক্‌বে না !

গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে তখন একবার

তারা বেরুবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে অসুবিধে বেশী। নানা জনে নানান্ কথা জিজ্ঞেস করে। জবাব দিতে গিয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

তার চাইতে প্রখর দিবালোকে—হাজার লোকচক্ষুর সাম্‌নে সরে পড়লে কেউ লক্ষ্য পর্য্যন্ত করবে না! সবাই ব্যস্ত থাক্‌বে রেশন আর রান্না নিয়ে। কে এলো, কে গেল—এই বিরাট অবহেলিত আর অনাদৃত জগতে কে তার সন্ধান রাখে?

তাই উত্তপ্ত সূর্য্যালোকে মা ছেলে আর মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন কুপার্স ক্যাম্প থেকে। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন না; কাউকে অভিশাপ দেবার জন্যে তাঁর মন তিক্ত হয়ে উঠল না, এমন কি এক মুহূর্ত্তকাল থম্‌কে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে সজল চক্ষে কুপার্স ক্যাম্পের দিকে তাকালেন না পর্য্যন্ত তিনি।

যদি মরতে হয় ত' ভগবানের বিরাট রাজ্যে প্রশস্ত পথ পড়ে আছে। শুধু মনের কোনে একটি কামনা, একটি বাসনা যে, মরবার আগে ছেলে-মেয়ে দুটিকে কারো হাতে সঁপে দেওয়া চলে কিনা—যে ওদের নিঃস্বার্থভাবে সত্যিকারের মানুষ করে গড়ে তোল্‌বার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

কিন্তু কোথায় সে মানুষ যে স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করে আশ্রয়ের জন্যে সবল হাতখানি বাড়িয়ে দেবে?

মা ধুক্‌তে ধুক্‌তে পথ চলেন আর এমন একটি মুখের জন্যে আকুলি-বিকুলি করেন—যে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, ইহুদী নয়—যে সোজাসুজি বল্‌বে, আমি মানুষ—এসো আমার সঙ্গে—

এ যুগে কি তেমন মানুষ একান্তই দুর্লভ?

বলারাজা, শিবিরাজা আর দাতাকর্ণের দল···আর বুঝি ধূলোয় নেমে আসে না!

অবশেষে ভগবান বুঝি কান পেতে মায়ের প্রার্থনা শুন্‌লেন।

এসে দেখা দিলেন তিনি এক কেরাণী ভদ্রলোকের বেশে!

বাজার করে ফিরছিলেন মানুষটি।

তিনটি প্রাণীর অবস্থা দেখে থম্‌কে দাঁড়ালেন তিনি।

শুধোলেন মাকে,—আপনাদের বুঝি ক'দিন খাওয়া জোটে নি? বুঝ্‌তে পারছি সব। আমিও পাকিস্তানের লোক কিনা! তবে সুবিধে ছিল এইটুকু যে, আগে থেকে এই অঞ্চলে একটা চাকরী সম্বল আছে।

সমবেদনার কথা শুনে মা চোখ তুলে তাকালেন। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারলেন না। ঠোঁট দুটো থর্‌-থর্‌ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো আর চোখ দুটো কেমন যেন জলে ভরে উঠ্‌ল।

ভদ্রলোক বল্লেন, কিছু বল্‌তে হবে না আপনাকে। বড় ঘরের বৌ আপনি—সে কথা চেহারা দেখেই বুঝতে পারি। আমি কিন্তু বড়লোক নই। এক বিধবা মেয়েকে নিয়ে সংসার। চলুন আমার ওখানে। ছেলেমেয়ে দুটির দিকে তাকনো যায় না। আগে দুটি ভাত মুখে দিক। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় পরামর্শ করে দেখা যাবে—ওদের বাঁচবার কি ব্যবস্থা করা যায়!

এই রকম সহৃদয় মন নিয়ে কত ভিখিরীকে দয়া করেছেন—মা নিজের সংসারে। আজ নিজেই ছেলেমেয়ের হাতে ধরে দয়ার ভিখিরী।

ভদ্রলোকের পেছন পেছন নীরবে তাঁর সংসারে এসে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকের নাম অবিনাশবাবু।

ঘরে ঢুকেই বোঝা গেল—অবিনাশবাবুর বিধবা মেয়ে চিররুগ্না। তাই নিয়েই বাপের সংসার আগ্‌লাতে হয়।

ওদের দেখ্‌তে পেয়ে মুখ ঝাঁজিয়ে চীৎকার করে বিধবা মেয়ে সৌদামিনী বল্লে, আবার কোন্ কুটুমদের সঙ্গে করে নিয়ে এলে বাবা শুনি? আমি কিন্তু এখন পিণ্ডি সেদ্ধ করতে পারবো না।

অবিনাশবাবু ফিস্ ফিস্ করে মাকে বল্লেন, আপনি যেন কিছু মনে করবেন না! রোগে ভুগে ভুগে মেয়েটা অমনি খিট্‌খিটে হয়ে গেছে। আপনি দেখ্‌তে অনেকটা আমার বৌদির মতো। বড় ভালবাসতেন তিনি আমাকে! অকালে চলে গেছেন। তাঁর কথা মনে পড়তেই আপনাকে ধরে এনেছি। বৌদির মতোই থাকুন আমার ঘরে, কিচ্ছু সঙ্কোচ করবেন না।

ভদ্রলোক এই কথা বলেই পাশের ঘরে পালিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদেই তাঁর হুঁকোর গুড়ুক গুড়ুক আওয়াজ শোনা গেল।

কথায় কথায় খেঁকিয়ে ওঠে সৌদামিনী। বলে, বাবার যেমন কাণ্ড! রাস্তা দিয়ে যত ভিখিরী যায় সবাই তার বৌদি! এত যদি মানুষের জন্যে দরদ তবে তেমনি একটা জমিদারী জোগাড় করে নিতে হয়। হুকুম করো, দাসী-বাঁদী করে দিয়ে যাক্। আমি কিন্তু ভূত-পেরেতের পিণ্ডি চট্‌কাতে পারব না। পাশের ঘর থেকে অবিনাশবাবু ধমক দিয়ে ওঠেন, তুই চুপ কর দেখি বাপু—

মা কিন্তু সদুর কথায় রাগ করেন না। বলেন, সদু, তুমি কিছু কোরো না অসুখ শরীর নিয়ে, পেরে উঠ্‌বে কেন? আজ থেকে রান্নার ভার আমিই নিলাম। সদু হাঁ-হুঁ কিছুই জবাব দিলে না, মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।

দুদিন বাদে ফটিক মায়ের কাছে লাফাতে লাফাতে এলো। তার মুখ-চোখ আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল। বল্লে, কিছু ভেবো না তুমি মা, এখন থেকে আমি রোজগার করবো।

মা মুখ তুলে তাকালেন। অবাক হয়ে শুধোলেন, পাগল ছেলে! তুই রোজগার করবি কি রে! দাঁড়া, আগে তোর পড়াশুনার একটা ব্যবস্থা করে দিই।

ফটিক মাথা দুলিয়ে আবদারের সুরে জবাব দিলে, তুমি কিচ্ছু বোঝনা মা, পড়াশোনা ছেড়ে দেবো—তোমায় কে বল্লে? সে ঠিক আমি চালিয়ে যাবো। তা' ছাড়াও উপায় করতে পারবো আমি। সেই কথাই শোনা না! আজই বাজার করতে গিয়ে ষ্টেশনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। রাণাঘাটে যত কাগজ আসে—অমৃতবাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার, বসুমতী—সব তিনি আনান। চট্‌পটে ছেলে খুঁজছিলেন - সেই সব কাগজ বিক্রী করবার জন্যে। আমার মতো অনেক ছেলে রাজি হয়েছে মা! যে যেমন বিক্রী করতে পারবে—তার তেমনি আয় হবে। দেখে নিও তুমি—রোজ দু'টাকা করে আমি ফেল্‌বোই।

উত্তেজনায় আর আনন্দে ফটিক আন্দোলিত হতে থাকে।

মা আর ছেলের প্রস্তাবে আপত্তি করেন না। শুধু তাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ফটিক এই বয়সেই রোজগার করে মাকে খাওয়াতে চায়!

খুকু হাততালি দিয়ে বলে, বেশ হবে মা, বেশ হবে। দাদা পথে পথে লোকের কাছে হাঁক্‌বে—নয়া খবর, টাট্‌কা খবর,—যুগান্তর,

আনন্দবাজার, বসুমতী চাই—! কি রকম করে ডাক্‌বে—একবার মাকে শুনিয়ে দাও দেখি—দাদা !

ফটিক খুকুর বেণীটা আল্‌তো করে টেনে বোনকে আদর করে হো-হো শব্দে হাস্‌তে থাকে।

মা অনেকদিন বাদে ফটিকের মুখে হাসি দেখে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন ! খবরটা শুনে অবিনাশবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি হাঁ হুঁ কিচ্ছু বলেন না, শুধু গুড়ুক গুড়ুক তামাক টেনে নিজের সম্মতি জানান। মুখরা সদু পর্য্যন্ত খবরটা শুনে পুলকিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, বেশ, তাই বেশ। তুমি উপায় করে মায়ের দুঃখ দূর করবে এর চাইতে খুশীর খবর আর কি আছে ? একদিন আমাকে কিন্তু মিষ্টি খাওয়াতে হবে।

ফটিক কৌতুক করে জবাব দেয়, তা' খাওয়াবো বৈকি দিদি ! নিশ্চয়ই খাওয়াবো। প্রথম দিনের রোজগার থেকেই তোমায় গরম রসগোল্লা কিনে এনে দেবো।

—ওরে দুষ্টু ছেলে ! গরম রসগোল্লা যে আমি ভালবাসি—সে খবর তোকে কে দিলে ! বত্রিশপাটি দাঁত বিকশিত করে জিজ্ঞেস করে সদু।

ফোঁড়ন কেটে সে প্রশ্নের জবাব দেয় খুকু। বল্লে, বারে ! আমরা জানিনে বুঝি ? সেদিন তুমি দুঃখ করে মাকে বল্‌ছিলে যে, কতদিন গরম রসগোল্লা তুমি খাওনি !

এইবার বাড়ী শুদ্ধু সবাই মিলে হাস্‌তে থাকে। মাও সে হাসিতে যোগ দেন। পাশের ঘরে অবিনাশবাবুর হুঁকোর শব্দ দ্রুততর হয়ে ওঠে।

কয়েক দিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে, ফটিক তার মাকে মিথ্যে আশ্বাস দেয়নি। গাঁয়ের সেই আদরে-আবদারে মানুষ, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো ফটিক একেবারে বদ্‌লে গেছে। অসম্ভব পরিশ্রম করছে সে। তাই রোজ দুটাকা করে তার পাওনা হয়—আর টাকাটা সে মায়ের হাতে এনে দেয়।

অবিনাশবাবু রসিকতা করে বলেন; দেখ্‌লে বৌদি, তোমার ছেলের যোগ্যতা ? কাকার টাকায় খাবে না বলে—কেমন রাতারাতি উপায় করতে শিখেছে !

মা জবাব দেন, ঠাকুরপো, তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছিলে বলেই ত' ফটিক রোজগার করতে শিখেছে। নইলে আমি আর কবে ভেবেছিলাম যে, পেটের শত্তুরের রোজগারে পেট ভরাতে হবে।

—হুঁ ! বৌদির যেমন কথা ! হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দেন অবিনাশবাবু। মা ছেলেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্লেন, তোর রোজগারের টাকা আমার কাছে না দিয়ে তোর কাকার হাতে দিস্—উনি খুসী হবেন।

এবারে জীর্ণ নৌকোকে গাব লাগালে যেমন হয় তেমনি মায়ের জোড়াতালি দেয়া সংসার কোনো রকমে আবার পাড়ি জমাতে সুরু করলে !

গোপনে গোপনে অবিনাশবাবুও আবার দুটো নতুন টিউশনি নিয়েছেন কিন্তু মুখে সে কথা কিছুতেই স্বীকার করেন না ! সতু কিন্তু তাঁর দেরীতে বাড়ী ফেরা দেখে ঠিক ধরে ফেলেছে।

এই নিয়ে একদিন বাপে-বেটিতে তুমুল ঝগড়া !

মা মনে মনে ভাবেন, আমরাই যত অশান্তির কারণ !

কিন্তু সেই অশান্তি দূর করবার কোনো উপায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না ! যত ভাবেন রাত্তিরে মাথা গরম হয়ে ওঠে। বারে বারে বিছানা থেকে উঠে ঠাণ্ডা জল চাঁদিতে দেন—কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আস্‌তে চায় না।

এরই মধ্যে হঠাৎ একটা জরুরী কাজে অবিনাশবাবুকে দিন সাতেকের জন্যে বাইরে চলে যেতে হয়।

দু' দিন বিনা ঝঞ্ঝাটে বেশ কাট্‌লো।

তিন দিনের দিন সকালবেলা সদু অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লো ! অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি চালের কোনোই ব্যবস্থা করে যেতে পারেন নি।

কেউ আগে হাঁড়িতে হাত দিয়ে দেখেনি !

ফটিক যে দু'টাকা করে রোজ পায় তাতে সংসারে রেশনের চাল আনা চলে না ! এই নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র সুরু হয়ে গেল !

সদু বল্লে, আমার আপন ভোলা বাপের ঘাড়ে বসে রোজ রোজ পিণ্ডি গেলা চল্‌বে না। তোমরা বাপু পথ দেখ !

মায়ের গলা দিয়ে সত্যি একটা পিণ্ডি যেন ওপরে উঠে আস্‌তে চায়। কোনো প্রতিবাদ তিনি করতে পারেন না। অসহায়ের মতো বারান্দায় তিনি বসে থাকেন।

সদুর কণ্ঠ সপ্তমে ওঠে, চুপ করে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না বাছা। বাবা ফিরে এলে যে আবার কাঁদুনি গাইবে সেটি হতে দিচ্ছিনে ! তার আগেই তোমাদের আমি বিদেয় করে দেবো।

মা মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, আচ্ছা, আমরা চলেই যাবো।

ঠাকুরপো আগে ফিরে আসুন, তাঁকে না জানিয়ে যাওয়া ত' ভালো দেখায় না !······

— ওরে আমার সাত পুরুষের কুটুম রে ! মুখ ঝাঁজিয়ে ওঠে সত্নু। এক্ষুনি তোমাদের বিদেয় করে আমার অন্য কথা। এই নিত্যিকার ভিখিরীর দৌরাত্ম্যে আমার হাড়-মাস কালি হয়ে গেল।

ঠিক এমনি সময় ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফটিক এসে উঠোনে ঢুক্‌লো। মা পাগলের মতো উঠে দাঁড়ালেন।

ছুটে গিয়ে বল্লেন, আর ঘরে ঢুকিস্‌নে ফটিক। এখানে আমাদের যায়গা হবে না।

কেন মা ? অবাক হয়ে শুধোয় ফটিক !

সত্নু জবাব দেয়, আমার খুশী ! তোমরা বাপ্‌ পথ দেখ—আমার শেষ কথা। বাবা ফিরে এলে আবার যে কাঁদুনি গেয়ে ঠাঁই করে নেবে, সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না। বুড়ো বয়েসে বাবার কি হাল হয়েছে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছ তোমরা ?

আর কোন প্রতিবাদের ভাষা কারো মুখে জোগালো না। না মায়ের, না ছেলের।

ভয়ে ভয়ে খুকুও এসে মায়ের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে।

তিনজনে আবার পথে এসে দাঁড়ালো।

উজ্জ্বল আর প্রখর তপন তখন অগ্নি বৃষ্টি সুরু করে দিয়েছে !

সাভাশ

প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক। আর তার সঙ্গে চেলা-চামুণ্ডা সাত-আটজন। জিপ গাড়ী করে যাচ্ছিলেন তাদের কোন কাজে কে জানে।

মায়ের সঙ্গে দুটি ছেলে-মেয়েকে দারুণ রদ্দুরে হাঁপাতে দেখে ঘ্যাস্ করে গাড়ীখানা থামিয়ে দিলেন ঠিক ওদেরই গা ঘেঁসে।

মা প্রথমটা চম্কে উঠে খুকুকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলেন। পথ চল্‌তে বিপদ ত' আর এক রকম নয়!

ভদ্রলোক সটান গাড়ী থেকে নেমে এলেন মায়ের কাছে। বল্লেন, বুঝ্‌তে পেরেছি, আপনারা এসেছেন পূর্ব্ববঙ্গ থেকে। কিন্তু এ ভাবে কচি-কাচা নিয়ে রাস্তা হাঁট্‌তে গিয়ে ত' মারা পড়বেন।

গাড়ীর লোকদের ইসারা করে বল্লেন, ওহে নামো ত' তোমরা গাড়ী থেকে। না হয় বাসে করে চলে যেও। এদের গাড়ীতে তুলে না নিলে অন্যায় হবে, চোখে দেখে ত' অব্যবস্থা কিছু হতে দিতে পারিনে!

ভদ্রলোকের কথায় গাড়ীর ভেতরকার লোকগুলি সুট্-সুট্ করে নেমে জায়গা করে দিলে।

ফটিক একটু চালাক চতুর হয়েছে এরই মধ্যে। নতুন করে জগৎকে চেনবার চেষ্টা করছে।

তাই শুধোলে, আপনারা কেন আমাদের জন্যে কষ্ট করতে যাবেন? আর আমাদের নিয়েই বা যেতে চান কোথায়?

গোঁফ্‌ওয়ালা ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠ্‌লেন।

বল্লেন, তুমি ছেলেমানুষ, আমাদের খবর জান্‌বে কোত্থেকে?

দেশের নামকরা লোকেরা আমাদের পরিচয় রাখেন! "বিশ্বব্যথা নিবারণী সমিতির" নাম শোননি? খবরের কাগজে আমাদের সৎকাজের কথা বড় বড় হরফে প্রায়ই বেরোয়। দেশের ধনীরা আমাদের কাছে চাঁদা পাঠিয়ে দেন মানুষের ব্যথা বেদনা দূর করবার জন্যে। কে বাস্তুহারা হয়েছে, কে খেতে পারছে না, কে অসুখে ভুগ্ছে, কে মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে....সব আমাদেরই দেখ্তে হয়—খোঁজ-খবর নিতে হয়। তোমাদের মুখ দেখেই বুঝ্তে পেরেছি—তোমাদের ব্যথার অন্ত নেই। আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে।

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন, আপনি আর মিছিমিছি রদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাক্বেন না। ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন গাড়ীতে। আপনাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি নিঃশ্বাস ফেল্বার ফুরসুৎ পাবো।

মা যেন অদৃষ্টের ওপর একেবারে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন। ঘর থেকে চলে যেতে বল্লেও যেমন প্রতিবাদ করতে পারেন না—তেমনি আদর করে আশ্রয় দিতে চাইলেও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হন না।

সবই যেন তাঁর গা-সয়া হয়ে গেছে।

—কোথায় নিয়ে যাবে বাবা আমাদের? এ প্রশ্ন উত্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তাও যেন তাঁর জীবন থেকে ফুরিয়ে গেছে।

ফটিক আর খুকুকে দুই হাতে ধরে বিনা প্রতিবাদে তিনি গাড়ীতে গিয়ে উঠ্লেন।

ভদ্রলোক ড্রাইভারের পাশে বসে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জোরে গাড়ী ছাড়বার আদেশ দিলেন।

রাজ পথের তপ্ত ধূলো উড়িয়ে জীপগাড়ী ঝড়ের বেগে উড়ে চল্লো।

"বিশ্বব্যথা নিবারণী সমিতি"তে পৌঁছুতে তাদের বেশ খানিকটা সময় লাগ্‌লো।

অনেক দিনের পুরোণো এক বিরাট বাগানবাড়ী।

চারিদিকে উঁচু দেয়াল। সামনে কয়েকটি পাকা ঘর অফিসের কাজে লাগে; ভেতরে বাগানের মধ্যে সব কুঁড়ে তোলা হয়েছে। তারই ভেতর এক-একটা পরিবার থাকে।

ফটকের কাছে বন্দুক হাতে জাঁদরেল দুটি দারোয়ান। খাড়া পাহারায় আছে।

মা ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে ঢুক্‌তে অনেক মেয়েছেলে এসে তাকে ছেঁকে ধরল।

—ওমা আজ তোমায় এরা পাক্‌ড়াও করেছে বুঝি?

—তা বড় ঘরের বৌ বলেই ত' মনে হয়!

—একদিন সবাই বড় ঘরেরই থাকে লো! তারপর ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশে গেলে চিনে বের করা মুস্কিল!

এমনি সব নানারকম কথার ঢিল আচম্‌কাভাবে মায়ের কানে এসে বাজ্‌তে লাগ্‌লো।

সেই গুঁফো ভদ্রলোকটি একটি হুম্‌কি দিয়ে বল্লেন, যাও-যাও তোমরা এখানে ভীড় কোরো না।

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, আপনি এদের সঙ্গে থাকতে পার্‌বেন কেন? আপনার জন্যে আমি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

পাছে আরো সব অবাঞ্ছিত কথা মায়ের কানে এসে পৌঁছয়—তাই

তাড়াতাড়ি তিনি তাঁদের ওখান থেকে সরিয়ে বাগানের আর এক কোণে গিয়ে হাজির হলেন।

মায়ের জন্যে ব্যবস্থাও হল কিছু কিছু।

চ্যাটাই এলো, তোলা উনুন এলো, জ্বালানি কাঠ, তেল, নুন এম্‌নি সব টুক্‌টাক্‌ জিনিস।

গুঁফো ভদ্রলোক বল্লেন, রেশন কার্ড ক'রে দিতে হবে আপনাদের। আজ আমাদের ভাঁড়ার থেকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি চাল-ডাল। কাউকে আমরা উপোসী-ত' রাখ্‌তে পারিনে। বাগানেই প্রচুর তরকারী ফলে। তারই ভাগ পায় সবাই। কিছু কিছু তরী-তরকারীও এসে পৌঁছুলো শেষ পর্য্যন্ত।

খুকু কিন্তু এতেই ভারী খুসী। বল্লে, শেষ কালে এ কিন্তু ভালোই হল মা। ছোট হোক্‌, তবু ত' আমাদের জন্যে একটা আলাদা ঘর। ঘরের সাম্‌নেটাতে আমি কিন্তু ফুলের বাগান কর্‌বো। আর ওই যে দেখ্‌ছ পুকুর? সাঁতার কাটার ভারী সুবিধে হবে কিন্তু।

মা কিন্তু হ্যাঁ-হুঁ কোনো জবাবই দিলেন না। বেলা অনেকটা গড়িয়ে পড়েছে; সবাই ক্ষিদেয় কাতর। তোলা উনুনে মাটির হাঁড়িতে কোনো রকমে ভাতে-ভাত নামিয়ে দিতে পার্‌লে এবেলার মতো নিশ্চিন্দি। তারপর ধীরে-সুস্থে হাত-পা ছড়িয়ে ওবেলার কথা ভাবা যাবে'খন।

ফটিকও কিন্তু চুপ্‌চাপ বসে নেই।

কুটিরের চারদিকটা ঘুরে দেখ্‌ছে। বল্লে, একটা কোদাল যদি পাই তবে মাটি কুপিয়ে বেগুন, লাউ, কুম্‌ড়ো, পেঁপে গাছ আমিও দিব্যি

লাগিয়ে দিতে পারি। সেগুলো বিক্রি ক'রে বেশ পয়সা রোজগার করা যাবে। তুমি দেখে নিও মা।

মা শুনে যান্ ছেলে মেয়ের কথা; কিন্তু কোনো জবাব দেন না। তাঁর মাথায় শুধু এক চিন্তা। কি ক'রে ছেলে-মেয়ে দুটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন—তাদের লেখা পড়া শেখাবেন, মানুষ ক'রে তুল্‌বেন।

ধূপ পুড়ে পুড়ে গন্ধ বিলোয়, সল্‌তে নিজে পুড়ে আলো দেয়। নিজের জীবনকে ছাই করে দিয়ে মা কি কোনো মতেই ছেলে-মেয়ে দুটিকে মানুষ ক'রে তুল্‌তে পার্‌বেন না?

ভদ্রলোক যখন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছে···তখন শেষ পর্য্যন্ত একটা ব্যবস্থা হবেই।

মায়ের মন আকাশে নিজের অজান্তেই স্বপ্ন-সৌধ গড়ে তোলে। চ্যাটাইয়ে শুয়ে আকাশ-কুসুম ফোটানোর মধ্যে বেশ একটা আমেজ আছে। সেই স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে মা কখন সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম যখন ভাঙল—তখন একেবারে বিকেল।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ্‌লেন, ছেলে মেয়ে কেউ ঘরে নেই।

জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে চাইতেই বাগানের মাঝখানকার খালি জায়গাটিতে অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে চোখে পড়ল! ওরা দল বেঁধে সবাই খেল্‌ছে।

মায়ের মনে পড়ল, কতদিন ফটিক আর খুকু খেলতে পায় না। বেড়াল-কুকুরের ছানার মতো—তিনি ওদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছেন···কিন্তু কোথায়ও এতটুকু শান্তি পাচ্ছেন না।

আর কিছু না হোক্, বাগানটা মস্ত বড়…ওরা খেলে অন্ততঃ মনের স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরে পাবে।

ঘরে ত' প্রদীপের কোনো ব্যবস্থা নেই।

সন্ধ্যে হবার আগেই দু'টো ভাত ফুটিয়ে ওদের খাইয়ে দিতে হবে। নিজের জন্যে মা কিছু ভাবেন না। অনেক রাত তিনি উপোসে কাটিয়ে দিতে পারেন।

খানিকটা খাবার জল তুলে আনা দরকার।

কাছেই একটা টিউব ওয়েল আছে। শূন্য কলসীটা নিয়ে মা ঘর থেকে সবে বেরুতে যাবেন—এমন সময় সেই গুঁফো ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন।

বল্লেন, আপনার সঙ্গে একটু কাজের কথা ছিল।

মা মাথার আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে বল্লেন, বলুন—

ভদ্রলোকের নাম দণ্ডধরবাবু। মুখখানাকে যথাসম্ভব ভারিক্কি করে তিনি বল্লেন, দেখুন, এখানকার একটা নিয়মকানুন বিলি ব্যবস্থা আছে। জানেন ত', বসিয়ে খাওয়ালে রাজার ভাণ্ডারও খালি হয়ে যায়—।

মা বুঝ্‌তে পার্‌লেন না দণ্ডধরবাবু কি বল্‌তে চাইছেন। ওবেলার সঙ্গে এবেলার কথারও কত তফাৎ। ওবেলায় যেন মানুষের উপকার কর্‌তে পার্‌লে বর্ত্তে যান। আর এক বেলাতেই তারা গলগ্রহ হয়ে পড়লেন। তাহ'লে রাস্তা থেকে এমনভাবে ছোঁ মেরে নিয়ে আসার দরকারই বা কি ছিল।

তবু ভদ্রলোকের কথার একটা জবাব দিতে হয়। চুপ করে থাক্‌লে ব্যাপারটা আরো বিসদৃশ হ'য়ে ওঠে। তাই তিনি উত্তর

দিলেন, আপনি ত' ঠিক কথাই বল্‌ছেন। কাজ কর্‌তে আমি সব সময়ই রাজি। শুধু ছেলে মেয়ে দুটিকে আমার মানুষ ক'রে তুল্‌তে হবে।

দণ্ডধরবাবু বল্লেন, ওদেরও কাজ কর্‌তে হবে বৈ-কি! এখানে যত পরিবার আছে সবাই কাজ করে।

মা হঠাৎ বুঝ্‌তে পারেন না—হঠাৎ কোথায় এসে তিনি পড়লেন? এবেলার সঙ্গে ওবেলার কথার একেবারে মিল নেই। ওবেলার কথা-গুলো ছিল যেন মধু মাখানো – আর এবেলা চিরতার মতো তেতো।

তেতোও সয়া যায় যদি চিরতার মতো তার গুণ থাকে।

রাত ন'টা পর্য্যন্ত অফিসের কাজ চলে। কত জাতের লোক যে মোটরে করে আসা-যাওয়া করে তার ইয়ত্ত্বা নেই। বাঙালী, ভাটিয়া, মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মুশলমান···সকলেই আছে। এ যেন একেবারে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের শ্রীক্ষেত্র।

মা ভাবেন, তা হবেই বা না কেন? "বিশ্ব ব্যথা নিবারণী সমিতি"। সবাইকে নিয়ে ত' কাজ! কত লোক এসে চাঁদা দেয় তার কি আর লেখা-জোখা আছে।

রাত্রি নটার পর অফিস ঘরগুলিতে তালা পড়ে। দণ্ডধরবাবু দলবল নিয়ে জীপে করে চলে যান। গেটে অবশ্য পাহারা থাকে। কেউ ভেতরে ঢুক্‌তে কিম্বা বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে।

একটু বেশী রাত্তিরে উমারাণীর মা এলেন মায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে। ফরিদপুর অঞ্চলের মহিলা। একদিন সংসারে সবই ছিল। পালিয়ে আস্‌বার সময় তাঁর স্বামীকে গুণ্ডারা মেরে ফেলে। এখানে আশ্রয় নেবার পর মেয়ে উমারাণীকেও হারিয়েছেন—সে অনেক কথা।

উমারাণীর মার বয়েস বেশী নয়। কিন্তু এরি মধ্যে সাম্‌নের অর্দ্ধেক চুল একেবারে সাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে পড়েছে কালি। কপালে দুশ্চিন্তার অসংখ্য রেখা। অথচ এই মহিলাটি সারাজীবন প্রাচুর্য্যের মধ্যেই মানুষ হয়েছেন। বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বৌ···অভাব ছিল না কিছুরই। উমারাণীকে হারাবার পর এখানকার পুকুরের জলে ডুবে মর্‌তে গিয়েছিলেন। কিন্তু লোকে তাকে মরতেও দেবে না! সবাই ধরাধরি করে তুলেছে। দণ্ডধরবাবু ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করিয়ে ভালো করিয়েছেন। "বিশ্ব ব্যথা নিবারণী সমিতি" কিনা! সেবার কাজও দেখাতে হবে ত'!

মা বল্লেন, আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন—এখানকার ব্যাপারটা কি? উমারাণীর মা ম্লান হেসে জবাব দিলেন, আর আপনি কেন ভাই? এখানে আমরা সবাই তুমি। তোমাকে আস্‌তে দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমাদের একেবারে ঘরের মানুষ। তাই ত' মনের কথা কইতে এলাম। যখুনি এই বাগানের ফটক ডিঙিয়েছ—তখুনি আবার নতুন করে কপাল পুড়ল।

—তুমি বলছ কি উমারাণীর মা? মায়ের মুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। উমারাণীর মা জবাব দেন, তোমার ছেলে ফটিককে ডেকে আমি কথাবার্ত্তা বলেছি। ওর সঙ্গে আগেই আলাপ হয়ে গেছে। তোমায় আমি ফটিকের মা বলেই ডাক্‌বো, কেমন?

মা বল্লেন, তাই ডেকো বোন্। কিন্তু তোমার কথা শুনে বুক আমার কেঁপে উঠ্‌ছে। সব খুলে বলো আমায়। একটুও স্বস্তি পাচ্ছি না আমি।

উমারাণীর মা পেছন ফিরে একবার চ্যাটাইয়ের দিকে তাকালেন। শুধোলেন, ওরা ঘুমিয়েছে ত'? ফটিক আর খুকু?

মা জবাব দিলেন, ওদের এখন দুপুর রাত। তুমি বল বোন্। এই আঁধারী রাতে তোমার হাত ধরে শুনি—আবার কোন প্রেতপুরীতে এসে ঢুক্‌লাম।

উমারাণীর মা বল্লেন, প্রেতপুরীই বটে। এরা মর্‌তেও দেয় না। শুধু সবাইকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়।

তারপর একটু গলা খাটো করে আপন মনেই কইতে লাগ্‌লেন: বিশ্বের ব্যথার জন্যে ত' এদের ঘুম নেই! আসল কথা কি জানো দিদি, এরা ব্যবসা ফেঁদেছে। দলে আছে অনেক লোক। সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্য করেছ বোধ করি—কত রকম বাঁদর আসে যায়। বাঙালী, ভাটিয়া, মারোয়াড়ী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী এমন কি বহু মুশলমানও এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে! উদ্বাস্তু মেয়ে ছেলে দেখ্‌লেই ধরে নিয়ে আসে—কাকুতি মিনতি করে, যেন তাদের উপকার না কর্‌তে পার্‌লে ওদের রাত্তিরে ঘুম হবে না। সবাইকার উদ্বাস্তু সার্টিফিকেট দেখিয়ে সরকার আর দেশের লোকজনের কাছ থেকে প্রচুর চাল, ডাল, কাপড় চোপড় জোগাড় করে। কানাকড়ি যদি বিলোয় তবে বাদ বাকি সব দেয় বিক্রী করে। উদ্বাস্তুদের নামে জমি নেয়—আর নিজেরা ভোগ দখল করে। শুধু কি তাই?

—আবার কি? মার মুখে চোখে দুশ্চিন্তা।

—ছোট মেয়েদের চড়া দরে দূর দূর অঞ্চলে বিক্রী করে দেয়। আমার উমারাণীকে যে দণ্ডধর কোথায় চালান করে দিয়েছে তা কেউ জানে না। অনেক টাকা নাকি পেয়েছে এর জন্যে।

কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন উমারাণীর মা। মায়ের মুখে আর কোনো কথা সরে না!

হতবাক্ হয়ে তিনি খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন।

চোখের জল মুছে উমারাণীর মা আপন মনেই যেন বলে চলেন, তা-ও যে মেয়ের জন্য নিরিবিলি বসে দু'দণ্ড কাঁদবো তারও উপায় নেই! দণ্ডধরের চেড়ীর দল সর্ব্বদা ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। আর কি খাটুনিটাই না খাটিয়ে নেয়—সবাইকে। ঘুঁটে দাও, ঝুড়ি তৈরী করো, কাগজের ঠোঙা বানাও, নানারকম আচার তৈরী করো। সব ব্যবসা। বুঝলে দিদি, আমাদের দিনরাত খাটিয়ে অঢেল টাকা করে নিচ্ছে এই দণ্ডধরের দল।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

কারো মুখে কোনো কথা সরছে না।

দু'জনের বেদনার-পাত্র যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বলবার—কইবার আর কি আছে? আর বেশী কিছু বলতে গেলে বেদনার পাত্র উপ্ছে পড়বে।

হঠাৎ ঘরের কোনে একটি নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ হাঁক শোনা গেল।
—ও উমারাণীকা মা,—বহুৎ রাত হল ঘরকে চলো—

পশ্চিম দেশীয়া এক মোটা স্ত্রীলোক।

যেমন দেখতে—তেমনি তার গলার স্বর।

উমারাণীর মা যে চেড়িদলের কথা খানিকক্ষণ আগে বলেছিলেন—এ তারই একজন,—নাম দুখিয়া। মূর্ত্তিমান্ দুঃখই বটে।

উমারাণীর মা ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, ওই যে—চেড়ির টনক নড়েছে। চল্লাম আমি। ছেলে মেয়ে নিয়ে খুব সাবধানে থেকো।

আমাদের কথাবার্ত্তা কেউ বন্ধ করতে পারবে না। ওই যে, কথা আছে—সাগরে শয্যা পেতেছ—শিশির দেখে ভয় পেলে চলবে কেন?

উমারাণীর মায়ের চোখে-মুখে সর্ব্বহারার ম্লান হাসি।

গভীর রাত।

চ্যাটাইয়ে শুয়ে মা কেবলি এপাশ-ওপাশ করছেন। ঘুম আর কিছুতেই আসছে না। মনে হচ্ছে ব্যাঁকারীর জানালার ফাঁক দিয়ে কে যেন হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। মা প্রাণপণে খুকুকে বুকে চেপে ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলেন।

আটাশ

ফটিক সেদিন লাফাতে লাফাতে এসে তার মাকে বল্লে, এ কোন্ জায়গায় আমরা এলাম মা, গেটে দুটো জাঁদরেল দারোয়ান বসে আছে, বলে কিনা বাহার জানে কো হুকুম নেহি।

মা ফটিককে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কি একেবারেই বাইরে বেরুতে দেবে নারে?

ফটিক উত্তর করলে, তাই ত' শুনলাম মা। ছেলেরা সবাই সেই কথাই আমায় বল্লে। বাগানের ভেতর থাকো, ঝুড়ি তৈরী করো, ঠোঙা বানাও, গাছের শুক্‌নো ডাল কুড়িয়ে জড়ো করো, বড় জোর সন্ধ্যেবেলা খানিকক্ষণ খেলা করতে পাবে। বাইরে বেরুতে গিয়েছ কি হুকুম নেহি— !

মায়ের চোখ দুটো হঠাৎ একবার জ্বলে উঠল। তিনি বল্লেন,

আচ্ছা, আমি দণ্ডধরবাবুকে না হয় মুখোমুখি জিজ্ঞেস কর্‌বো—এভাবে আমাদের আট্‌কে রাখার অর্থ কি ?

—দণ্ডধরবাবুকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই—গম্ভীরকণ্ঠে তখুনি জবাব এলো।

মা তাকিয়ে দেখেন,—সাম্‌নে দণ্ডধরবাবু দাঁড়িয়ে, তার পেছনে সেই দুখিয়া ঝি। দণ্ডধরবাবু বল্লেন, এখানে যারা একবার ঢোকে তারা আর বাইরে যেতে পারে না। অবশ্য খাওয়া থাকার সব ভারই আমরা নেবো।

মা লক্ষ্য করে দেখ্‌লেন, কালকের 'আপনি' আজ হঠাৎ তুমি হয়ে গেছে। দণ্ডধরবাবুর কঠিন মুখে ভদ্রতার লেশমাত্র ছাপ নেই !

তার মুখোস যেন একেবারে খসে পড়ে গেছে।

দণ্ডধরবাবু আবার বল্লেন, এখানে প্রত্যেককে কাজ কর্‌তে হয়। বসে বসে ত' আমরা কাউকে খাওয়াতে পারিনে। দুখিয়া ঠোঙা তৈরী শিখিয়ে দেবে। তারপর ঝুড়ি তৈরী করার কৌশলও দেখিয়ে দেবে। আচ্ছা আমি চলি—অফিসে বহু কাজ জমে আছে—

একটা ভারী পাল তোলা জাহাজের মতো নিজের গর্ব্বেই দণ্ডধর বাবু অফিসের দিকে চলে গেলেন।

দুখিয়া এক বোঝা খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে বল্লে, এ খুকুর মা, বসে বসে ঠোঙা বানাও। লেই ভি মিলবে। হামি ফিন্‌ আস্‌বে।

গজেন্দ্র গামিনীর মতো দুখিয়াও সরে পড়ল অন্যদিকে। রাগে ফটিক এতক্ষণ দাঁত কিড়মিড় কর্‌ছিল। দুখিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে সে বল্লে, ওই গুঁফো লোকটা আচ্ছা বদ্‌মাস ত'। তুমি কি ঝি নাকি যে এখানে এসে তোমায় ঠোঙা বানাতে হবে, ঝুড়ি তৈরী

কর্‌তে হবে, ঘুঁটে দিতে হবে— ? চলো, আজই তোমায় আর খুকুকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। দেখি কোন্ ব্যাটা আট্‌কায়—

একটুখানি চুপচাপ থেকে মা জবাব দিলেন, কিন্তু ফটিক গোঁয়ার্তুমি কর্‌লে হয়ত আমরা আরো বিপদে পড়বো। আমাদের উচিত হবে—কয়েকটা দিন চুপচাপ থেকে—এখানকার হালচাল বোঝা। তারপর একটা বিহিত কর্‌তেই হবে। এখন যেন কোনো রকম রাগারাগি কর্‌তে যাস্‌নে। ওই দণ্ডধরবাবু লোকটা আদপেই ভালো নয়। আগে যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝি—তবে কি আমরা ওর গাড়ীতে উঠি ?

ফটিক মায়ের কোল ঘেঁসে ফিস্‌ফিস্ করে বল্লে, জানো মা, আমি কত প্ল্যান্ ঠিক করে রেখেছিলাম। ষ্টেশনে যদি একবার কোনো রকমে যেতে পার্‌তাম তবে সেই ভদ্রলোককে ধরে শুধু খবরের কাগজ বিক্রী করেই মাসে ষাট টাকা উপায় কর্‌তাম। কিন্তু গুঁফো ব্যাটা যে এমন করে আমাদের ফাঁদে ফেলবে সে কথা ত' আদপেই ভাবতে পারিনি।

এমন সময় দুখিয়াকে সেইদিকে আস্‌তে দেখে মা বল্লেন, চুপ। ওদের সাম্‌নে এসব কথা কিছু বলিস্ নি যেন।

মায়ের ইসারা পেয়ে ফটিকও সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ কর্‌লে।

দুখিয়া কিছু লেই নিয়ে এসেছে। ঠোঙা তৈরীর ব্যবস্থা করে দিতে। আর তার সঙ্গে রয়েছে ঝুড়ি তৈরী কর্‌বার সরু চাঁছা বাখারী ; তৈরী কর্‌বার কলা-কৌশলটা শিখিয়ে দিয়ে যাবে।

মা বুঝলেন, এখানে কোনো মতেই সময় নষ্ট করা চলবে না। রান্না করাটা তারই এক ফাঁকে কোনো রকমে সেরে নিতে হবে।

দুখিয়া ঝুড়ি তৈরী করাটা মাকে শিখিয়ে দিয়ে বাঁকা চোখে

তাকিয়ে বল্লে, এই বাগানে যে আওরৎ সব-সে-সেরা ঝুড়ি বানাতে পার্‌বে—মাহিনা শেষে বাটি-ভর দুধ মিলবে তার।

অতি দুঃখে মা এইবার হেসে ফেল্লেন। ভালো ঝুড়ি তৈরী কর্‌তে পার্‌লে মাসের শেষে এক বাটি দুধ মিলবে।

নিজের দেশের বাড়ীর দুধোলো গাইগুলির কথা মনে পড়ল।

মায়ের চোখ দুটি আপনা থেকেই জলে ভরে এলো।

ফটিক মায়ের ব্যথা বুঝতে পেরে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে এলো। তার মনের যে অবস্থা তাতে যে কোনো সময় সে দুখিয়ার মাথা নিয়ে ফুটবল খেলা সুরু করে দিতে পারে!

কিন্তু মা বলেছেন, এখন কোনো মতেই রাগারাগি করা চলবে না। তাতে নাকি তারা বিপদে পড়তে পারে।

মায়ের বিপদ হয়েছে আরো বেশী।

মনে যখন আগুন জ্বলতে থাকে অথচ প্রতিকারের কোনো উপায় নেই—তখন মায়ের হাত আরো বেশী দ্রুত হয়ে জড়িয়ে পড়ে নানা কাজে। ফলে—মা অন্যমনস্ক হয়ে রাশি রাশি ঠোঙা তৈরী করে ফেলেন; প্রচুর ঝুড়ি তৈরী করে তোলেন; আর সে ঝুড়ি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবার মতো।

মানুষ যখন মানুষের দুর্ব্বলতার সন্ধান পায়—তখন তাকে নানাভাবে কাজে লাগায়—সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে আরো তৎপর হয়ে ওঠে।

দণ্ডধরবাবু বেশ লক্ষ্য করে দেখলেন যে, মায়ের মুখে একেবারে কথা নেই। অন্য সবাইকার মতো কোন্দল বা কলহের ধার দিয়ে যান

না তিনি। শুধু মেশিনের মতো হাত চলেছে তার। কখনো ঘুঁটে দিচ্ছেন, পর মুহূর্তে ঠোঙা তৈরীর কাজে বসে গেছেন; আবার খানিকটা বাদে দেখা যাবে যে, নিজের কুঁড়ের দাওয়ায় বসে কেবলি ঝুড়ি বুনে চলেছেন।

এই মহা সুযোগের সুবিধে কে না নেয়?

ফলে দণ্ডধরবাবু তাঁর ওপর কেবলি কাজ চাপাতে লাগলেন। —গামছা তৈরীর কাজ, চামড়ার কাজ, সোয়েটার তৈরীর কাজ।

উমারাণীর মা বলেন, দণ্ডধরবাবু নাকি এর থেকে প্রচুর লাভ করে থাকেন। কিন্তু মায়ের খাওয়ার জন্যে কী বা এমন খরচ হয় দণ্ডধরবাবুর?

কিছুটা আতপ চাল, দুটো আলু বা বেগুন, কিছুটা শাক। না দুধ, না দৈ, না অন্য কোনো পুষ্টিকর ফল বা তরী তরকারী।

অমানুষিক পরিশ্রম দিনে-রাতে, আর অল্প আহার। ফলে যা হবার তাই হল।

মায়ের শরীর একেবারে ভেঙে পড়তে লাগলো।

উমারাণীর মা তাকে ধমক দিয়ে বলেন, দিদি, এই রকম করে খেটে খেটে যে তুমি মারা পড়বে।

মা উদাসভাবে তাঁর দিকে তাকান, কোনো জবাব দিতে পারেন না।

ফটিক এসে প্রায়ই তাগিদ করে, মাগো, আমরা যে লেখাপড়া একেবারে ভুলে গেলাম। তোমার কত আশা ছিল—আমরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবো, তোমার দুঃখ দূর হবে, কত টাকা রোজগার করবো —সে সব কথা কি তুমি একেবারে ভুলে গেলে?

মা শুধু ছেলের মুখখানি নিজের হাড় বের করা শুক্‌নো বুকে জড়িয়ে ধরেন। চোখের জল মায়ের শুকিয়ে গেছে। কথায় কথায় আর তা পড়ে না! যেখানে ছিল ছায়ায় ঘেরা স্নিগ্ধ সরোবর—আজ সেখানে একটি বালিময় মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে!

মুখে কথা নেই। মনের জ্বালা ভোলবার জন্যে দিন রাত্তির কাজ করে চলেছেন মা। হাতের এতটুকু বিশ্রাম নেই তাঁর!

সারাদিন ধরে এমন খাটুনি···কিন্তু সারা রাত ঘুম নেই মায়ের! শুধু চ্যাটাইয়ে শুয়ে এপাশ আর ওপাশ!

মায়ের ব্যথা এই প্রেতপুরীতে কে বুঝ্‌বে?

এক পাশে ফটিক—এক পাশে খুকু।

তুবেলা শুধু ভাত-ডাল পায়। মাঝে মাঝে তরী-তরকারী। ক্ষিদের জ্বালায় ওরা এমন নেতিয়ে পড়ে অঘোরে ঘুমায় যে, বেঁচে আছে কিনা তাও বোঝা যায় না!

মা ওদের তুটির চোখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারেন না।

মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে আর দৃষ্টি উদাস হয়ে যায়।

বাগানের মধ্যেকার ওই পুকুরের ঠাণ্ডা জল। উমারাণীর মা নাকি ওরি মধ্যে একবার ডুবে মর্‌তে গিয়েছিলেন। মা-ও হয়ত বুকের জ্বালা জুড়োতে—ওই শীতল জলের আশ্রয় নিতেন। কিন্তু তাঁর অভাবে ফটিক আর খুকুর কি হবে?

স্বর্গে গিয়েও ত' মা সোয়াস্তি পাবেন না।

আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন মা।

পাঁজরের হাড়গুলি এক এক করে গোনা যায়। চ্যাটাইয়ে পাশ ফির্‌তে বেশ লাগে। শরীরে এখন আর মাংস নেই···শুধু হাড় ক'খানা।

খুকু মাঝে মাঝে তার গলা জড়িয়ে ধরে শুধোয়, একি তোমার চেহারা হয়ে গেল মা? তোমায় যে আমি আর চিন্‌তে পারছি না! তারপর একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, আর কি আমরা দেশের বাড়ীতে ফিরে যাবো না মা?

মার মুখে কোনো জবাব জোগায় না!

কি যেন একটা জ্বালা কেবলি বুকের মধ্যে পাক্ খেতে থাকে।

মার যেন সত্যি কি হয়েছে!

ছেলেমেয়ের নিরাপত্তার জন্যেই বুঝি মা তাদের দিকে ভালো করে তাকাতে পারেন না! কেবলি মনে হয়—কোন দিক দিয়ে বুঝি ওদের বিপদ আস্‌বে!

ক'দিন থেকে ওদের কাছে ডেকে ভালো করে কথা বল্‌তে পারেন না। খাওয়ার পর ওদের পেট ভরেছে কিনা এ কথা জিজ্ঞেস করতে সত্যি ভয় পান! যদি ওরা হঠাৎ বলে বসে, মা, আর একটু ভাত দাও—

তাই দাঁতে-দাঁত চেপে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন।

উমারাণীর মা মাঝে এসে বসেন,—কিন্তু মা, মন খুলে কথা বল্‌তে পারেন না! আশে-পাশে কে যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে। গভীর রাতে কে যেন জানালা দিয়ে ড্যাব্ ডেবে চোখ মেলে তাকায়।

প্রেতের মতো কে তাকে এমন করে অনুসরণ করে!

ফটিক কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছে যে, খুকু বাগানের দুষ্টু মেয়েদের সঙ্গে মিশে এর-ওর ঘর থেকে রান্নাভাত কি খাবার চুরি করে খাচ্ছে!

ক্ষিদের কি জ্বালা ফটিক সেটা বেশ বুঝ্‌তে পারে।

ও যে মাঝে মাঝে গিয়ে টিউবওয়েলের জল খেয়ে পেট ভরায় সে কথা তার মা-ও জান্‌তে পারে না!

কিন্তু ছোট্ট মেয়ে খুকু!

সত্যি কী তার দোষ? দেশের বাড়ীতে ছানা, সন্দেশ, পায়েস, সাধলেও খেতোনা, পাড়ার মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। সেই খুকু আজ এর ওর ঘর থেকে ভাত চুরি করে খাচ্ছে।

বড় ভাই হয়েও ত' ফটিক শাসন করতে সাহস পাচ্ছে না!

লজ্জায় আর গ্লানিতে ওর চোখ দুটো আপনা থেকেই মাটির দিকে নেমে আসে। পেটের ক্ষিদেয় ও কাজ করছে খুকু। তাকে বারণ করতে ফটিকেরই মাথা কাটা যাবে।

খুকু যদি জল ভরা চোখে বলে, বড্ড ক্ষিদে পায় যে দাদা! তখন সে কি জবাব দেবে ওই ছোট্ট মেয়েটার কাছে? দু'মুঠো মুড়িও ত' সে বোনের কোচড়ে তুলে দিতে পারবে না!

তবে কোন্ মুখ নিয়ে সে বোনকে শাসন করতে এগিয়ে যাবে?

ভেবে-ভেবে ফটিক আর কূল-কিনারা খুঁজে পায় না।

শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থা হল যে, মা ছেলেমেয়েকে কোনো কথা জিজ্ঞেস্ করতে ভরসা পায় না; ছেলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কথা বল্‌তে পারে না; আর ছোট মেয়ে খুকু মা ও দাদার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে।

এই সময়কার একদিন সন্ধ্যে বেলার ঘটনা।

বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে,—খুকু বাগানের মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা শেষ করে একা একা গাছতলা দিয়ে ফিরে আস্‌ছে।

একটা ঘন আমগাছের নীচে যেখানে আঁধারটা খুব জমাট বেঁধে রয়েছে—সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন দণ্ডধরবাবু।

খুব ছুটোছুটি করে খেলেছে খুকু। ফিরতি পথে এখন বেশ বুঝ্‌তে পারছে যে, ক্ষিদেয় তার পেট জ্বলে যাচ্ছে! সারা ব্রহ্মাণ্ড খেলেও ক্ষিদে মিট্‌বে না—এমনি সে জ্বালা! মায়ের কাছে গেলে মিল্‌বে—ও-বেলার শুক্‌নো কড়কড়ে ভাত আর খানিকটা ডাল। তরকারী কিছু আছে কিনা তাও বলা যায় না! খেল্‌তে খেল্‌তে খানিকটা পুকুরের জল আজ্‌লা করে খেয়ে নিয়েছে। তাতে পেটের ভেতরটায় এখন পাক্ দিচ্ছে!

সেই আম গাছটার কাছে আস্‌তে—দণ্ডধরবাবু এগিয়ে এলেন। বল্লেন. এই যে খুকু, খেলা শেষ করে বাড়ী ফিরছ বুঝি?

খুকু হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে কথা শুনে থম্‌কে দাঁড়ালো। তারপর দণ্ডধরবাবুকে চিন্‌তে পেরে বলে,—হ্যাঁ. মার কাছে যাচ্ছি—

দণ্ডধরবাবু এক গাল হেসে ফেল্লেন। বল্লেন, আমি বাগানের ছেলে-মেয়েদের এক একদিন এক একজনকে সন্দেশ খাওয়াই। আজ কিন্তু তোমার পালা।

খুকু ঠোঁট উল্টে জবাব দিলে, আপনি খাওয়াবেন সন্দেশ! তবেই হয়েছে!

দণ্ডধরবাবু আজ যেন জিবে মধু মাখিয়ে এসেছেন।

বল্লেন, না-না, তুমি জানো না খুকু। সবাইকে অবাক করে দেওয়াই ত' আমার কাজ! কেউ জানে না, কিন্তু এক একজন এক

একদিন চুপ করে লুকিয়ে আমার সঙ্গে গিয়ে ভালো ভালো সন্দেশ খেয়ে আস্‌ছে।

এইবার খুকুর আগ্রহ ফিরে এলো।

সন্দেশ কতদিন সে চোখে দেখেনি···খাওয়া ত' দূরের কথা!

শুধোলে, সত্যি? আপনি আমায় সন্দেশ খাওয়াবেন? না—মিছিমিছি দুষ্টুমী করছেন?

দণ্ডধরবাবু বিগলিতকণ্ঠে বল্লেন, না-না খুকু, তোমার সঙ্গে কি আমি দুষ্টমী করতে পারি? ভালো ভালো সন্দেশ। মুখে দিলে একেবারে গলে যাবে। কাউকে যেন আবার বলে দিও না তুমি। তা হলে সবাই এসে আমায় ছেঁকে ধরবে!

—কী মজা! সন্দেশ আপনি তাহলে সত্যি খাওয়াবেন? আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে খুকু লাফাতে থাকে!

—নয়ত কি? তোমার মতো ভালো মেয়েকে কি আমি ঠাট্টা করতে পারি? দণ্ডধরবাবুও হাস্‌তে থাকেন। যেন ছোটদের সন্দেশ খাওয়াতে না পারলে তাঁর রাত্তিরে ঘুম হয় না!

খুকু একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্লে, তা'হলে আমি ছুটে গিয়ে মাকে চট্ করে বলে আসি—আপনি এইখানে একটু দাঁড়ান। আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবেন না যেন!

দণ্ডধরবাবু ফস্ করে খুকুর হাতটা ধরে ফেলে বল্লেন, পাগল হয়েছ। এখন মাকে বল্‌তে গেলে—লোক জানাজানি হয়ে যাবে। অনেক ছেলে-মেয়ে জুটে যাবে; তার চাইতে এখুনি আমার সঙ্গে চলো। বাইরে জীপ গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—

—ওই যে-গাড়ীটায় আমরা এখানে এসেছিলাম? খুকু প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! কেমন জোরে চলে দেখছ ত'। আমরা যাবো আর আস্‌বো। কেউ জান্‌তে পার্‌বে না। হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দেন দণ্ডধরবাবু।

কোঁক্‌ড়া চুল দুলিয়ে খুকু বলে,—তা হলে সেই কথাই ভালো। কিন্তু খুব শীগ্‌গির ফিরে আস্‌তে হবে। নইলে মা আবার খোঁজাখুঁজি কর্‌বে।

খুকুর ছোট্ট হাতটা ধরে গেটের দিকে রওনা হয়ে দণ্ডধরবাবু বল্লেন, সে কথা আর বলতে! তোমাকে তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ। কিন্তু লক্ষ্মিটি, সন্দেশ খাওয়ার কথা অন্য মেয়েদের বলে দিও না যেন।

ঘাড় নেড়ে খুকু সম্মতি জানালে।

গেটের কাছে যেতেই দুটো দারোয়ান উঠে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো।

জীপ গাড়ীখানা বাইরে তৈরী হয়েই ছিল।

ড্রাইভার দরজা খুলে দিলে।

দণ্ডধরবাবু আদর করে বল্লেন, চলো খুকু, আমরা ভেতরে গিয়ে বসি। খুকু বল্লে, ভারী মজা হল। কেউ জান্‌তে পার্‌ল না। দাদা না, মা-ও না।

একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে জীপ তীরবেগে ছুটে চল্লো।

ঊনত্রিশ

মা ফটিক আর খুকুর জন্যে রাত্তিরের ভাত চাপিয়েছিলেন।

ওবেলার নিরিমিষ তরকারী আর ডাল রয়েছে। দাওয়ায় বসে তোলা উনুনে শুধু ভাতটা সেদ্ধ করে নিলেই সন্ধ্যের মতো নিশ্চিন্দি।

পাশে বসে উমারাণীব মা সুখ-দুঃখের কথা কইছিলেন। যে মাকড়শার জালে জড়িয়ে পড়েছেন—তা থেকে কোনো মতেই আর নিস্তার নেই কারো।

মা কথা কম বলেন শুধু শুনে যান।

ফটিক বল্লে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে—কেমন গাড়ীতে চাপিয়ে আমাদের এখানে এনে আট্‌কে রাখলো। আগে যদি একটুও বুঝতে পারি যে গুঁফো লোকটার মতলব ভালো না—তবে কি আর তার কথা শুনি?

উমারাণীর মা জবাব দিলেন, কতকগুলো লোক আছে সংসারে যারা সব সময় মুখোস পরে বেড়ায়। হঠাৎ দেখে তাদের চেনা যায় না। অচেনা মানুষ—যারা দুঃক্ষু-কষ্টে এমনি নেতিয়ে পড়ে আছে তারা অতি সহজেই ওদের কথায় বিশ্বাস করে ফাঁদে পা দেয়। সে ফাঁদ থেকে আর কোনো মতেই মুক্তি পায় না।

মা এবারেও কোনো কথা বল্লেন না; শুধু কাঠি দিয়ে হাঁড়ি থেকে একটা ভাত তুলে নিয়ে টিপে দেখলেন, সেদ্ধ হয়েছে কিনা।

ফটিক গলাটা একটু খাটো করে বল্লে, জানো মা, আমি যদি কোনো রকমে একবার বাইরে বেরুতে পারি—একটা চাকরী জোগাড়

করে নিতে আমার বেশী দেরী হবে না। সঙ্গে সঙ্গে থানাতেও একটা খবর দিয়ে দেবো—এই দণ্ডধরের সমস্ত কীর্ত্তি-কাহিনী জানিয়ে।

উমারাণীর মা জবাব দিলেন, কিন্তু ওই লোকটার চর আর চেড়ির দল সব সময় বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি করে তুমি বেরুবে বাবা? তা ছাড়া তুমি বাচ্চা ছেলে—থানার লোক কি তোমার কথা শুন্‌বে?

ফটিক উত্তেজিত হয়ে বল্লে, কেন শুন্‌বে না? আমি সমস্ত কথা বলে দেবো তাদের। বলবো, আপনারা বাগান ঘেরাও করুন,—খানাতল্লাসী করুন—সব খবর বেরিয়ে যাবে।

উমারাণীর মা একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উত্তর কর্‌লেন, কি জানি বাপু! আমরা মেয়ে ছেলে বুঝি কম। ওই ধড়িবাজ গুঁফো লোকটা কার হাতে কত টাকা গুঁজে দেবে—আর সব যাবে ভেস্তে! আর মাঝখান থেকে তুমি ছোট ছেলে—সহায় নেই—সম্পদ্ নেই—তুমিই পড়বে বিপদে।

মা এইবার মুখ খুল্লেন। বল্লেন, না ফটিক, তুই ছেলে-মানুষ। হুট্ করে আমায় না জানিয়ে কিছু যেন কর্‌তে যাস্‌নে।

উমারাণীর মা আপন মনেই ফোঁড়ন কাট্‌লেন, আমাদের অদৃষ্টে যে শেষ পর্য্যন্ত কি আছে তা ভগবানই জানেন।

মা ইতিমধ্যে ভাত নামিয়ে ফ্যান্ গালতে স্বুরু করেছেন। তারপর হাঁড়িটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তোলা উন্নুনের মৃদু আঁচে আলতো করে বসিয়ে রাখ্‌লেন।

এইবার তাঁর বাইরের দিকে নজর দেবার একটু ফুরসৎ হল। ফটিকের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, হ্যাঁরে, খুকু এখনো ফিরে এলো

না? মেয়েরা কি অন্ধকারেও বাগানের ভেতর ছুটোছুটি খেলছে নাকি?

ফটিক একবার বাগানের দিকে তাকিয়ে বল্লে, আজকাল যা দুষ্টু হয়ে উঠেছে খুকু। কি রকম কলাগাছের মতো লম্বা হয়েছে দেখেছ মা! আর তার সঙ্গী-সাথীও জুটেছে সেই রকম।

উমারাণীর মা বল্লেন, মেয়েকে চোখে-চোখে রেখো ফটিকের মা! এ জায়গাটা মোটেই ভালো না। অম্‌নি ধম্মের নামে ছেড়ে দিয়েই ত' আমি আমার উমারাণীকে হারালাম। কি আর এমন বয়েস হয়েছিল ওর? মোটে চৌদ্দ ছাড়িয়ে পনেরো'তে পা দিয়েছিল।

মায়ের বুকের ভেতর কেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। বল্লেন, অন্ধকার হয়ে গেছে। ভালো করে তাকিয়েই দেখি-নি। যা ত' ফটিক, খুঁজে নিয়ে আয় ওকে। আজ সত্যি আমি ওকে শাসন কর্‌বো। মেয়ে ছেলের এত বাড় কি ভালো? খেলবি খেল। কিন্তু আঁধার হয়ে গেল তবু ধিঙ্গি মেয়ের বাড়ী ফেরার নাম নেই।

ঘর থেকে ফটিক চীৎকার কর্‌তে সুরু কর্‌ল, ওরে খুকু— শীগ্‌গির বাড়ী আয়—খুকু—কোথায় গেলি রে—

—আর একটু এগিয়ে দেখ বাবা—মা বল্লেন। ফটিক ডাক্‌তে ডাক্‌তে চলে গেল বাগানের আর এক প্রান্তে।

মা সত্যি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। খেলার পর বাড়ী ফির্‌তে এত দেরী ত' খুকু কোনো দিন করে না।

বল্লেন, আমারই দোষ উমারাণীর মা। ঝুড়ি তৈরী করার কাজে এত বেশী ঝুঁকে পড়েছিলাম—যে সারা বিকেলে মেয়েটার একবার খোঁজও করিনি। খেলতে যাবার আগে খিদে-খিদে কর্‌ছিল, আমি

বল্লাম, এখন খাবার কিছু নেই। খেলে এসে একেবারে ভাত খেয়ে নিস্।

মুখ ভার করে মেয়েটা চলে গেল! ডেকেও ফেরালুম না। ইতিমধ্যে খুকু-খুকু বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ফটিক আবার ফিরে এলো। শুধোলে, খুকু কি ফিরে এসেছে মা? ওদের খেলার জায়গায় ত' কাউকে দেখলাম না। যে যার ঘরে চলে গেছে।

মা ব্যস্ত হয়ে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এলেন। বল্লেন, বলিস্ কি রে? তবে মেয়েটা গেল কোথায়? ক্ষিদের সময় মেয়েটার মুখে দু' মুঠো মুড়িও তুলে দিতে পার্‌লাম না!

ফটিক মাকে একটু একান্তে ডেকে নিয়ে গেল। বল্লে, আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছি মা!

মা ভুরু কুঁচকে শুধোলেন, কি বলবি বল না—

ফটিক জবাব দিলে, ও ক্ষিদে সইতে না পেরে ওর সাথীদের সঙ্গে অন্য কোনো ঘরে চলে যায়নি ত'?

মা মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে বল্লেন, না-না তা যাবে কেন? ক্ষিদে পেলে সোজা আমার কাছেই চলে আস্‌বে। বরাবর ত' তাই-ই আসে।

পেটের ক্ষিদে যে মানুষকে একটু একটু করে বদ্‌লে দেয় সে কথা ফটিক ভালো করে মাকে বুঝিয়ে বলতে পার্‌ল না।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মা বল্লেন, খুকু এই বাগান ছেড়ে ত' কোথাও যায়নি। ওর বড্ড খিদে পেয়েছে; তাই বোধ করি অভিমান করে কারো ঘরে গিয়ে লুকিয়ে রয়েছে।

এমন সময় একটি মেয়ে এসে ফটিকের কাছে দাঁড়ালো। নাম তার শীতলা। খুকুর সমবয়সী আর খেলার সাথী।

মায়ের কথাগুলি তার কানে গেছে। শীতলা বল্লে, না মাসিমা, কিছুক্ষণ আগে আমি অফিসে গিয়াছিলাম—দুশো ঠোঙা জমা দিতে। তার আগেই ত' আমাদের খেলা শেষ হয়ে গেছে। খুকু বল্লে, তার ক্ষিদে পেয়েছে তাই তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলো।

শীতলার কথা শুনে মা ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; উমারাণীর মাকে বল্লেন, তুমি বোন্ ভাতটা একটু ঢেকে রাখো, আমি নিজে গিয়ে খুকুকে খুঁজে আনি। ও আমার ওপরই অভিমান করে আছে। খিদে সে কোনো দিনই সইতে পারে না।

কেউ কিছু বলবার আগেই মা দ্রুতপদে সেই বাগানের পথে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

উমারাণীর মা ফটিককে বল্লেন, দাওয়ায় এসে বোসো বাবা! তোমার মা এক্ষুনি ফিরে আস্‌বে। দেখ-দিকিনি কি অদৃষ্টের গেরো, সাম্‌নে রাঁধা গরম ভাত···কপালে না থাক্‌লে এম্‌নি হয়।

তিনি দাওয়ার ওপরে উঠে একটা মালসা দিয়ে হাঁড়ির মুখটা ঢেকে রাখলেন।

ওদিকে বাগানের আর এক প্রান্ত থেকে ব্যাকুল মায়ের বুক-ফাটা ডাক ভেসে আস্‌তে লাগলো—খুকু, ওরে আমার খুকু, বাড়ী আয়—

ফটিক দাওয়ায় বসে ভাবতে লাগলো, মা-ত' কখনো এমন চীৎকার করে কাউকে ডাকে না। আজ মার হল কি?

মায়ের মন বুঝি অমঙ্গলের কথা ঠিক বুঝতে পারে। কোথা থেকে একটা ঢিল গিয়ে আচম্‌কা বুকের মধ্যিখানে লাগে। সারাটা দেহ আর মন ব্যথায় রি-রি করে ওঠে···মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌তে থাকে—মনে হয় বিশ্ব সংসার বুঝি ফাঁকা হয়ে গেল। হাতের কাছে কুটো গাছটিও অবলম্বন রূপে খুঁজে পাওয়া যায় না!

নিমাইকে হারিয়ে শচী মাতা বুঝি এমনি বুক ফাটা চীৎকার করে গঙ্গার তীরে তীরে পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছিলেন।

মায়ের সেই চীৎকারে বাগানের কুঁড়ে ঘরগুলি থেকে মেয়ে-বৌঝিরা এসে ভীড় করে দাঁড়ালো; কেউ বা সান্ত্বনা দিতে লাগলো। মেয়েরা দল বেঁধে খুঁজতে লাগলো খুকুকে। কিন্তু কোনো ঘরেই তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না!

এতক্ষণ উমারাণীর মা কোনো কথাই বলেন নি। এইবার তিনি ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে বল্লেন, আমার কিন্তু অন্য রকম সন্দেহ হচ্ছে।

মা ছুটে গিয়ে তার হাত ছ'খানি চেপে ধরে শুধোলেন, কি তোমার সন্দেহ হচ্ছে বোন, আমায় খুলে বলো—কিচ্ছু তুমি লুকিও না।

সবাইকার চোখ এসে পড়ল উমারাণীর মায়ের ওপর। তিনি চারদিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বল্লেন, এ ওই মুখপোড়া দণ্ডধরের কাজ।

মা যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠ্‌লেন। —অ্যাঁ! তুমি বল্‌ছ কি বোন! আমার দুধের মেয়ে খুকু। দণ্ডধর তাকে নিয়ে কি কর্‌বে?

উমারাণীর মা একবার কথাটা চাপ্‌তে চেষ্টা করলেন। তারপর

হঠাৎ বলে ফেল্লেন, দূর দেশে বিক্রী কর্‌বে! ওই শয়তানটার অসাধ্য কিছুই নেই।

মা কিন্তু কথাটা বিশ্বাস কর্‌লেন না।

হঠাৎ পাগলের মতো বাগানের আর একদিকে ছুটে গিয়ে চীৎকার কর্‌তে লাগলেন ;—ওরে খুকু ফিরে আয়, আমি যে তোর জন্যে গরম ভাত রান্না করে রেখেছি—

গিন্নি-বান্নি যাঁরা আশে-পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তারা ফটিককে ইসারা করে ডেকে বল্লেন, ও বাছা, তুমি ছুটে যাও—তোমার মাকে ধরে নিয়ে এসো ;—অন্ধকারে কোথায় হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে মাথা ভেঙে ফেল্‌বে।

ফটিক মায়ের ব্যস্ততা দেখে সত্যি হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল। এইবার ছুটে গিয়ে বল্লে, মা, ঘরে চলো, খুকু হয়ত খাওয়ার জন্যে দাওয়ায় গিয়ে বসে আছে।

ছেলের কথা শুনে মা থম্‌কে দাঁড়ালেন। তারপর মাথা নেড়ে বল্লেন, ঠিক। ঠিক। ক্ষিদে ও সইতে পারে না। ফিরে গিয়ে দেখব—ঠিক দাওয়ায় বসে আছে

মা ছেলের হাত ধরে ফিরে এলেন।

গিন্নি-বান্নির দল তাদের নিয়ে আবার ফটিকদের দাওয়ায় ফিরে এলেন।

না সেখানেও খুকুকে পাওয়া গেল না।

মা দাওয়ার ওপর অসহায়ের মতো বসে পড়লেন।

এমন সময় সেখানে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলো দুটি ছেলে। গোবিন্দ আর গোপেশ। উত্তেজনায় ওরা দুটিতেই হাঁফাচ্ছে। গোবিন্দ বল্লে,

এই গোপেশ কি বল্‌ছে তোমরা সবাই শোনো—একজন বয়স্কা মহিলা শুধোলেন, হ্যাঁরে গোপেশ, তুই কিছু জানিস্? খুকুকে দেখেছিস্?

গোপেশ চোখ দুটো বড় বড় করে জবাব দিলে, সেই কথাই ত' বল্‌তে এলাম। আজ সন্ধ্যেবেলা আমি একটা ঝাপড়া আম গাছে উঠে লুকিয়েছিলাম। পালাবার ফন্দীই খুঁজ্‌ছিলাম। হঠাৎ দেখি সেই গাছ তলায় দণ্ডধর ব্যাটা। খুকুকে বল্লে, সন্দেশ খাওয়াবো। খুকুটা এমন বোকা। সেই শয়তানটার কথায় ভুলে সন্দেশের লোভে জীপে করে ওর সঙ্গে চলে গেল।

তারপর একটা ঢোক্ গিলে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, কিন্তু খুকু কি এখনো ফিরে আসে নি?

মা চীৎকার করে উঠলেন, না-না, আমার খুকু এখনো ত' ফিরে এলো না—তোমরা খুঁজে পেতে তাকে এনে দাও—সে ক্ষিদেয় যে কাঁদছে!

হঠাৎ একটা মোটা গলা শোনা গেল—এখানে এত ভীড় কিসের?

সবাই চম্‌কে গেল। তাকিয়ে দেখ্‌লে—সে আর কেউ নয়—স্বয়ং দণ্ডধরবাবু। সঙ্গে দুটো জোয়ান হিন্দুস্থানী চাকর।

দণ্ডধরবাবুকে দেখে মায়ের চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ল। ছানা হারিয়ে বাঘিনীর যে অবস্থা হয় হঠাৎ মায়ের শান্ত মূর্ত্তি সেই রকম উগ্র হয়ে উঠল।

কেউ বাধা দেবার আগেই তিনি পাগলের মতো ছুটে গিয়ে দণ্ডধর বাবুর জামার কলার চেপে ধরে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লেন, দাও—দাও আগে আমার খুকুকে ফিরিয়ে দাও—

কিন্তু এর পরেও যে আকস্মিক ঘটনাটি ঘটল তার জন্যে কেউ একেবারে প্রস্তুত ছিল না। মায়ের শরীর ক্ষয়ে গিয়ে ভেতরে ভেতরে একেবারে ঝাঁজ্‌রা হয়ে গিয়েছিল। দেহের ও মনের এই উত্তেজনার ঢেউ শরীর কিছুতেই বইতে পার্‌ল না।

হিন্দুস্থানী জোয়ান চাকর ছুটো ছুটে এসেছিল বটে, কিন্তু তার আগেই মা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

মেয়েরা করুণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন.—ওমা, উনি অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন যে!

উমারাণীর মা তাঁকে তুল্‌তে গিয়ে পাথরের মূর্ত্তির মতো নির্ব্বাক হয়ে রইলেন।

মায়ের দেহে আর প্রাণ নেই! ফটিক ছুটে গিয়ে তাঁর বুকে লুটিয়ে পড়ে ধরা গলায় ডাক্‌লে মা—মা!

কিন্তু পৃথিবীর সব কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে যে মুক্তি পেয়েছে তার কণ্ঠ থেকে আর কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না!

দণ্ডধরবাবুকে করিৎ-কর্ম্মা লোক বল্‌তেই হবে।

কিছুতেই তিনি ঘাবড়ান না।

মেয়েদের সব হটিয়ে দিয়ে হিন্দুস্থানী জোয়ানদের সাহায্যে তিনি মায়ের মৃত দেহটি তাড়াতাড়ি অফিস ঘরে এনে বন্ধ করে ফেল্লেন।

দণ্ডধরবাবুর হাতে ডাক্তারও আছে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে লোক ছুটে গেল চিঠি নিয়ে।

দণ্ডধরবাবু ডাক্তারকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌তে, তিনি রোগী

হার্টফেল করে মারা গেছে—এই রকম একটা "ডেথ্ সার্টিফিকেট্" লিখে দিলেন। কাজেই তাড়াতাড়ি সৎকারের ব্যবস্থা কর্তেও কোনো অসুবিধে হল না !

গভীর রাত !

সারাটা বাগান যেন নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। কোনো ঘর থেকে একটা ছোট ছেলের কান্নাও শোনা যায় না !

শুধু মাঝে মাঝে দু' একটা কালপ্যাঁচা কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠ্ছে।

ফটিক যে মায়ের মৃত দেহের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তারপর আর তার জ্ঞান ফিরে আসেনি।

ওর খেলার সাথীরা ধরাধরি করে ওকে ঘরের ভেতর চ্যাটাইয়ে শুইয়ে দিয়ে গেছে।

উমারাণীর মা বলেছেন, রাত্তিরে তিনি ওই ঘরেই শোবেন। জ্ঞান ফিরে এলে ছেলে খালি ঘরে ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠ্তে পারে !

ফটিকের যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন রাত্রি গভীর।

মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ কর্ছে।

সে তাকিয়ে দেখ্লে, তার মায়ের জায়গাটিতে তাদের মাসিমা উমারাণীর মা শুয়ে আছেন।

ক্লান্তিতে অঘোরে তিনি ঘুমোচ্ছেন।

ফটিকের মনে হল তার দম বন্ধ হয়ে আস্ছে। ঘরের ভেতর সে

আর কিছুতেই টিক্‌তে পার্‌বে না। মাসিকে না জাগিয়ে সে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে চলে এলো। রাশি রাশি তারা যেন চোখ মেলে তাকিয়ে বল্‌ছে,—ওরে তোর আজ কেউ নেই। শেষকালে ছিল মা আর বোন—আজ রাত্তিরে তাদেরও তুই হারিয়েছিস্‌!

ফটিক উদ্‌ভ্রান্তের মতো আশে-পাশে তাকালো।

শুধু একটানা ঝি-ঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে—আর অন্ধকারে ঝোপে-ঝাড়ে হাজার হাজার জোনাকি জ্বল্‌ছে আর নিভ্‌ছে।

ফটিক বুঝ্‌লে, এই বাগানে সে আর কিছুতেই থাক্‌তে পারবে না মেরে ফেল্লেও না। গোটা বাগানের লোকগুলোকে কে যেন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে! এই সুযোগ···সে মরুক আর বাঁচুক তাকে—এই অন্ধকার রাত্তিরেই পালাতে হবে।

কিন্তু উপায় কি? ফটিক সারা বাগানে নিশাচরের মতো ঘুরে বেড়ায় আর নিজের চুল ছিঁড়তে থাকে।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল প্রাচীরের ধারে ঝোপঝাড়ের ভেতর সোজা উঠে গেছে এক নারকেল গাছ।

এই নারকেল গাছে কি ওঠা যায় না?

যখন প্রাণের ভয় থাকে না—মানুষ তখন মরিয়া হয়। সুস্থ অবস্থায় যে কাজ করা যায় না তখন তা অতি সহজেই করা চলে।

সাপ?—সাপই বা কি করবে তার? মোট কথা অভিশপ্ত বাগান থেকে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হবে।—নইলে—এম্‌নিতে দম বন্ধ হয়েই সে মারা পড়বে! বহু ফণী-মনসার গাছে জঙ্গল হয়ে গেছে। গা হাত পা ছড়ে যেতে লাগ্‌ল। তবু ঝোপ-ঝাড়

ঠেলে সে উঠে পড়ল নারকেল গাছে। গাঁয়ের ছেলে সে: নারকেল গাছে উঠ্‌তে কোনোই অসুবিধে হল না। খানিকটা ওঠবার পর দেখ্‌লে বাগানের উঁচু দেয়ালের ওপাশে একটা পুকুর।

. এই ত' ভগবান উপায় মিলিয়ে দিয়েছেন।

মরার বাড়া গাল নেই— যা হবার হবে—এই কথা
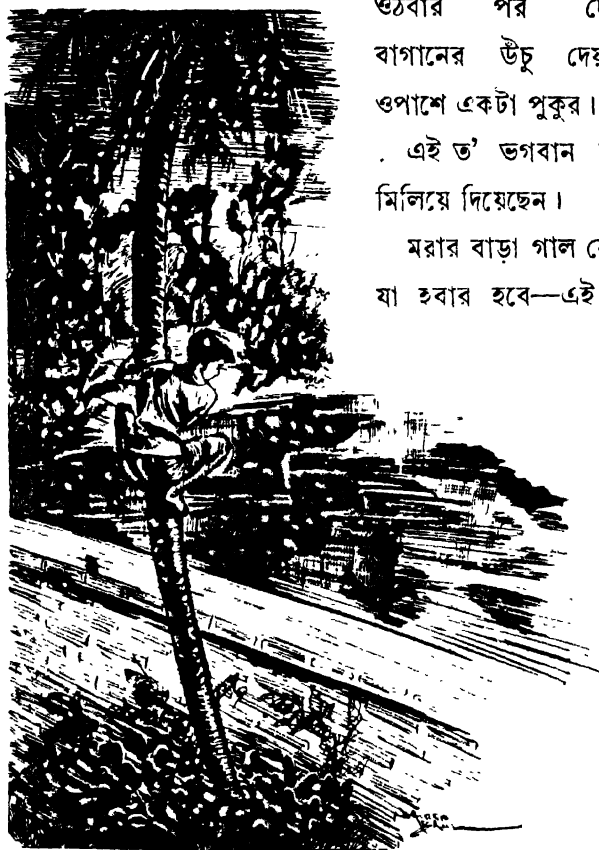
ভেবে নারকেল গাছের ওপর থেকে ফটিক ঝাঁপিয়ে পড়ল বাগানের বাইরের সেই পুকুরে।

ত্রিশ

অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়তে সে একেবারে পুকুরের জলে তলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খাল-বিল নদী নালার সঙ্গে অতি ছেলে বেলা থেকে যার অমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়—পুকুর থেকে পাড়ে উঠ্‌তে তার বেশীক্ষণ দেরী হল না!

শেষ রাত্তিরের সেই আলো-আঁধারের কুহেলি ঢাকা স্বল্প পরিসর বন-পথ দিয়ে ফটিক ঠিক যেন পাগলের মতো ছুটে চল্‌লো। কোথায় যাবে সে জানে না, কোন গৃহকোনে তার আশ্রয় মিল্‌বে একথাও তার জানা নেই, দ্রুত ছোটার জন্যে হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে যাবার ভয়ও তার কিছু নেই– সে শুধু চলেছে।

ফণী-মনসার গাছের কাঁটায় তার পা আগেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এইবার ভিজে কাপড়ে ছুট্‌তে গিয়ে বহু যায়গায় পড়তে পড়তে টাল সাম্‌লে নিচ্ছিল।

ভেজা চুল থেকে যে জলের ধারা বেয়ে পড়ছিল তারই সঙ্গে নিজের অজান্তে চোখের জল মিশে ফটিকের পথ চলায় ক্রমাগত বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু চল্‌তে আর ছুট্‌তে তাকে হবেই।

ফটিকের কেবলি মনে হচ্ছিল—এই অভিশপ্ত বাগান থেকে যতদূর হোক ছুটে চলে যেতে হবে। এখানে সারা গায়ে কে যেন জল বিছুটি ঘসে দিতে থাকে, একটা অব্যক্ত বেদনা কেবলি বুকের মধ্যে থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে। শয্যা-কণ্টক বলে একটা কথা সে ছেলেবেলা থেকে ঠাকুমার মুখে শুনেছিল। এই বাগানে এসেও তার সেই অবস্থা হয়েছিল। সব সময় যেন কাঁটা বিঁধছে গায়ে। বস্‌তে কাঁটা,

চল্‌তে কাঁটা, খেতে কাঁটা···এমন কি কোনো কিছু ভাব্‌তে গেলেও খচ্‌খচ্‌ করে কাঁটা বেঁধে মনে ! শেষ কালে চরম অঞ্জলি দিতে হল— খুকু আর মাকে !

যাকে বাঁচাবার জন্য এক দেশ থেকে আর এক দেশে আসা—পথে-বিপথে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে বেড়ানো, সে তপস্যা কি এমন ভাবেই বিফল হয়ে গেল ? অন্তরের ফল্গুধারা·যখন শুকিয়ে যায় তখন সেখানে শুক্‌নো বালি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না !

সরু গ্রাম্য পথ থেকে একটু প্রশস্ত রাস্তা···তারপর পিচ্‌ ঢালা দীর্ঘ রাজপথ...তার সাম্‌নে সাপের নির্জীব খোলসের মতো নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে !

ফটিকের কাছে সব পথই আজ সমান !

দুরারোগ্য, সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের কাছ থেকে মানুষ যেমন ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে—ফটিক তেমনি বাগানের বিভীষিকা থেকে দূরে চলে যেতে চায়—

দূরে···দূরে···আরো দূরে···যদি সম্ভব হয় ত' পৃথিবীর আর এক প্রান্তে।

পৃথিবীর অপর প্রান্ত—সে কত দূর ?

শুকতারাকে নীরব সাক্ষী রেখে সে একা পথ চলে। এক বাস্তুহারা ছেলের চোখের জলে পিচ্‌ ঢালা পথ সিক্ত হয়ে ওঠে।

নৈশ অন্ধকার আর নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান্‌-খান্‌ করে দিয়ে দ্রুত-বেগে এগিয়ে আস্‌ছিল একটা ট্রাক্‌ !

ফটিকের যেমন কোনো দিকে হুঁস নেই···তেমনি ট্রাকও ছুটেছিল একেবারে বেপরোয়াভাবে দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য হয়ে।

ট্রাকের ভেতর একটি গোটা পরিবার।

মেয়েরা হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্‌ল; ড্রাইভার হুঙ্কার দিয়েই তাড়াতাড়ি প্রাণপণে ব্রেক কসে ধরল।

একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে মাঝপথে ট্রাকটি থেমে গেল।

মরণ যেন ফটিকের শিয়রে এসে অনুকম্পায় পিছিয়ে গেল!

ফটিক ঠিক ট্রাকের সাম্‌নে এসে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছিল।

ট্রাকের মালিক গদাধর কোলে তার বিরাট দেহ নিয়ে থপ্‌ থপ্‌ করে নেমে এলেন। তাঁর মুখ-চোখ বিতৃষ্ণার কালীতে একেবারে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে।

চীৎকার করে তিনি বল্লেন, কী গেরো বল দেখি! বদ্‌মাইস ছেলেটা এক্ষুণি হাতে হাতকড়া পরিয়েছিল আর কি!

গদাধর কোলে একটা বিরাট কারখানার মালিক। বাড়ীর বৌ-ঝি, ছেলে পুলে, মা, মাসি, খুড়ি সবাইকে জড়ো করে নিয়ে শেষরাত্তিরে কল্‌কাতায় রওনা হয়ে ছিলেন গঙ্গাস্নান করতে। খুব ভোরেই নাকি একটা ভালো যোগ আছে। পুরোহিত ঠাকুর পাঁজি পুঁথি দেখে বলে দিয়েছেন,—এই যোগে গঙ্গাস্নান করলে জীবনের সমস্ত পাপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে ধুয়ে মুছে যাবে!

গদাধর কোলে তাই বিরাট বাহিনী নিয়ে পুণ্য-অর্জ্জনের জন্যে এই নৈশ অভিযান করেছিলেন।

কিন্তু মুস্কিল বাঁধলো এই যে, ছেলেটা যে গাড়ীর সাম্‌নে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল—আর কিছুতেই তার ওঠবার নাম নেই!

ট্রাক্ ত' তাকে সত্যি চাপা দেয় নি! চাপা দেবার উপক্রম করেছিল মাত্র।

গদাধর কোলে আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, কি গেরো, কি গেরো! ছেলেটা যে রাস্তা থেকে কিছুতেই উঠ্‌ছে না। এখন কি করা যায় বলত? রাগে ফুলছিলেন কোলেমশাই। খানিকটা ইতঃস্তত করে ড্রাইভারকে বল্লেন, এই ড্রাইভার, টেনে হিঁচ্‌ড়ে ওটাকে সরিয়ে দাও রাস্তার একপাশে!

কোলে মশায়ের বুড়ো মা হা-হা করে উঠে বল্লেন, না-না—ওকথা মুখেও আনিস্‌নে বাবা। যাচ্ছি একটি পুণ্যের কাজ করতে। ওই ছেলেটাকে নির্যাতন করে লাভ কি? বরং দেখ—ও অজ্ঞান হয়ে পড়ল নাকি।

ঠাকুমার কথায় তার এক নাতনী মুখ বাড়িয়ে বল্লে, ঠাক্‌মা তুমি না ক'দিন থেকে এক ছোক্‌রা চাকরের কথা বল্‌ছিলে? তা ওকে তুলে নাও না ট্রাকে—বেশ কাজ চলে যাবে তোমার।

ফটিক এইবার মুখ তুলে তাকালো। মেয়েটিকে দেখ্‌তে ঠিক অনেকটা খুকুর মতো। তেমনি কোঁকড়া চুল, আর তেমনি উজ্জ্বল চোখ।

কোলে মশাই এরই মধ্যে একেবারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন, কি রে কাজ করবি?

যে বোনকে সে হারিয়েছে—সেই রকম চেহারার মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে ফটিক ঘাড় নাড়লে; তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বল্লে, বড্ড ক্ষিদে—

ঠাকুমা জিবটা তালুতে ঠেকিয়ে একটা শব্দ করে বল্লেন, আহা! বাছা বোধ হয় ক'দিন খায়নি। কোলেমশায়ের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে কইলেন, পুণ্যের কাজ করতে যাচ্ছি···, নারায়ণের জীবকে

অমন দু'হাতে ঠেলে যেতে নেই···ওতে ভগবান মুখ ফিরিয়ে নেন। ওকে গাড়ীর ভেতরই তুলে নাও তোমরা। সঙ্গে ছেলেপেলের জন্যে গরম দুধ আছে। খাইয়ে দিলেই ছেলেটা একটু সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে।

মনে-মনে রুষ্ট হলেও মায়ের কথা কোলেমশাই ঠেল্‌তে পারলেন না। বিশেষ করে পুণ্য সঞ্চয়ে যাচ্ছেন –, মায়ের আদেশ পালন না করলে পুণ্যের ভাগ কমে যেতে পারে—সে ভয়ও বিশেষ রকম আছে।

ড্রাইভারের সাহায্যে ফটিককে ট্রাকে তুলে নেয়া হল !

ঠাকুমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, আহা ! কোন অভাগী তার ছেলেকে এমন করে একা পথে ছেড়ে দিয়েছে !

মায়ের কথা নতুন করে মনে পড়ায় ফটিক একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল, কিন্তু তার প্রাণটা বুঝি ইতিমধ্যেই পাষাণ হয়ে গেছে—তাই আর এক ফোঁটা জলও তার চোখ দিয়ে বেরুলো না।

খুকুর মতো দেখ্‌তে মেয়েটির নাম বীণা।

বীণা গরম দুধের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বল্লে, নাও, এইটে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেল।

ঠাকুমা নাতনীকে সমর্থন করে বল্লেন, খাও বাবা—খাও ! আহা, কৃষ্ণের জীব ! ওদের কি কষ্ট দিতে আছে ? তাহলে সব পুণ্যের ফলই ভগবান হাত থেকে কেড়ে নেন।

কোলেমশাই মায়ের কথার প্রতিবাদ করতে পারলেন না। কিন্তু অতখানি বোতলে-পোরা গবম দুধ যে ওই রাস্তার ছেলেটার পেটে গেল এই কথা ভেবে তাঁর মনটা কেবলি খচ্‌-খচ্‌ করতে লাগ্‌লো।

দুধ খেয়ে ফটিক বেশ খানিকটা সুস্থ বোধ করল।

ইতিমধ্যে ঠাকুমা আর নাত্নীতে কথাবার্ত্তা চল্ছে—এই ছোক্রা চাকরের ওপর কি কি কাজের ভার দেয়া হবে তাই নিয়ে।

নাত্নী বল্লে, তোমার যতই কাজ থাক্ ঠাক্মা, আমাকে রোজ ইস্কুলে পৌঁছে ওকে দিতেই হবে। একটা ব্যাগ কিনে দেবো তার ভেতরে পুরে আমার বইগুলি বয়েঁ নিয়ে যাবে।

ঠাক্মা জবাব দিলেন, কিন্তু তার আগে আমার পূজোর ফুল বেলপাতা জোগাড় করে দিয়ে যেতে হবে কিন্তু! ওই জন্যেই ত' ছোক্রা চাকর রাখা।

বীণার দাদা পল্টু শুধোলে, ওরে, কি নাম তোর?

ফটিক আস্তে আস্তে জবাব দিলে, ফটিক—

—ফট্কে বল! পল্টু ফোঁড়ন দিলে। আচ্ছা, তুই ঘুঁড়ি তৈরী করতে পারিস?

ফটিক শুধু নীরবে মাথা নাড়লে।

পল্টু আবার জিজ্ঞেস্ করলে, সুতোয় মাঞ্জা দিতে জানিস্ ত?

ফটিক মৃদুস্বরে উত্তর দিলে, হুঁ।

পল্টু শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠ্ল। বল্লে, ব্যস! তাহলে তুই আমার চাকর হবি। দিদিমার নয়, বীণারও নয়।

ঠাকুমা ভ্রূ কুঁচ্কে জবাব দিলেন, ভালো রে ভালো! আমি ওকে তুলে নিয়ে এলাম, আর ও তোর চাকর হয়ে গেল!

বীণা চুল দুলিয়ে বল্লে, না-না, আমার আর ঠাক্মার দু'জনের চাকর।

ফটিক পাথরের মূর্ত্তির মতো চুপ করে শুনে যেতে লাগ্লো। 'চাকর' কথাটা তার কানে যেন গরম সীসা ঢেলে দিলে।

কোলেমশাইও কম যান না। তিনি বল্লেন, কার চাকর তাই নিয়ে তোমরা যত খুশী মারামারি কাটাকাটি করো আমার আপত্তি নেই; তবে সন্ধ্যেবেলা ফটকে যেন আমায় কয়েক ছিলিম অম্বুরী তামাক সেজে খাওয়ায়। তাহলেই আমি খুশী থাক্‌বো।

বাড়ীর গৃহিণী এক কোনে চুপচাপ বসে ছিলেন। এইবার তিনি কথা কইলেন। বল্লেন, তা বাবা ফট্‌কে, আমার রোজকার পান আর জর্দ্দা তোকেই কিনে আনতে হবে। ঝি মাগী তু হাতে পয়সা চুরি করে আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি।

ফটিকের আসল মনিব কে হবে এই নিয়ে ঝগড়া আর খুন্‌সুটি চল্‌তে চল্‌তে ট্রাক এসে কাশী মিত্তিরের ঘাটে হাজির হল।

কোলেমশাই ড্রাইভারকে ডেকে বল্লেন, খুব হুঁসিয়ার, ট্রাকে জিনিসগুলির দিকে খুব নজর রাখ্‌বে—যেন কিছু চুরি না যায়!

ঠাক্‌মা ফটিকের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, তুই ত' বেশ সাম্‌লে উঠেছিস বাবা, আমাদের কাপড়গুলো সব নিয়ে আয়। গঙ্গার ধারে ওগুলো নিয়ে বসে থাক্‌বি—আমরা সবাই একবারে ডুব দিয়ে নিতে পারবো।

কোলেমশাই খুশী হয়ে বল্লেন, ঠিক কথা বলেছ মা! খাবার-দাবার আগ্‌লাক্ ট্রাকে বসে ড্রাইভার, আর ফট্‌কে ধুতি, সাড়ী সব নিয়ে চলুক। যা ভীড় দেখ্‌ছি—শেষ পর্য্যন্ত মা গঙ্গাকে স্পর্শ করতে পারলে হয়!

ফটিকের সারা শরীর তখনো থর্ থর্ করে কাঁপছিল। যে উত্তেজনার মুখে সে বাগান ছেড়ে উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে এসেছে—তার কাঁপুনি এখনো থামেনি। কিন্তু তাই বলে এদের কাজেও ত'

'না' বলা চল্‌বে না! এরা আশ্রয় দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এদের কাছে চাকরী করবে সে স্বীকার করেছে, কাজেই তাদের হুকুম মরি-বাঁচি করে তামিল করতেই হবে।

ধুতি-সাড়ী সেমিজ-সায়ার বোঝা নিয়ে ফটিক ওদের পেছন-পেছন রওনা হল।

গঙ্গার ঘাটে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

কোলেমশাই বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কোনো রকমে পথ করে চল্লেন।

গঙ্গার তীরে একটা গাছ। তারই তলায় কাপড়ের বোচ্‌কা নিয়ে ফটিককে তিনি বসিয়ে দিলেন।

গাছের তলায় একদল ছেলে ইতিমধ্যেই দিব্যি আসর জমিয়ে ফেলেছে। সেই দলে রয়েছে—গণেশ, তারাদাস, আনন্দ, অতনু, চন্দ্রশেখর, সুচারু, মুরারী, অলক প্রভৃতি। সঙ্গে আছে তাদের মাষ্টারমশাই।

এই কিশোর দল নিজেদের চেষ্টায় একটা ব্যায়ামাগার গড়ে তুলেছে। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে চলে ব্যায়াম আর কুস্তি। শেষ রাত্তিরে ওরা দল বেঁধে আসে কাশীমিত্তিরের ঘাটে। প্রত্যেকের সঙ্গে স্নানের সরঞ্জাম, আর এক শিশি করে সরষের তেল। দেহে তৈল মর্দ্দন করে শরীরকে মজ্‌বুত করে তোলা এদের সবাইকার অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ। তারপর চলে তাদের গঙ্গার বুকে সাঁতার কাটা। কখনো ওরা মাল বোঝাই নৌকোর হাল বেয়ে ছাদের ওপরে ওঠে··· তারপর সেখান থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ খেয়ে পড়ে, আবার কখনো বা লঞ্চের দড়ি ধরে উত্তাল তরঙ্গে পাড়ি জমায়। চিৎ সাঁতার দিয়ে কেউ

কেউ ভাটির টানে কোন্ দিকে উধাও হয়ে যায়! এদের পরস্পরের সঙ্গে রয়েছে একটা প্রীতির সম্পর্ক ; তাই দেহের আর মনের অনুশীলনে একে অন্যকে যথাসাধ্য সাহায্য করে চলে।

ওরা সবাই ফটিককে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলে।

চোখ দুটি বিষণ্ণ, জির্ জির্ করছে পাঁজরের হাড়···এই বয়েসের ছেলেদের এমন চেহারা দেখ্‌লে সত্যি ওদের দুঃখ হয়।

ওদের সবাইকার দৃষ্টি যে তার ওপর পড়েছে সে বিষয়ে কিন্তু ফটিকের একেবারে খেয়াল নেই।

ফটিক ভাবছে অন্যকথা!

তার ছোট্ট মগজে চিন্তা ভাবনার ঢেউ গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গের মতো এসে আছ্‌ড়ে পড়ছে।

সে ভাব্‌ছে, বীণাকে দেখে খুকুর কথা মনে পড়ল—তাতেই না সে এককথায় কোলেমশায়ের বাড়ী চাকরী করতে রাজি হল! কিন্তু ওই বাড়ীতে ছোক্‌রা চাকর হিসেবে কাজ করতে গিয়ে রোজকার দায়িত্বে তার যে ভুল-ভ্রান্তি হবে তার জন্যে কি তাকে গঞ্জনা সইতে হবে না?

ঠাকুমার পূজোর জোগাড়ে ত্রুটি থাক্‌লে তাকে গাল-মন্দ মাথা পেতে নিতে হবে। ইস্কুলে যাবার কালে যদি কোনো দিন মায়ের কথা ভেবে অন্যমনস্ক হবার জন্যে হাত থেকে বই পড়ে যায় তবে তার একরত্তি মনিব বীণাই হয়ত তার গালে ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দেবে। অম্বুরী তামাক সাজ্‌তে গিয়ে এক ম্লান সন্ধ্যায় যদি তার হারাণো বোন খুকুর কথা মনে পড়ায় অজান্তে কল্‌কে ভেঙে ফেলে তবে হয়ত' ওই কোলেমশাই তাকে লাথি মেরে বস্‌বেন। বাড়ীর গিন্নি কোন দিন হয়ত বলে বস্‌বেন, তুই জরদা কিন্‌তে গিয়ে পয়সা চুরি করিস!

ভাব্তে ভাব্তে ফটিক শিউরে উঠ্ল !

এই জীবন নিয়েই কি তাকে বেঁচে থাকতে হবে ? কত আশা করে মাকে নিয়ে এসেছিল এদেশে···মায়ের মনে স্বপ্ন জেগেছিল···তার ফটিক লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে···দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে,—মায়ের দুঃখ দূর করবে !

আজ কোথায় তার মা আর কোথায় সে·!

ছ' মাস আগেও যখন সে বই হাতে ইস্কুলে যেতো···সে কি ভুল করেও ভাব্তে পারত যে, একদিন ছোক্‌রা-চাকর হয়ে তাকে এক বাড়ীতে মাথা গুঁজ্তে হবে ?

তার চারদিকে যেমন রাশি রাশি মানুষ পুণ্যের জন্যে পোকার মতো কিল্‌বিল করে বেড়াচ্ছে তেমনি ফটিকের মগজে অসংলগ্ন চিন্তাগুলি একটা আলোড়নের সৃষ্টি করল।

হঠাৎ গঙ্গার তীরে তীরে একটা কোলাহল আর চীৎকার শোনা গেল—বান আস্‌ছে, বান আস্‌ছে—পালাও সব—

সঙ্গে সঙ্গে ওই পোকার মতো মানুষগুলি পুণ্যির প্রলোভন ত্যাগ করে প্রাণের ভয়ে ভেড়ার পালের মতো যে যেদিকে পারে ছুট্‌তে সুরু করে দিলে। ফটিক এক লহমায় তাকিয়ে দেখ্লে, কোলেমশাই তাঁর ছেলে-মেয়ে মা-বৌকে ফেলে ওই মোটা দেহ নিয়ে পড়ি-কি মরি করে ছুটছেন !

কিন্তু সে নিজের যায়গা থেকে উঠ্ল না—ছুটেও পালালো না।

হঠাৎ তার মনে হল, এই যে চঞ্চল উন্মত্ত বারি রাশি অধীর আগ্রহে ছুটে আস্‌ছে···এই তরঙ্গের দল তাকে আহ্বান জানিয়ে

বল্‌ছে···আমার কোলে এসে আশ্রয় নাও। জীবনে বড় জ্বালা—বড় গ্লানি·· শান্তি তুমি সেখানে খুঁজে পাবে না—···

ফটিক সেই দিকে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে দেখ্‌লে!

তাইত! লাখো আঙুল তুলে—ইসারা করে তারা যেন সবাই ডাক্‌ছে। ওরা অতি আপনার জন। ওই তরঙ্গ-কল্লোল ফটিকের কানে অতি মধুর শোনালো। মুহূর্ত্তে সে ঠিক করে ফেল্‌লো—গঙ্গার এই উত্তাল তরঙ্গে সে আশ্রয় নেবে।

ইতিমধ্যে বানের জল ফুলে, ফুঁসে—গর্জ্জে উঠে—ক্রমাগত তটভূমিকে আঘাত করতে সুরু করে দিয়েছে! এই ভাঙনের গান ফটিকের মনকে আকর্ষণ কর্‌ল।

সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফেনিল, উচ্ছ্বাসময় গঙ্গার বুকে।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে একটা হৈ-হল্লা পড়ে গেল! কোন একটা যোগে গঙ্গার ঘাটে বহু রকমের লোকের আমদানী হয়। একদল আসে পুণ্য-সঞ্চয় করতে,—একদল আসে সেই পুণ্য সঞ্চয়ীদের পকেট মারতে আর একদল এসে জোটে নিছক কৌতূহলের বশে শুধু তামাসা দেখ্‌তে!

একটি বুড়ো চীৎকার করে বল্লে, ছেলেটি বুঝি স্বপ্নে আদেশ পেয়েছে,—এই পুণ্যযোগে মা গঙ্গা তাকে কোলে টেনে নেবেন্! তাইত ছেলেটি এতক্ষণ ধরে শুভ মুহূর্ত্তের জন্যে অপেক্ষা করছিল। যেই বান ডেকে এলো—সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে। ওকে তোমরা কেউ আর বাধা দিও না। মায়ের ছেলে মায়ের বুকে ফিরে যাক! জয় মা গঙ্গে—

সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা একজন দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। তিনি বল্লেন, উঁহু! এ মায়ের কোল-টোল কিচ্ছু নয়। একেবারে আত্মহত্যার ব্যাপার। একটু দাঁড়িয়ে যেতে হল। আসছে কালের কাগজে মোটা হরফে খবরটি ছাপিয়ে দিতে হবে।

আর একটি মোটা-সোটা ভূড়িওয়ালা বুড়ো নাভিতে তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে বল্লেন, আর মশাই! স্রেফ সাতদিন না খেয়ে রয়েছে। চারদিক থেকে লোক পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আস্‌ছে কল্‌কাতায় আর পোকার মতো মরছে! এটা আবার একটা খবর নাকি? বরং খবর বল্‌তে পারেন আমার মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথাটা। আজই পুণ্যদিনে আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করছি বরানগরের গঙ্গার ধারে।—বলে তিনি আড় চোখে একবার খবরের কাগজের সংবাদ দাতার দিকে তাকালেন।

কিন্তু রিপোর্টার তার দিকে ফিরেও চাইলেন না! কিছুই যেন ঘটে নি—এই ভাবে ভুঁড়েল ভদ্রলোক আবার এক খাব্‌লা তেল নিয়ে ভূঁড়িতে মালিশ করতে লাগ্‌লেন।

গণেশ, আনন্দ, অতনুর দল এতক্ষণ ধরে ওকে লক্ষ্য কর্‌ছিল। ওরা বুঝ্‌তে পার্‌লে, ছেলেটার মনের মধ্যে নিজের জীবন সম্বন্ধে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা জেগেছে! তাই বুঝি— সে হঠাৎ এমন করে আত্ম হত্যার পথে এগিয়ে গেল।

তৈরী ওদের দেহ আর মন। মুহূর্ত্তের মধ্যে ওরা সবাই কোমরে গামছা বেঁধে ওকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তীরে দাঁড়িয়ে একদল বুড়ো-বুড়ী হায়-হায় কর্‌ছিল। এইবার এতগুলি ছেলে এক সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়তে তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

বানের জলের সঙ্গে যুঝে ফটিককে তীরের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে

আস্‌তে ছেলের দলকে বেশ পরিশ্রান্ত হতে হয়েছিল। ফটিক অনেকটা জল খেয়ে ফেলেছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার কলা-কৌশলে গণেশ, ফটিকের দেহটাকে বারে বারে শুইয়ে, উঠিয়ে বসিয়ে—আর পেটে চাপ দিয়ে সব জল অল্পক্ষণের ভেতরই পেটের থেকে বের করে দিলে।

ধীরে ধীরে ফটিকের জ্ঞান ফিরে এলো। কিন্তু তখনো দেহ ভারী দুর্ব্বল। অতনু বল্লে, একটু দুধ খাইয়ে দিতে পার্‌লে ভালো হয়।

একজন গোয়ালা দুধের ভাঁড় নিয়ে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল।

আনন্দ ডাক্‌লে, এ গোয়ালা ভাই, থোড়া দুধ ত' পিলা দেও—

গোয়ালা লোক ভালো। ওদের ডাকে সাড়া দিলে। দুধের ভাঁড় নামিয়ে খানিকটা দুধ মগে করে তুলে ফটিকের ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ধীরে ধীরে ঢেলে দিলে।

তারপর খানিকটা সময় নীরবে কাট্‌ল।

এইবার ফটিক চোখ মেলে তাকালো।

সুচারু বল্লে, আর কোনো ভয় নেই। এইবার ছেলেটি চোখ চেয়েছে।

ফটিক প্রথমটা তাকিয়ে বুঝ্‌তে পার্‌ল না—সে কোথায় আছে। অনেকখানি জল খেয়ে তার বুদ্ধি-সুদ্ধি যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে। তাই ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস কর্‌লে, আমি কোথায় ?

গণেশ জবাব দিলে, তুমি নিরাপদেই আছ। আর কোনো ভয় নেই তোমার।

ওদিকে অতনুর সঙ্গে গোয়ালার কথা কাটাকাটি সুরু হয়ে গেছে, অতনু বল্‌ছে, আমি তোমায় ডেকেছি, তুমি আমার কথায় দুধ দিয়েছ···এখন পয়সা নেবে না কেন শুনি ?

গোয়ালা একটু হাস্‌ল। তারপর বল্লে, বাবু, আমি গোয়ালা হলেও ত' মানুষ। বিশ বছর কল্‌কাতায় আছি। তোমাদের মতই বাঙ্‌লা শিখেছি। একটা ছেলে মরতে বসেছে। তাকে একটু দুধ দিয়েছি। তার জন্যে আবার পয়সা নেবো? দুধে জল মিশিয়ে বহু টাকা লাভ করেছি খোকাবাবু! দেশে অনেক জমি-জমাও করেছি— আজ পরবের দিনে আর তোমরা পয়সা নিতে বোলো না।

দুধের ভাঁড় মাথায় তুলে নিয়ে গোয়ালা চলে গেল।

ফটিকের সম্পূর্ণ জ্ঞান ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। সে উঠে বস্‌তে যাচ্ছিল। অলক বল্লে, এখনো তুমি উঠো না ভাই। আর একটু শুয়ে থাকো। সুস্থ হলে তারপর আমরা তোমায় উঠ্‌তে দেবো, তার আগে নয়।

গণেশ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি শুধোলে, আচ্ছা ভাই, এত অল্প তোমার বয়েস, কিন্তু আত্মহত্যা কর্‌তে গিয়েছিলে কেন? কি তোমার দুঃখ?

ফটিক খানিকটা গণেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলে, আমার দুঃখের পাঁচালী, তার কি শেষ আছে ভাই? একদিন বল্‌ব তোমাদের। কিন্তু মরণই আমার ভালো ছিল,—তোমরা আমায় বাঁচালে কেন?

আনন্দ এগিয়ে এসে ওর হাতখানি ধর্‌লে। বল্লে, মরণের পথ ত' কিশোরদলের পথ নয়,—তাদের পথ হচ্ছে জীবনের পথ—

ফটিক ম্লান হেসে জবাব দিলে, কিন্তু তোমরা ত' জানো না— কি আমি হারিয়েছি! পদ্মার ওপার থেকে আমি ভেসে এসেছি—

অতনু বল্লে, বুঝ্‌তে পেরেছি ভাই বাস্তহারা। পদ্মার ঢেউয়ের মতোই

উত্তাল তোমার দুঃখের ইতিহাস। কিন্তু তুমি ত' নদীর দেশের মানুষ। একথা নিশ্চয়ই জানো যে, নদী যখন এক পাড় ভাঙে তখন সবার অলক্ষ্যে আর এক পাড় গড়ে তোলে। আত্ম-হত্যার পথ আমাদের পথ নয়—আমরা এগিয়ে যাবো জীবনের গান গেয়ে—। ধ্বংস নয়, সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য।
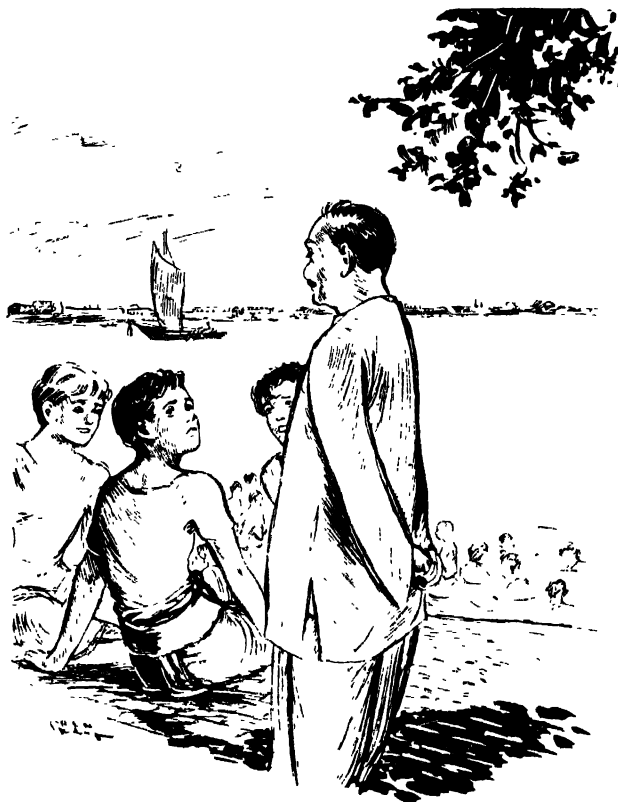
মাষ্টারমশাই এতক্ষণ চুপ করে ছেলেদের কথা শুনছিলেন। এইবার

তিনি এগিয়ে এসে বল্লেন, গণেশ আর অতনু ঠিক কথাই বলেছে। তোমাদের জীবনের পথ ফুল দিয়ে ঢাকা নয়। বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে—জীবনের পরম সাফল্যের উচ্চ-শিখরে। তোমরা সব সোনার কাঠির দল। তোমাদের স্পর্শে এই মরা দেশ আবার জেগে উঠ্‌বে। আজ থেকে তোমার দেহের আর মনের পূর্ণ পরিণতির দায়িত্ব আমরাই গ্রহণ কর্‌লাম। চলো তুমি আমাদের সঙ্গে—

ফটিক মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লে, গঙ্গার বুকে মৃত্যুর কালিমা কোথায়ও নেই। তরুণ তপনের স্নিগ্ধ কিরণ তরঙ্গের শিখরে শিখরে সোনালী-স্বপনের সৃষ্টি করেছে।

মাথার ওপরে গাছের ডালে পাখী গান গেয়ে উঠেছে। ঝল্‌মল্‌ করে উঠেছে আজকের পুণ্যময় প্রভাত।

এই কি নব-জীবনের ইঙ্গিত ?

ফটিক চোখ বুঁজে নতুন করে বাঁচ্‌বার সঙ্কল্প গ্রহণ কর্‌লে।